সঞ্চয়িতা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত

একাদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

পত্রাবলীর এই খণ্ডে শ্যামল নিত্যোজ্জ্বল রবীন্দ্রমানসের প্রকাশ তাঁর শত পাঠকের মতো আমার কাছে লিপিসাহিত্যে নতুন বিস্মিত ঘটনা, বিশেষ অর্থে তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহের এই দান আমার কাছে পারমিক। এবং সেই কারণে প্রাসঙ্গিক তথ্যগত আলোচনা আজও আমার পুণ্যতম স্মৃতির বিরুদ্ধে বলে জেনেছি ; কোনোদিনই জীবনে সেই দূরত্ব ঘটল না যাতে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধের আশ্চর্য বহু অধ্যায় পেরিয়ে বিশিষ্ট যোগাযোগের বিষয়ে কিছু লিখতে পারি।

ষোলো বছর বয়সের অজ্ঞাত কিশোরকে লেখা ১৯১৭ সালের পত্র এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ— শোকে অনুকম্পায়ী নিবিড় বিশ্বাস তিনি কোন্ দূর আসামের পত্রলেখককে পাঠিয়েছিলেন, তাকে উদ্ধার করেছিলেন— তার পরে প্রায় চব্বিশ বছর ধরে চিন্তায় চিত্রণে সমৃদ্ধ, ঘরোয়া নানা উল্লেখে স্নিগ্ধ তাঁর পত্রলিপি দেশে বিদেশে আমাকে ধন্য করেছে। প্রত্যেক চিঠি তাঁর মুক্তাক্ষরে রচিত একটি অভাবনীয় উপহার, ভাষায় ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর, যোগ্যতার কথা ভুলে গিয়ে গ্রহণের অধিকার মেনেছি। দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম বলে চিঠির অবকাশ ঘটে নি কিন্তু সহকারীরূপে তাঁর সত্যরচিত বহু পত্রাবলীর পরিচয়ে বঞ্চিত হই নি, আশ্চর্য হয়েছি সামান্যতম চিঠির চকিত আলোয়, অজস্রত্ব এবং বৈচিত্র্যে, ক্রুতশিল্পের বিশ্বজনীন রূপে।

১৯১৭ সালের চিঠি পাবার কিছু পরেই কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় শান্তিনিকেতনে, শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী আমাকে নিয়ে যান। ১৯২১-এ বিশ্বভারতীর অনুশীলন ছাত্ররূপে এবং স্বল্প অধ্যাপনার দায়িত্বে আবদ্ধ হলাম ; ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-সহকারী ও মধ্যে মধ্যে সহযাত্রীর পালা। ইংলণ্ডে, য়ুরোপে, মার্কিনদেশে ইরানে এবং স্বদেশের নানা স্থানে তাঁর সঙ্গে

ছিলাম ; এই চিঠিপত্রে এবং অন্য গ্রন্থে তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বাকি আট বছর অক্সফোর্ডে, লাহোরে এবং কলকাতায় দূরে দূরে কর্মে জড়িয়েছি, কিন্তু প্রায়ই ফিরেছি তাঁর কাছে। করুণায় মহীয়ান তাঁর প্রীতির ঘনিষ্ঠতা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, বহু পত্রে তার পরিচয় রয়ে গেল।

অমিয় চক্রবর্তী

অনিন্দিতা দেবীকে লিখিত

১

৩০ জুন ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার খাতাগুলি আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সবগুলি পড়িয়া দেখিলাম। লেখাগুলি খুব পাকা হইয়াছে, ছাপাইলে দেশের অধিকাংশ পাঠক তোমার উপরে বিষম বিরক্ত হইবে। কিন্তু সেইজন্যই ছাপানো কর্ত্তব্য বোধ করি। আমার গল্পসপ্তক প্রভৃতি দুইএকখানি বই আজ পর্য্যন্ত প্রথম সংস্করণের চৌকাঠ পার হইতে পারে নাই— বিবাহিত বাঙালী পুরুষের ভয়, পাছে এইগুলি পড়িয়া যথাসময়ে স্বামীর লুচি-ভাজা সম্বন্ধে স্ত্রীর উৎসাহ লেশমাত্র ম্লান হয়। কোনো কোনো বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার তর্ক করিবার ছিল কিন্তু সময় একেবারেই নাই। যদি কোন দিন দেখা হয় মোকাবিলায় বাদপ্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা রহিল। যদি কোনো অবসরে আশ্রমে আসিতে পার তবে মেয়েদের শিক্ষাসম্বন্ধে এখানকার ব্যবস্থা দেখিতে পাইবে। আর কয়েকদিন পরে তোমার খাতাগুলি ফিরিয়া পাঠাইব। ইতি ১৬ আষাঢ় ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২২ জানুয়ারি ১৯২৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি বোধ হয় জানো মেয়েদের দুঃখ ও অবমাননায় চিরদিন আমি বেদনা ও লজ্জা বোধ করি। আমার অনেক লেখার মধ্যে অনেকবার তা প্রকাশও হয়েচে। কিন্তু এই দুর্গতির যথার্থ প্রতিকার মেয়েদেরই হাতে। তারা যেদিন নিজের অধিকারের মর্য্যাদা সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করবে সেদিন সে মর্য্যাদা কেউ খর্ব্ব করতে পারবেনা। তাই মনে করি যে তোমার লেখা আগমনী আমাদের দেশের মেয়েদের মনে আত্মশক্তির উদ্বোধনের কাজ করবে। ইতি ৮ মাঘ ১৩৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

১

১২ মার্চ ১৯১৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আমার "ঘরে বাইরে" গল্পটি আপনাদের ভাল লেগেচে এতে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করেচি। প্রমথ চৌধুরী এই গল্পটিকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করেচেন কিন্তু সে বোধহয় কতকটা লীলাচ্ছলেই করে থাক্‌বেন—এর মধ্যে কোনো জ্ঞানকৃত রূপকের চেষ্টা নেই, এ কেবলমাত্রই গল্প। মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের, এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাত প্রতিঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে তারি বর্ণনা আছে। তার চেয়ে বেশি যদি কিছু থাকে সেটা অবান্তর এবং আকস্মিক। ইতি ২৯ ফাল্গুন ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
২২ জুন ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি মনে খুব বেদনা বোধ করচি। তার কারণ, এক সময়ে যখন আমার বয়স তোমারই মত ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মত। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তার পরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখ্‌লে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্কা হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বের রথ চলেচে, মানুষের ইতিহাসের রথ চলেচে— বাধাবিঘ্ন বিপদ সম্পদের মধ্যে দিয়ে সে আপনার গতিবেগে আপনার পথ কাটচে—

সেই পথই সৃষ্টির পথ। আমার জীবাত্মার যে যাত্রা সেও অমনিতর বিরাট,— সেও ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে আপনাকে এবং আপনার পথকে সৃষ্টি করচে— লোকে লোকান্তরে, যুগে যুগান্তরে। কোনো শোকদুঃখের খুঁটিতে আমরা কেউই বাঁধা থাক্‌ব না। আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা— আমরা অনন্ত উৎসের মত সকল ঘটনার মধ্য দিয়েই নিজেকে নিত্য উৎসারিত করব, কোনো ঘটনাই পাথরের মত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ্‌বেনা। এই কথা মনে রেখে যাত্রীর গান ধর— বিশ্বযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে নিরাসক্ত চিত্তে চিরজীবনের পথে অবাধে চলে যাও। শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত করুক, বিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দিক। মৃত্যু তোমার যা হরণ করেচে তার চেয়ে বড় করে পূরণ করুক। নিজেকে তুমি দীন বলে অপমানিত কোরো না, বেদনার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক্! ইতি ৮ই আষাঢ় ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৬ অগস্ট ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই লিখিব তাহাতে তোমার অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর পাইবে। অন্য সকল ব্যাপারেও যেমন, গানেও তেমনি, আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী। যা সজীব তা সচল।

আমার গানের স্বরলিপি বই আকারে ছাপানো চলিতেছে তাহাতে আমার নূতন পুরানো অধিকাংশ ভালো সুরগুলি পাইবে।

আমি যেমন ব্যস্ত তেমনিই শ্রান্ত— অধিক লিখিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই। ইতি ৩১ শ্রাবণ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২০ অগস্ট ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সংসারে যারা কেবলি হার মানে এবং হাল ছাড়ে তুমি তাদের দলে যেয়োনা। পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখই হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে। অন্ধকারে প্রত্যেক ছায়াটাকেই ভূত

বলে মনে হয়— মনটা অন্ধকার করে থাকলে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে অকারণে বা অল্পকারণেই অপদেবতা বলে কেবলি ভ্রম হতে থাকে। খুব জোরে হাস্‌তে শিখ্‌লে তারই আলোয় অন্তত সংসারের মিথ্যে ভূতগুলো দৌড় মারে। খুব গলা ছেড়ে ঐ হাস্‌তে পারাটা পৌরুষ।

রথীকে লিখে দিচ্চি তোমার খাতাখানি প্রমথকে পাঠিয়ে দেবে। ইতি ৪ঠা ভাদ্র ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

৩১ অক্টোবর ১৯১৭

তুমি শান্তিনিকেতনে এসে আমার কাছে কিছুদিন থাক। নিজের মনটাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ো না। সুখ দুঃখের খুব কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এ পর্য্যন্ত চলে এসেচি— কতবার হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়েচে। কিন্তু এইটেকেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে, বেদনার ভিতর দিয়েই জীবনটাকে নিবিড়ভাবে পেয়েচি। জীবনটা যদি নিতান্ত ছায়ায় লালিত, পেলব এবং সৌখীন হত তাহলে তার কোনো মূল্য থাকৃত না। যদি তুমি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর তবে একদিন এই প্রাণপরিপূর্ণ পৃথিবীর রৌদ্রালোকিত কলধ্বনি-মুখর প্রভাতে জেগে উঠে দেখ্‌বে তুমি যে অবসাদে

আবিষ্ট হয়েছিলে সে দুঃস্বপ্নমাত্র, তার মধ্যে সত্য নেই। জীবনে কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতা, কত উদ্যোগ, কত সৃষ্টি— জীবনের সেই বিচিত্ররূপী সত্যের দুর্লভ উপলব্ধি থেকে নিজেকে বঞ্চিত কোরো না। বাঁচবার পথে যাত্রা কর কোমর বেঁধে— দুর্জ্জয় তেজে, অসীম আশায়, অটল বিশ্বাসে— অশ্রদ্ধা কোরো না নিজেকে, এবং এই বিপুল সংসারকে— এই অপরিসীম রহস্যময় জীবলীলাকে। আপনার দীর্ঘ ছায়াটাকে আপনার চেয়ে সত্য মনে করে তুমি ব্যাকুল হয়ে পড়েচ, এই কুহেলিকা থেকে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, এই আমি কামনা করি। ইতি ১৪ই কার্ত্তিক ১৩২৪

৬

৯ নবেম্বর ১৯১৭

শান্তিনিকেতন

তোমার এবারকার চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি ও নিশ্চিন্ত হয়েচি। তোমাদের যে বয়স, জীবনের আনন্দ কলগান ত আমরা তোমাদের কণ্ঠ থেকেই শুনব— আমাদের কণ্ঠ কি আর তাজা আছে? সত্যি বলচি, যখন তুমি জীবনের উৎসাহরসে তোমার পেয়ালা ভরে নেবার জন্যে আমার কাছে আসতে চেয়েছিলে তখন আমার বড় ভাবনা হয়েছিল। কেননা উৎসের কাছে গিয়ে দেখি তার ধারা ভিতরের দিকেই চলে গেচে, বাইরের দিকে আর উছলে ওঠে না। সেই আমার

অন্তর্হিত প্রবাহের শুষ্কতা তোমাকে হয়ত আরো ক্লিষ্ট করবে এই আমার ভয় ছিল। তুমি ঠিক জায়গাতেই গেছ—প্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে হাসপাতালের মত ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধাবাঁধির উৎপাত করে না; সে মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দেয়। তার আদরের অ্যান্টিসেপ্টিকে না আছে জ্বালা, না আছে কড়া গন্ধ। ২৩ কার্ত্তিক ১৩২৪

৭

[১০ জানুয়ারি ১৯১৮?]

শান্তিনিকেতন

প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা সন্ধিস্থল আছে যখন তার মধ্যে আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্ব বেধে যায়। আমি যখন তোমার বয়সে ছিলুম তখন সেই প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে ছিলুম। এই অবস্থায় নিজের সঙ্গে নিজের এবং নিজের সঙ্গে বাহিরের সামঞ্জস্য থাকে না। তখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর বিকশিত হবার উদ্যম আছে অথচ তাদের বিকাশ নেই— তখন বাইরের ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্তরের আকাঙ্ক্ষার মিল ঘটে না— তখন ভিতরে বাইরে পদে পদে ঠোকাঠুকি চলে। আর একটা সন্ধিস্থল হচ্চে আমি যে বয়সে আছি এইটে। এখন এতদিনকার সংসারটা আলগা হয়ে আমার কাছ থেকে পিছিয়ে পড়েচে অথচ সংসারের অতীত যে একটি আত্মার আশ্রয় আছে সেটাকেও সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরা

যাচ্চে না। নিজের প্রকৃতির মধ্যে এই দ্বিধা বিচ্ছিন্নতার ব্যথা খুব অসহ্য করেই অনুভব করচি কিন্তু তাই বলে তার কাছে হার মানব কেন? পেরিয়ে যাবই। শক্তি আছে বলেই ব্যথা পাচ্চি—এবং শক্তি আছে বলেই সে ব্যথা অতিক্রম করেই যাব। তুমিও সেই কথা মনে রেখো। বিধাতা আমাদের মনের মধ্যে ধারালো যা কিছু অস্ত্র দিয়েছেন সে কেবল আমাদের জাল কাটাবার জন্যে—নিজেকে কেটেকুটে টুকরো-টুকরো করবার জন্যে নয়। তুমি তোমার শক্তির অস্ত্রকে উল্টো করে ধরেচ, তার তীক্ষ্ণ ধারটা কেবলি তোমার নিজেকে বিঁধচে। আপনাকে যতই তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করতে থাকবে ততই সেই চিন্তার চাপে তোমার নিজের দিকের ভারটা বেড়ে গিয়ে তোমাকে ঝুঁকিয়ে ফেল্‌বে। ভুলে যাও নিজের কথা—অমনি দেখ্‌বে বাইরের সঙ্গে তোমার ভারসামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। আশ্চর্য্য এই জগৎ, আশ্চর্য্য এই জীবন। সমস্ত প্রাণমন পুলকিত হয়ে ওঠে যখনি নিজের থেকে নিজের চেতনাকে সম্পূর্ণ বেগে বাইরে প্রসারিত করে দিই। সেই তোমার ক্ষুদ্র নিজেকে ভোলো, মুক্ত চৈতন্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত জগৎ তোমার কাছে আনন্দনিকেতনরূপে প্রকাশিত হোক্ এই আমি কামনা করি। ইতি ২৬ পৌষ [১৩২৪ ?]

৮

১৬ এপ্রিল ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শীঘ্র আমেরিকায় যাত্রা করচি। পৃথিবীর চারদিকে প্রলয় বহ্নি জ্বলে উঠেচে। ইতিহাস আবার নূতন করে গড়ে উঠ্‌বে— এই সময় আমারও কিছু কাজ আছে বলে মনে হয়— এখন ঘরের কোণে বসে থাক্‌তে পারলুম না। তুমি তোমার মনের কোণে কেন অন্ধকার সৃজন করে তার মধ্যে আবৃত হয়ে আছ? চিত্তকে আজ বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত কর। নিজের ব্যক্তিগত অবসাদের গ্লানি থেকে ছুটে বেরিয়ে এস— আজ সমস্ত মানুষের এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের দিনে নিজের কল্পনা বিজড়িত সমস্ত অনর্থকতার মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখার বিষম একটা লজ্জা আছে। কোনমতেই এই আত্মাবমাননাকে প্রশ্রয় দিয়োনা। নিজের জীবনকে বিশ্বের জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের সত্যস্বরূপ, নিজের বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি কর। ঈশ্বর তোমাকে তোমার আত্ম-গুহান্ধকারশায়ী ব্যর্থতার মোহাবরণ থেকে উদ্ধার করে বিশ্বের উদার আলোকে মুক্তি দান করুন এই আমি প্রার্থনা করি। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

খুব কাজের ব্যস্ততার মধ্যে তোমার চিঠি আমার হাতে এল। তখন জবাবও দিতে পারলুমনা, চিঠি হারিয়েও ফেল্‌লুম। আজ ছুটির দিনে বাড়ি যাবার জন্যে বাক্স গোছাচ্চি এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। তখন ছিলুম কাজের ব্যবস্থায় ব্যস্ত, আজ আছি ছুটির আয়োজনে ব্যস্ত, তবু এরি মধ্যে তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে তোমার চিঠিখানি পড়ে আমি বড় খুসি হয়েচি— আর তোমার গানগুলিও আমার মনে লেগেচে। তুমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলে, মাঝি তোমাকে নৌকোয় তুলে নিয়েচেন, এখন নির্ভয়ে তুফান কাটিয়ে পারের মুখে চলে যেতে থাক। এখনো মাঝে মাঝে পালের হাওয়ার বদলে ঝড়ের হাওয়া বইবে কিন্তু তাতে ভয় কোরো না।

তোমার গানগুলি ছাপিয়ে ফেলো।

আমি এখন চল্লুম পাততাড়ি বাঁধতে। ৯ই আশ্বিন ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১১ নবেম্বর ১৯১৮

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

তুমি এখানেই এস— আমাদের বা কারো কোনও অসুবিধা হবেনা। এখন বিদ্যালয়েরও ছুটি আছে। আস্তে আস্তে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে। কবে কখন আস্‌বে একটা খবর দিয়ো তাহলে স্টেশনে গাড়ি পাঠাব। রাত্রের গাড়িতে এসোনা। ইতি ২৫ কার্ত্তিক ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২০ নবেম্বর ১৯১৮

তোমার বড় মামার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েচি। আমি তাঁকে দুই একবার মাত্র দেখেচি কিন্তু সেই অল্প কালেই তাঁর মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানীর সরলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম।

আবার এই মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে তোমার মন যেন দিশাহারা না হয়। এই পৃথিবীকে এবং পৃথিবীতে বিচিত্র প্রাণের প্রকাশকে তুমি সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসতে পার এই আমি কামনা করি। মনকে হৃদয়কে নিজের মধ্যে

সংহরণ করে রেখো না, তাকে বিকীর্ণ করে দাও— তুমি যে আপনার ভারে আপনি পীড়িত সেই ভারটা কেটে যাক। ইতি ৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

১২

২৫ জুন ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি হলেম। আমি অনেকদিন থেকেই তোমার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেম— উদ্বেগের কারণ ছিল এই যে, তোমার মন, তোমার শক্তি নিজেকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও উপযুক্ত উপায়ে প্রকাশ করবার পথ পাচ্ছিলনা। এইজন্যে ক্রমাগত নিজেকে নিজে আঘাত করছিল— সেই আত্মপীড়ন থেকে তুমি রক্ষা পাও এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। আমাদের কত যে দুঃখ কত যে দায়িত্ব তার সীমা নেই— অথচ আমরা কেবল দুঃখটাকেই বহন করে চলেছি দায়িত্বকে গ্রহণ করচি নে এইটেতেই আমরা কেবলি নেবে যাচ্চি। সকল বড় বড় দেশেই এমন সকল বীর আছে যারা দুর্গতিকে চরম বলে কিছুতেই স্বীকার করে না— যারা নিজের প্রাণ দিয়েও তাকে উপহাস করে। আমরা আলস্য ঔদাস্য বশত দুর্গতির সঙ্গে আপোষে সন্ধি করে বসে আছি— এমন কি, তার পক্ষসমর্থন করে তার প্রশংসা করে তার বলবৃদ্ধি করচি। সেইজন্যে এতদিন আমি বড় দুঃখ পাচ্ছিলুম যে,

আমাদের দেশের যুবকেরাও এই ভীরুতা এই কপটতাকেও আত্মশ্লাঘায় পরিণত করে আস্ফালন করে বেড়াচ্চে। এতদিন এই নিয়ে কেবলি লড়াই করেছি এবং দেশের লোকের কাছ থেকে নিয়ত মার খেয়েচি। শেষ পর্য্যন্তই মার খেতে রাজি আছি কিন্তু মিথ্যা কথা বল্‌তে পারব না। যাই হোক আমার লেখাতে তোমার মন যে নিজের দিক থেকে সংসারের দিকে ফিরেচে— যে অস্ত্রে সে নিজেকে হনন করছিল সেই অস্ত্রকে মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েচে এতে আমি বড় আনন্দ পেয়েচি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি জয়ী হও, তুমি সার্থক হও এবং দুর্গমপথে তিনিই তোমার চিরসঙ্গী হোন্ যাঁর অভয় সিংহাসন মানুষের অমর আত্মায়। ১০ই আষাঢ় ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২৭ নবেম্বর ১৯১৯

তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম— তোমার কবিতাগুলি পড়েও আনন্দলাভ করেচি। এগুলি কিছু কিছু কাগজে ছাপতে দাও না কেন? বিশেষত গানগুলি।

শিলঙ থেকে ফিরে এসেচি। সেখানে বেশ ভালো ছিলুম। শরীরও সুস্থ হয়েছিল। স্থানটি রমণীয়। শান্তিনিকেতনে আমার বাসা বদল হয়েচে। এখন আছি মাঠের মধ্যে একা

—এ একটা নতুন দেশ বললেই হয়। বড় ইচ্ছা করে কিছু না করে চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকি। সে আমার ভাগ্যে এ যাত্রায় ঘটলো না। ছেলেবেলা থেকে কাজ ফাঁকি দেওয়াই আমার স্বভাব অথচ আমাকে যত কাজ করতে হয় এমন কোনো কর্ম্মনিষ্ঠ মানুষকে করতে হয় না। দিনের একটা উল্টো পিঠ যেটা রাত্রি— কাজের তেমনি একটা উল্টো পিঠ আছে— সেটা না থাকলে কাজটা যেন বিপত্নীক হয়ে পড়ে— অর্থাৎ নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া হয়। সেই কারণেই আমার কাজের জন্যে শ্রীমতী ছুটির সন্ধান মনে মনে সর্ব্বদাই করচি। অবশেষে যখন শ্রীমতী আসবেন তখন আমার কাজের আয়ু শেষ হয়ে আস্‌বে। সুতরাং কাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে তখন ছুটি হয়ে থাকবেন বিধবা— সেটাও তুর্গতি। ইতি ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

১৪

২৮ অগস্ট ১৯২০

ওঁ দক্ষিণ ফ্রান্স

Cap Martin,

Alpes Maritimes

কল্যাণীয়েষু

য়ুরোপে ঘুরে বেড়াচ্চি, অক্টোবরে আমেরিকায় পাড়ি দেব। Mary Pickford এর বিষয়ে Daily News এ আমার যে interview বেরিয়েছিল সে সম্বন্ধে Statesman, Englishman আমাকে গাল দিয়ে প্রবন্ধ লিখেচে তোমার

চিঠিতে জান্‌তে পারলুম। ভারতবর্ষ থেকে তোমরা একটা কথা ঠিক বুঝতে পার না যে ঐ সব কাগজের অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীর কাছে কতই অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষের মশার ডাক যেমন এখান থেকে একেবারেই শোনা যায় না ঐ সব কাগজের গুঞ্জনধ্বনিও তেমনি। মেরি পিক্‌ফোর্ড্‌ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য নিয়ে এখানকার লোকে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা করে নি, বরঞ্চ প্রশংসা করেছিল।

এখানকার যে সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তিলাভ করে। কেননা মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র— সেইখানে স্বার্থলোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়— সেইখানে মানুষ নিজের সুখদুঃখের, নিজের ভোগসম্ভোগের অতীত হয়ে বিচরণ করে— সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধরে রাখতে পারেনা, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবীকালবিহারী তারাই অমৃতলোকের অধিবাসী, কেননা মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্চে বর্ত্তমান, এইখানেই পদে পদে ক্ষয়, এইখানেই যত আঘাত যত নৈরাশ্য —এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মানুষ পীড়িত হয়— কেননা মানুষ হচ্চে "অমৃতস্য পুত্রঃ" মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী। সেই দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, খণ্ডকালে নয়। আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা আমাদের

মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়— সেই ব্যথা বর্ত্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে। সেই হচ্চে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্চে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘরমাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই।

আধুনিক ভারতবর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে বর্ত্তমানের সব দাবীও সে পূরাপূরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চল্‌চেনা, ঋণের প্রত্যাশায় সে ধনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে বসে আছে। কিন্তু যার বর্ত্তমানের সম্বল স্বল্প সে আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায়— আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতছি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্চি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবীকাল বাধাগ্রস্ত, এইজন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে পারচেনা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে যা লিখেচ তার কারণ হচ্চে মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসের বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সকল পরিবার

থেকে এই সব ছাত্র আসে তারা আত্মার দীনতা দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম্ম করতে নিযুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বদ্ধ হয় তাহলে বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। "কালোঽয়ং নিরবধিঃ" আমাদের পক্ষে সত্য নয়, "বিপুলা চ পৃথ্বীঃ" সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা।

মানুষ যখন তার কীর্ত্তির জন্যে বৃহৎকালের ক্ষেত্র না পায় তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করতেই পারে না, সে আপন অভাবকে হীনতাকেই ব্যক্ত করে। নিরন্তর যে দেশে কেবল এই অভাব এবং দুঃখ দুর্গতিই প্রকাশ পাচ্চে সেখানে আত্মার উপরে মানুষের শ্রদ্ধা চলে যায়— পরস্পরের কুৎসাবাদে ঈর্ষ্যাপরতায় সেই শ্রদ্ধাহীনতা মানুষের আত্মাবমাননাকে উদ্‌ঘাটিত করতে থাকে। আমাদের দেশের লোককে বারবার জানাতে হবে যে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ" আমরা দিব্যধামবাসী। কি করে জানাতে হবে? ত্যাগের দ্বারা। চিরন্তন কালের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে সেই ত আনন্দের সঙ্গে বর্ত্তমান কালকে ত্যাগ করতে পারে— এবং সেই চিরন্তন কালই আত্মার অমৃতধাম। পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে, অর্থ সংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহু লোক এখানে ভাবের জন্যে বস্তুকে, ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ কর্‌চে যে তার সংখ্যা নেই। সেই রকম অনেক লোককে দেখেচি। যতই দেখ্‌চি ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে মানুষের সেই

আত্মদানের দ্বারা— ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নৈব নৈব চ। কোনো রিফর্ম্ বিল্ আমাদের দুঃখসমুদ্র পার করাতে পারবে না— আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না— ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর— মণ্টেগ্যু সাহেব তাকে বাঁচাবে কি করে? উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

ইতি ২৮ অগষ্ট ১৯২০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
[অগস্ট ১৯২১]

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। তুমি যদি বিশ্বভারতীতে এসে যোগ দাও তাহলে আমার বড় আনন্দ হবে। কলকাতায় ১৫ই অগষ্ট তারিখে আমার এক বক্তৃতা আছে সেই জন্যে যত না লিখচি তার বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। অতএব ইতি।

কবে আস্তে পারবে?

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

*২ সেপ্টেম্বর ১৯২১

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

তুমি এম্-এ দেবে বলে তোমার বিশ্বভারতীতে যোগ দেবার কোনো বাধাই হবেনা। বরঞ্চ এখানে তুমি যে-কোনো সুবিধা চাও তা পাবে।

দেশে ফিরে এসে অবধি আমার বিশ্রাম নেই। বক্তৃতার ধারা চলেচে। আজ কাল দুদিন সঙ্গীত সভা আছে। তাই যেমন ব্যস্ত তেমনি ক্লান্ত আছি। তুমি এ অঞ্চলে কবে আস্‌বে?

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

তুমি এলে এখানে যে জায়গা হবেনা তা নয়। তোমার যখন ইচ্ছা আসতে পার।

Wellsকে যে চিঠি লিখেচ পড়ে দেখ্‌লুম। বেশ হয়েচে। আমার ইচ্ছা আছে একসময় তাঁকে নিমন্ত্রণ করব। সম্প্রতি আমাদের দেশের লোক বিদেশের লোকের প্রতি যে রকম

বিমুখ হয়ে আছে ঠিক এই সময়ে কারো এসে কোনো ফল হবে বলে মনে করি নে।

গান্ধি বলেন, পৃথিবীর লোক scienceএর নাম করে অনেক পাপ করচে। কিন্তু ধর্ম্মের নাম করে তার চেয়ে অনেক বেশি পাপ করে। আমাদের দেশে যে-untouchability নিয়ে তিনি কিছুদিন লড়েছিলেন সেও ত ধর্ম্মের উপরে টিঁকে আছে— আরো এমন হাজার হাজার পাপ আছে। সতীদাহও ত ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তাই বলে ধর্ম্মটাকে ত কেউ— অন্তত মহাত্মা— ঝাড়েমূলে উপ্‌ড়ে ফেলতে পরামর্শ দেন না। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

৩০ মার্চ ১৯২২

ওঁ [শিলাইদহ]

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তুমি যে-লেখাটির উপর অগ্নিবাণ বর্ষণ করেচ সে লেখা কোন এক কর্ম্মহীন মুহূর্ত্তে আমার চোখে পড়েছিল। মনে হয় নি এ লেখাটির জন্যে সমালোচনার স্মৃতিমন্দির রচনা করবার প্রয়োজন আছে। জগতে অনেক দুষ্কার্য্য ঘটে যা তার বিপুলত্ব ও প্রচণ্ডত্ব দ্বারা আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে দখল

দাবী করে— যেমন জালিয়ানবাগ। মহাত্মা এই ভীষণ অপকর্ম্মকে চিরস্মরণীয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি তাতেও আপত্তি করেছিলুম। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে ক্ষুদ্র উৎপাতটি ঘটেচে তাতে সাহিত্যিক machine gun দাগা হয়েছে বটে কিন্তু যেহেতু তার gunত্ব নেই machineত্বই আছে, এই কারণে তাতে কোন শোকবহ অপঘাত ঘটে নি— সুতরাং এই জিনিষটিকে স্মরণীয় এবং শোচনীয় করে তোলবার কোনও গুরুতর কারণ দেখিনে। এ পর্য্যন্ত আমি অনেক মার খেয়েছি কিন্তু মরি নি অতএব এই মারগুলিতে আমার গৌরব বৃদ্ধি করেচে— বাংলা সাহিত্যে আমি অভিমন্যু, অথচ অভিমন্যুর শেষ দশা আমার ঘটে নি। অতএব সপ্তরথী-গুলিকে আমি সাদর অভিবাদন করে সজ্ঞানে বিদায় নিতে পারব। এই গেল আমার দিকের কথা। তোমার তরফে বলতে পারি তুমি জোর কলমের পরিচয় দিয়েছ বটে। জোর মানে গদাঘাত নয়। তোমার মারের মধ্যে সূক্ষ্মতা, ক্ষিপ্রতা এবং কলানৈপুণ্য আছে— তাই পড়ে খুসি হলুম। সাহিত্যে তোমার অজ্ঞাতবাসের পালা শেষ হয়েচে এবারে প্রকাশবান হও। অর্জ্জুনও গোড়ায় যখন তীর অভ্যাস করেছিলেন নিশ্চয়ই মাটির পুতুলের উপর শরবর্ষণ করে হাত পাকিয়ে-ছিলেন— এবার তুমিও মাটির পুতুলটিকে যে রকম নাস্তানাবুদ করেচ তাই দেখে আমি তোমাকে খেলার ক্ষেত্র থেকে রণক্ষেত্রে নামতে অনুরোধ করচি।

অনেকদিন পরে শিলাইদার মায়াজালে আত্মসমর্পণ করে

দিয়েছি। এর প্রথম ধাক্কাটা না কাটিয়ে গেলে কোনো কাজে হাত দেওয়া চলে না। দক্ষিণ হাওয়া যখন প্রথম বনভূমিতে প্রবেশ করেন তখন খানিকক্ষণ কেবল পুরানো পাতা ঝরাবার পালা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, বড় বড় বনস্পতি একেবারে ন্যাড়া হয়ে যায়— তার পরে একটু সবুর করতে পারলেই যবনিকার অন্তরাল থেকে নতুন পত্র পুষ্পের দল অরণ্যের রঙ্গভূমিতে নাট্যলীলা সুরু করে দেয়। সেই যবনিকা ওঠা পর্য্যন্ত আমার এখানে থাকা হবে বলে আশা করিনে। অতএব সম্প্রতি কেবল রিক্ততার আলস্যেই দিন কেটে যাবে। পটভূমিকার প্রলেপ হবে চিত্র আঁকার সময় হবে না। পয়লা বৈশাখের পূর্ব্বেই আমাকে ফিরতে হবে। ইতি ১৬ চৈত্র ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৬ এপ্রিল ১৯২২

ওঁ [শিলাইদহ]

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার কবিতাটি বেশ লাগল— কোনো মাসিকে পাঠিয়ে দিয়ো। আমার এখানকার পালা সাঙ্গ হল। পুরানো শিলাইদহে সবই তেমনি আছে— বাড়ির দক্ষিণদিকে সিসু-

বীথিকায় অবিশ্রাম মর্ম্মরধ্বনি চল্‌চে, পূবদিকের আমবাগানে দুই কোকিলে সমস্ত দিন কুহু ধ্বনির কবির লড়াই চলেইচে, চষামাঠের মাঝে মাঝে গ্রামগুলি অবগুণ্ঠিতা গ্রামবধূর মত বেণুবনের ছায়ায় ঢাকা দাঁড়িয়ে আছে, পুকুরপাড়ে দুটো একটা গোরু আলস্যমন্থর ভাবে চরে বেড়াচ্চে, বাগানের পাঁচিলের ধারে নারকেল আর সুপুরি গাছ ঠিক যেন শিশুর মত আকাশের দিকে কেবলি হাত নাড়চে,— আকাশের নীল স্তব্ধ আর পৃথিবীর সবুজ চঞ্চল, এই উভয়ের মধ্যে দিনরাত কেবলি রঙের ইসারা চল্‌চে, দিনগুলো খেলার নৌকোর মত কেবলমাত্র পাখীর গান, কনকচাঁপার গন্ধ, বেণুবনের মর্ম্মর আর আলোছায়ার ঝিকিমিকি বোঝাই হয়ে আকাশের পূবঘাট থেকে পশ্চিমঘাটে পারাপার করচে— সবই তেমনি আছে কেবল আমার চিরপরিচিত পদ্মা শিলাইদা ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেছে তার আর নাগাল পাবার জো নেই। আমার পক্ষে এই বিচ্ছেদটি সামান্য নয়— যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই— সোনার নূপুর-গুলি রয়েচে পড়ে, মুরজমুরলী মৃদঙ্গ কিছুরই অভাব নেই, কেবল যে পা দুখানি নিরন্তর নৃত্য করে বেড়াত তারাই গেছে কোথায় চলে। যেখান থেকে কিছুদিনের জন্যেও চলে যাই ঠিক সেখানটিতে কিছুতেই আর পৌঁছতে পারিনে— রেলের ষ্টেশন ঠিক আছে, রেলগাড়িও চল্‌চে কিন্তু আসল জায়গাটি লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যে সরে যায় তার ঠিকানা পাবার জো থাকেনা।

আজ সন্ধের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। তার পরে দু চারদিন বাদেই তোমাদের ওখানে উপস্থিত হব। ইতি
২৩ চৈত্র ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

২৫ মে ১৯২২

নানা প্রকার কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে আছি। তার সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েমিরও যোগ আছে। লোকের কাছে এবং নিজের মনে মনে এইসব বাজে কাজের ব্যস্ততা নিয়ে নালিশ করে থাকি। কিন্তু যদি পরামর্শ নিয়ে কোনো ফল পাওয়া যেত তাহলে তোমাকে পরামর্শ দিতুম যে কোনোমতে একটা ঝঞ্ঝাট খুঁজে বের করে তার মাঝখানে ঢুকে পড়। বাছা'-জগৎ এবং বাজে জগৎ, জগতের এই দুই ভাগ আছে। কিন্তু বাছা জগতে কাজ না করতেই সময় যায়— এটা পছন্দসই নয়, ওটা তুচ্ছ, সেটা মোটা, এই রকম বিচার করতেই দিন কাটে। বাজে জগতে বাছ বিচার নেই, যা-তা নিয়ে হুড়োহুড়ি ক'রে হু হু শব্দে সময় চলে যায়। সময়টা স্রোতের মত যদি মনের উপর দিয়ে খুব জোর্‌সে বয়ে যেতে পারে তাহলে মনের উপরে অবসাদ জম্‌তে পারে না। খুব ফুর্ত্তি করে বাজে জগৎটার সঙ্গে ষোলো আনা-বেগে কারবার করতে শেখ। জানি তখন থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠে বল্‌বে "আর ত পারা যায় না।"

কিন্তু এই রকম নালিশ করাটা মানুষের সুখেরই একটা অঙ্গ। এই বাজে জগৎটা জগতের পনেরো আনা অংশ। বাকি জগৎটাতে আর্টিষ্টের দল নির্ব্বাসিত। তারা মাঝে মাঝে তুলি চালায়, গান গায়, আর বাকি সময়টা হায় হায় করে, কি-জানি-কি খোঁজে আর তাদের এই এক-আনী জগতের বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকে মরতে থাকে। তোমাকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে— তাতে তুমি যে ঘষড়ানি পাবে তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না— ভালই হবে— মজবুৎ হয়ে উঠবে। আজ আর বেশি সময় নেই— অন্যদিন যখন সময় পাব তখন কুঁড়েমিতে পেয়ে বসবে সে আরো মুস্কিল— সেইজন্যে কাজের সমূহতার ভিতরেই ঠেলে-ঠুলে একটু ফাঁক করে নিয়ে তোমাকে এই কয় লাইন লিখে দিলুম। ক্ষিতীশ সেনের তর্জ্জমাটি আমার ভালই লাগল। ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

২১

[ফেব্রুয়ারি ১৯২৩]

কল্যাণীয়েষু

১৬ই তারিখে প্রাতে শান্তিনিকেতন থেকে যাত্রা করে বিকেলে কলকাতায় পৌঁছব— ১৭ই তারিখে সন্ধ্যার সময় কাশীধামে যাত্রা করব। ইতিমধ্যে দেখা কোরো। ১৬ই বিকেলের দিকে এসো।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

১১ মে ১৯২৩

Jitbhumi
Shillong, Assam

তোমার চিঠি পড়ে বিস্মিত হলুম। তোমার উপরেও পুলিসের হস্তক্ষেপ হল? আমার গোরার গল্প মনে পড়চে। তোমাকে রাস্তা দিয়ে ওরা যে অপমান করে থানায় নিয়ে গেছে সেই অপমানের দৃশ্য আমি অনেকবার দেখেচি— সেই অপমান সকল মানুষেরই। এমনি ক'রে মানুষের ভিতরকার রিপু সমস্ত মানুষের পিঠেই দাগা দিয়ে দিচ্ছে। যতদিন এই রিপুর শাসন মানুষের মনে থাক্‌বে, ততক্ষণ আমাদের সকলকেই এই অপমান বহন করতে হবে। তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য হচ্চে গোড়া ঘেঁষে ঐ রিপুটাকে আক্রমণ করতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা নানা আকারেই আপনাকে নিষ্ঠুর-ভাবে প্রকাশ করে। ঘরে ঘরে তার প্রকাশ— সেই প্রকাশেরই ছোট ছোট ধারা সম্মিলিত হয়ে সমাজব্যাপারে রাষ্ট্রব্যাপারে আপিসে আদালতে নানা বড় আয়তনে বড় নাম নিয়ে মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করচে। মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ, তিনি ক্লাসের মধ্যে এই রিপুটিকে বহন করে নিয়ে আসেন— বড় বড় ধর্ম্মোপদেশককে যদি চেন তবে চিন্‌বে মানুষের প্রতি তাদের গভীর অবজ্ঞা— তাই ধর্ম্মের নামে মানুষের প্রতি অত্যাচার এমন সর্ব্বনেশে মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই অবজ্ঞার অপমান তুমি যে প্রকাশ্যভাবে কিছু বহন করেচ

ভালই হয়েচে— যে দুঃখ অনেকেই পায় তার অংশ না নিলে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া হয় না।

তুমি এবার শিলঙে এলে খুসি হতুম। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েচে। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে প্যারাগ্রাফ আকারে একটা লেখা শেষ করেচি। একটা নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে। তুমি কি ছুটিটা কলকাতাতেই কাটাবে? যদি আমার কোনো লেখা তর্জ্জমা করে দাও সেটাকে সংস্কার করে বিশ্বভারতী পত্রিকার কাজে লাগানো যেতে পারবে। তুমি যে আমারই বই আমাকে উপহার দিয়েছ এ তোমার নূতন পদ্ধতি। সম্পূর্ণ নূতন নয়। এর আগে য়ুরোপ থেকে একজন নিজের হাতে আমার কবিতার এক চয়ন কপি করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৩০

২৩

৪ জুলাই ১৯২৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বর্ষার মেঘ শান্তিনিকেতনের দিগন্তে নেমে এল তোমার দেখা নেই কেন? শীঘ্রই আসবে আশা করে তোমার দু'খানা চিঠির জবাব দিই নি। তার উপর একখানা নাটক লেখায় ও আর একখানা নাটক অভিনয় ব্যাপারে ঘোরতর ব্যস্ত ছিলুম। তার উপরে চিঠি লেখা সম্বন্ধে আমার

আলস্য প্রতিদিনই আমার প্রাপ্ত চিঠিপত্রের মতই আয়তনে বৃহৎ হয়ে উঠ্‌চে। আশ্রমে দুই একটি বিদেশী অতিথি আসচেন, তুমি থাকলে তাদের জন্যে ভাবতে হ'ত না। আমার নূতন নাটকটি পড়া হয়ে গেল। ক্ষিতীশের তর্জ্জমাগুলি বেশ হচ্চে। সমস্ত বলাকাটাই দেখচি একরকম হয়ে এল। যাই হোক ওখানকার জলসমুদ্রের ধার থেকে এখানকার মৃৎসমুদ্রের ধারে আসবার জন্যে একবার পাড়ি দেও দেখি। এই বর্ষার সময়ে পুরী কি ভালো? ইতি ১৯ আষাঢ় ১৩৩০

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

৮ অগস্ট ১৯২৩

[কলিকাতা]

অভিনয়ের পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কাটিয়ে আসব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু যাতায়াতের উপদ্রব এড়াবার জন্যে এই কদিন এখানে রয়ে গেলুম। শরীরটা এখনো ক্লান্ত এবং মনটা অবসন্ন আছে, তাকে আর নাড়া দিতে ভালো লাগ্‌চে না। বাদলা কেটে গিয়ে আজ পরিষ্কার রোদ্দুর উঠেচে। তেতালার ঘরে আমি একলা। আমার সেই সব ছেলেবেলাকার নির্জ্জন মধ্যাহ্ন মনে পড়চে। আবার একবার আমার সেদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ফিরে গিয়ে

কল্পলোকের রহস্যনিকেতনে তেমনি ক'রে পথ হারিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। তখন পৃথিবীর কোনো দায়িত্ব আমার উপর ছিল না— শুধু কেবল কবিতা লিখেচি— সে সব কবিতা জগতের লোকের কাছে জাহির করবার কোনো গরজ মনের মধ্যে ছিল না। হায়রে, সে দিনের মধ্যে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে গেচে— কেবলি জনতাবর্ত্তে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে হয়রান হলুম। তোমার সনেটগুলি বেশ ভাল লাগল। ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৩০

২৫

[অগস্ট ? ১৯২৩]

ওঁ [কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

নাটকটার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেচ সেটি বেশ হয়েচে। কেবল ওর মধ্যে আপত্তির কথা আছে এই যে তুমি বলেচ এ নাটক বিশেষভাবে পশ্চিমের পক্ষে উপযোগী। সাহিত্যের পক্ষে ভৌগোলিক বিভাগ থাক্‌তে পারে না। স্বরচিত যন্ত্রের হাতে মানুষ পীড়িত হচ্চে এই তথ্যটি ন্যূনাধিক পরিমাণে সব দেশেরই— কিন্তু তথ্য পদার্থটিই ত সাহিত্য নয়। মানুষের বেদনা— তার কারণ যাই থাক্— যখন সাহিত্যের আকার ধারণ করে তখন তার আর দেশভেদ থাকে না।

রিহার্সালের জালে জড়িয়ে আছি। নিষ্কৃতি পেলেই শান্তিনিকেতনে দৌড় মারব। চীনে যাত্রা কিছুদিনের মত পিছিয়ে গেছে। অভিনয়ের সময় আস্‌বে ত?

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

১১ অক্টোবর ১৯২৩

কল্যাণীয়েষু

ভিক্ষাবৃত্তির তাগিদে আরও দুই একদিন আমার যাওয়া পিছিয়ে গেল। আইডিয়ালের যে দিকটা বৈষয়িক সেদিক থেকে আমার মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তার একটা কারণ সে কাজে আমার লেশমাত্র দক্ষতা নেই বলে তা'তে পেট ভরে না দ্বিতীয় কারণ তাতে আমার জাতও যায়। ভিক্ষার ঝুলির ফাঁক অল্পই ভরে— তার শূন্যতার বোঝাটাই আমাকে প্রতিদিন জরাজীর্ণ করে তুল্‌চে।

আমি বোধ হয় শনিবারে আশ্রমে পৌঁছব। নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলচ্চি— তাতে তার রং ফুটচে বলেই বোধ হচ্চে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া সবটা একটানে পড়ে' গেলে বুঝতে পারব কোথাও ওর ওজনের বেঠিক আছে কি না। এই নাটকটা ক্ষিতীশকে দিয়ে

তর্জ্জমা করিয়ে নিলে কি রকম হয়? ইতিমধ্যে তুমিও চেষ্টা ছেড় না।

"সমস্যা" বক্তৃতাটাকে বহুল পরিমাণে মেজে ঘষে জনসভায় একদিন পড়েছিলুম। অধিকাংশ লোক বল্‌চে কিছু বোঝা গেলনা— সেটা একেবারে বাজে কথা— আসলে, ওদের বুঝতে ভাল লাগ্‌চেনা। কেউ কেউ বলে আমার কথাগুলো কবির মত, শুন্‌তে ভাল, কাজে ভাল নয়। আর কিছুদিন পরে এই কথাগুলো সকলেই আওড়াবে— অম্লান বদনে বল্‌বে ওগুলো তাদেরই চিরদিনের নিজের ভাবা কথা।

Oath নেওয়া সম্বন্ধে আমার সম্মতি ছিল এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে তা আমি ভাবি নি। দিশি সত্যাগ্রহ, বিলিতি সত্যাগ্রহ, মহাত্মাজির সত্যাগ্রহ, Scoutmasterএর সত্যাগ্রহ সবই আমি বর্জ্জনীয় বলে জানি। সত্যকে প্রতিজ্ঞার বাঁধনে বেঁধে তার গৌরব নষ্ট করে' যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় কোনো দিন আমি তাদের দলে নই এই কথাটা মেয়েদের আমার হয়ে বুঝিয়ে বোলো। ইতি ২৪ আশ্বিন ১৩৩০

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

[অক্টোবর ? ১৯২৩]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মেয়েরা যে oath নিতে রাজি হয়নি তাতে খুব খুসি হয়েচি। এই oath সম্বন্ধে আমার কি মত এণ্ড্রুজকে লিখেচি—তুমি তার কাছ থেকে সেটা কপি করে নিয়ে রেখো।

তোমার ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাসে ছেলেমেয়ে কেউ যায় নি সেটাতে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের চিত্তশূন্য অহঙ্কার প্রকাশ পায়। এদেরই জন্যে আমি আমার রক্ত জল করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্চি, নিজের আসল কাজ মাটি করচি এই কথা মনে করে পরিতাপ হয়। আমার সমস্তই ঢেলে দিলুম অথচ এদের কিছুই দিতে পারলুম না—এদের দীনতা ঘোচাবে কে ?

শীঘ্র শান্তিনিকেতনে ফিরব তখন সেই কবিতাটা নিয়ে গিয়ে তোমাকে দেব।

অসিতের যে প্যারাগ্রাফগুলি তর্জ্জমা করেচ সেগুলি পড়তে বেশ হয়েচে—কিন্তু বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে ঠিক খাপ খাবে না।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

[১৯২৪ ?]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার শরীর অসুস্থ শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। নিশ্চয় জেনো তোমার শরীরে রোগের মূল নয়, তোমার কল্পনায়। তোমার অন্তরতম গভীরতায় যেখানে আরোগ্যের সহজ প্রস্রবণ আছে সেইখানে প্রত্যহ অন্তরকে নিবিষ্ট করে নিজেকে জানিয়ো যে তোমার কোনো রোগ নেই— বনের ফুল যেমন সুস্থ তুমি তেমনি সুস্থ। তোমার বাহিরের আবরণ তোমার আত্মাকে পীড়িত করবে কেন? তোমার বিজয়ী আত্মা তোমার জীবনকে নিরাময় করুক জ্যোতির্ম্ময় করুক।

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। তুমি সুস্থ হয়ে যখনি এখানে আসবে তখনি তোমার স্থান ফিরে পাবে। আমি মার্চ্চের মাঝামাঝি চীনে যাত্রা করব। ফিরে আসব সম্ভবত অক্টোবরে, তখন তোমাকে

যেন সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখতে পাই। তুমি এখানে অতিথিশালার দ্বারে বাস করতে— দূরদেশ থেকে আগন্তুকরা আসত— তুমি ছিলে সেই প্রবাসীদের বন্ধু— তুমি তাদের যত্নের ত্রুটি করনি, তারাও সকলে তোমাকে ভাল বেসেচে। শান্তিনিকেতনের যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে তার অতিথিশালা— তুমি জান আমরা বেদ থেকে যে বাক্যটি মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেচি: "যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-নীড়ং"— শান্তিনিকেতনের সেই বিশ্বনীড়ে তুমিই অভ্যর্থনার ভার নিয়েছিলে। আবার যখন শীতের আরম্ভে অতিথিরা আসতে সুরু করবে তখন তোমার স্থান তুমি আবার গ্রহণ করতে পারবে এই প্রত্যাশা করে রইলুম।— প্রবাসীতে আমার কবিতা বোধ হয় এতদিনে পড়েচ। অনেককাল পরে বড় কবিতা লিখেচি। ইতি ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

২৮ অগস্ট ১৯২৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বঙ্গবাণী আজও পাইনি বলে' তথ্য ও সত্য বক্তৃতাটা পড়তে পারিনি। যা হোক তুমি যদি ওটা তর্জ্জমা করতে চাও ত রাজি আছি। আমি অভিনয়ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। কলকাতায় গেলে দেখা হবে। তুমি কি সমুদ্র পাড়ি দেবে বলে প্রস্তুত

হচ্চ? আমাদের জাহাজে জায়গা করেচ কি? ইতি ১২ ভাদ্র ১৩৩১

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১
২৮ মার্চ ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলি। এখন আমরা যাকে সায়ান্স্ বলি মানুষের মধ্যে চিরকালই তা আছে। এখন তাকে জীবনের অন্য অঙ্গ থেকে আমরা পৃথক করে বিশেষ নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। তার কারণ, বর্ত্তমান কালে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ নিজের কাজে খাটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে; এতে করে তার খুবই সুবিধা হচ্চে। তাই আজকাল এই সুবিধার চর্চ্চাটা মানুষের অন্য সমস্ত প্রয়াসের তুলনায় বড় হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মানুষ যখনি হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙেছে, লোহার শলা দিয়ে মাটি খুঁড়েচে, তাঁত বসিয়ে কাপড় বুনেছে তখনি সে সুবিধা-ঘটাবার বুদ্ধিকে জাগিয়েছে। তাতে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কখনো সে আপন হাতিয়ারকে নিয়ে গান গায় নি। তলোয়ার নিয়ে গেয়েছে, হাতিয়ার বলে নয়, তাতে বধ করবার সুবিধা হয়

বলে নয়— তার সঙ্গে বীরত্ব প্রকাশের প্রসঙ্গ আছে বলে'। এই বীরত্ব প্রকাশটার একটা চরমমূল্য আছে, কোনো একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র বলে' নয়। এর থেকে বুঝতে হবে, মানুষের চেষ্টা যেখানে চরমকে, ultimateকে, স্পর্শ করেছে সেইখানেই তার গান জেগেছে। একটা সুন্দর ঘট ব্যবহারযোগ্যতার মূল্যে মূল্যবান নয়, সে অমূল্য বলেই মূল্যবান, সে সুষমার গৌরবে প্রয়োজনের দরদস্তুরকে পেরিয়ে গেছে। এইজন্যে Grecian Urnএর উপর কবিতা লেখা চলেছে কিন্তু Grecian হাতুড়ির উপর চলে নি। Efficiency যতই বিস্ময়জনক হোক্ কোনোদিন মানুষের মনে সুর জাগায় নি ; implements মানুষকে সম্পদশালী করেছে কিন্তু inspire করে নি। যেখানে কোনো উৎকর্ষ, perfection, আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, অর্থাৎ যেখানে সে অসীমে পৌঁছিয়েছে সেইখানেই সে মানুষকে কবি করেছে, রূপকার করেছে। প্রেয়সীর হাতের কাছে মানুষ সম্পূর্ণ হার মান্‌তে রাজি কিন্তু কারিগরের হাতিয়ারের কাছে নয়। আজকালকার দিনে সুবিধার বিশ্বজোড়া হাটে মানুষ বড় বড় হাতিয়ার সব তৈরি করচে, প্লেটোর আমলে এস্কিলসের আমলে তা ছিল না, সেই অভাববশত মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র খাটো ছিল না। বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারের যোগে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বড় ও সংখ্যায় বহুল হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ হয়েচে Giant, কিন্তু স্বয়ং মানুষ তাতে বড় হয় নি। মানুষের personalityর মহত্ত্বর চেয়ে তার সাংসারিক সুবিধাসাধনের সুযোগ বড় নয়। এইজন্যেই

কলকারখানা নিয়ে কোনো আধুনিক দান্তে *Vita Nuova* লিখ্‌চে না— কারণ ওতে নূতন থাকতে পারে কিন্তু Vita নেই। মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল সেদিন স্তবগান করেছিল ; আগুনে তার রান্নার সুবিধা হয়েছিল বলে নয়, আগুনের নিজের মধ্যেই একটি চরম রহস্য আছে বলে। মানুষের কুড়ালের মধ্যে কোদালের মধ্যে সেই চরম রহস্য নেই। বিজ্ঞান যেখানে পরমাণুর পরমতত্ত্বের সাম্‌নে আমাদের বিস্মিত মনকে দাঁড় করায় সেখানে চরমকে দেখি— আমি সেই চরমের বন্দনা করেছি। কিন্তু বাষ্পের যোগে যেখানে রেলগাড়ি চলে, সেখানে cleverকে দেখি perfectকে দেখিনে, সেখানে Vulcanকে দেখি Apolloকে দেখিনে। সেখানে কারখানাঘরে প্রবেশ করি, সৃষ্টির রহস্যমন্দিরে নয়। সেখানে কুশ্রীতার লজ্জা নেই, সেখানে অসম্পূর্ণতা নগ্ন। সেখানে মাংসপেশি ফুলে উঠেছে কিন্তু লাবণ্য কোথায় ? সেখানে স্থূলকে দেখি অনির্ব্বচনীয়কে দেখিনে ত। তাই বাহবা দিই, কিন্তু সে বাহবায় ছন্দ আসেনা। আজকের কালের বিরাট কারখানাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জগৎসুদ্ধ লোক ভয়ে বিস্ময়ে লোভে সমস্বরে বাহবা দিল, কিন্তু জানু নত হল না, প্রণাম করলে না, কেননা এ তো মন্দির নয়। পুরাতন দেবমন্দির মানুষ ভেঙে দিচ্চে, কিন্তু নূতন দেবমন্দির এখনো তো গড়া হ'ল না, তাই বলেই কি পূজার অর্ঘ্য নিয়ে যেতে হবে তার হাটের আড়ৎ ঘরে ? ইতি ২৮ মার্চ্চ ১৯২৫

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

[১৯২৫]

কল্যাণীয়েষু

শুনচি বৃষ্টির চিহ্ন নেই। আমার দ্বারের কাছে যে গাছ-পালাগুলি অতিথি আছে তাদের অন্নজলের একান্ত অনটন যেন না ঘটে। তোমার নিজের অবস্থা কি রকম?

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

১৮ নবেম্বর ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

বহুকাল তোমার কোনো খবর না পেয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলুম। চিঠি পেয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু বুঝচি তোমার শরীর তেমন ভালো নেই। মাঝে মাঝে খবর দিয়ো।

আমার শরীরের অবস্থা ভাঙন্ ধরা— আমার বয়সের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে। অনেকদিন ধরে খুব পূরো দমে দেহ-যন্ত্রটা চালিয়ে এসেছি, আজ তার স্ক্রু আলগা হয়ে গেছে। আমার দমও বেশি বাকি নেই। অতএব দেহটাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন চাকা খড়্খড়্ ঝনঝন করতে করতে আরো কিছু দিন চল্‌বে। কিন্তু ঝাঁকানির চোটে অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

এদিকে কাঁধের উপরে এক মস্ত দায় চেপেছে— সর্ব্ব-ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের সভাপতি হয়ে বসেছি কতকটা আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেনের গতিক। ইংরেজিতে একখানা বক্তৃতা লিখ্‌তে বসেছি— যতক্ষণ সভায় পড়া না হবে সেই বিলিতী ভূতটার পিণ্ডদান শেষ হবে না, মগজের মধ্যে তার উৎপাত চল্‌তে থাকবে। এ সমস্তর উপরে সম্পাদক-বর্গের দাবী বহুধা হয়ে আমাকে ব্যস্ত করে তুলেছে।

কাল পালাচ্চি শান্তিনিকেতনে। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৩২

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

ওঁ

আগরতলা

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম। এতদিন তোমার জন্যে মন উদ্বিগ্ন ছিল। মহাকালের হাতে তোমার শুশ্রূষা চল্‌চে, তাঁরই ভাণ্ডারে আরোগ্যের অমৃত আছে।

আমি নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে আছি। এখানে এসে কতকটা বিশ্রাম ভোগ করতে পারচি। বসন্তে এখানে বনশ্রী যৌবনে প্রফুল্ল হয়ে উঠেচে— আমার ঘরের বাতায়নের কোণটি থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছি।

আগামী রবি কিম্বা সোমবারে কলকাতায় পৌঁছব। ইতি
১২ ফাল্গুন ১৩৩২

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫
৩০ জুন ১৯২৬

ওঁ

Villeneuve

কল্যাণীয়েষু

··· ইটালীতে খুব হট্টগোলের মধ্যে কেটেচে। এখন এতটা আমার সহ্য হয় না। তাই ট্যুরিনে আবার আমার বুকের অসুখটা বেড়ে উঠেছিল। এখানে এসে ভাল আছি।

ভারি সুন্দর জায়গা। লোকের ভিড়ও নেই। রোমাঁ রলাঁ আমাদের প্রতিবেশী। রোজই তাঁর সঙ্গে দেখা ও আলাপ আলোচনা চলচে।

চিঠি লিখতে ভারি একটা বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। সব সুদ্ধ ভয়ঙ্কর একটা কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেছে। অথচ কাজ যথেষ্ট করতে হচ্চে। যারা স্বভাবতই কুঁড়ে তাদেরই অস্বাভাবিক রকম খাটতে হয়, পৃথিবীর এই নিয়ম। যারা কাজের লোক তাদের জন্যে দশটা চারটে, আর যারা অকাজের তাদের জন্যে ঘণ্টা গণনা আর চলে না।···

আজ রাত হল অনেক, শরীর ক্লান্ত, ঘুম পাচ্চে। ইতি
৩০ জুন ১৯২৬

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬
১৯২৬

ওঁ

অমিয়,

এইরকম দুটো লাইন যোগ করলে কী রকম হয়?

হে উদার, কর সবার অহঙ্কার মুক্ত,
স্মরণে তব চরণে হ'ব ত্যাগ-যোগযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭
৩১ মার্চ ১৯২৭

কল্যাণীয়েষু

কবিতাটিতে পাঠান্তর হবে। আছে—
"আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে,
তব নীল লাবণ্যের বাঁশিখানি দূর হ'তে বাজে।"

কিন্তু হবে—

"আমি আজ কোথা আছি প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে,
তব নীল লাবণ্যের বংশিধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।"

ইতি

ভরতপুর, ১৭ চৈত্র [১৩৩৩]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

১ জুন ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যদি এমন কোনো পুরোনো চিঠি পাও যা প্রকাশযোগ্য, তাহলে প্রবাসীতে পাঠিয়ো। বিচিত্রায় ভানুসিংহের পত্রাবলী যাচ্চে— আর বেশি ভালো নয়।

গল্পটা অল্প অল্প করে লিখচি। কি রকম হচ্চে জানিনে। পূর্ব্বেকার স্টাইল থেকে তফাৎ হবে মনে হচ্চে। বিষয়টা কঠিন।

কখনো কখনো সময়ের একটু আধটু ফাটল দিয়ে বুনো-লতার মতো দুই একটা কবিতাও বেরোচ্চে। তারি একটা তোমাকে পাঠাই। একজন মেয়ে লিখ্‌তে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে পাঠিয়েছি।

তোমার খাওয়াদাওয়া আশা করি ঠিকমতো চল্‌চে। শরীর ভালো আছে তো। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পাচ্চ বোধ হয়।

যে বইগুলো বিদেশ থেকে আসে না পাঠালে চিঠির জবাব দিতে পারিনে। ইতি ১৮ জ্যৈঃ ১৩৩৪

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখন

"দাও লেখা দাও" দেয় কতজন তাড়া,
চারদিকে চাই, না পাই বাণীর সাড়া।
চায় তা'রা যেই, সংশয়ে সেই ধরে—
"এ নয় যে-জন লেখন-সৃজন করে,"
লক্ষ্মী-ছাড়ার মিথ্যে দুয়ার নাড়া॥

চাবার মানুষ চায় না যখন কেহ—
"তীখন্ কথার লিখন-ভিখন দেহ"—
হাটের পথিক নাই যবে কেউ বাকি,
একলাটি গায় বউ-কথা-কও পাখী,
হরিণ-শিশুর নাই মনে সন্দেহ,—

ক্লান্ত সমীর শান্ত কোমল শ্বাসে
অস্ফুট সুর লাগায় যখন ঘাসে,
তখন হঠাৎ আল্‌গা দুয়ার খোলা,
স্বপন-মগন-নয়ন, আপন-ভোলা
লেখক যে-জন বাহির ভুবনে আসে॥

যখন-তখন লুকিয়ে তাহার আসা,
প্রদোষ আলোয় পথ-হারা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
নাই জানা কোন্ শাখায় সে ফুল তোলে,
চক্ষে তাহার কোন্ ইসারার ভাষা॥

বৈশাখী ঝড় যখন আঘাত হানে
সন্ধ্যা-সোনার ভাণ্ডারদ্বারপানে,
মেঘের উপর দারুণ তাহার দাবী,
কুণ্ঠিত মেঘ লুকায় সোনার চাবী,
গগন আপন অবগুণ্ঠন টানে॥

তারপরে যেই শিউলি-ফুলের বাসে
শরৎ-লক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দ-কলির স্নিগ্ধ শীতল কথা,
আকাশ সে কোন্ স্বপন-আভায় হাসে,

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ ক্ষেতের নবীন ধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোক ছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে,—

হঠাৎ তখন সূর্য্য-ডোবার কালে
দীপ্তি জাগায় দিক্‌ললনার ভালে,
মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দ্দা আঁধার কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,—
পরম আশার চরম প্রদীপ জ্বালে॥

১৮ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

৪ জুন ১৯২৭

কল্যাণীয়েষু

আমি আর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কলকাতায় যাব। জাভা যাওয়া স্থির। ১৬ই জুন জাহাজ মাদ্রাজ থেকে ছাড়বে। অতএব আর চিঠিপত্র এখানে পাঠিয়োনা। সেই যে-লেকচারগুলো ম্যাকমিলানরা ফিরে পাঠিয়েচে জাভায় দরকার হবে। যদি শান্তিনিকেতনে না যাই তাহলে সেগুলো নিয়ে কলকাতায় এসো। যথাসময়ে খবর পাবে। আমি বোধ হয় ১০ই কলকাতায় পৌঁছব। গল্প ধীরে ধীরে চলবে— আমার যত বয়স ততগুলো পাতা এগিয়েচে। ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

*৮ জুন ১৯২৭ [শিলং]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শুক্রবারে কলকাতায় পৌঁছব। তুমি রাণুর চিঠির খাতা ও আমার সেই Lecturesগুলো নিয়ে কলকাতায় চলে এসো। সময় নেই। ২।৩ দিনের মধ্যেই জাভায় রওনা হব— শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সময় পাবো না। ইতি বুধবার

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

১২ অগস্ট ১৯২৭

ওঁ ইপো

কল্যাণীয়েষু

এবারে দেশ থেকে বেরিয়ে অবধি পরিশ্রমের আর অন্ত নেই। জাহাজে ছিলেম দিনছয়েক— সমুদ্র খুব শান্ত ছিল— মনসুন ঠেলা মেরে তাকে জাগিয়ে তোলে নি। জাহাজওয়ালারা আমাকে লেখবার পড়বার জন্যে খুব ভালো ঘর দিয়েছিল। রাণীকে চিঠি লেখবার উপলক্ষ্য করে কিছু লিখেছিলুম— ভেবেছিলুম চিঠির রাস্তা ধরলে কলম তুল্‌কি চালে চল্‌বে— কিন্তু যে বাণী অন্তর্যামিনী তাকে ফাঁকি দিয়ে ভোলানো যায় না— তার কাছে যেই ধরা পড়ল চিঠি যাচ্চে

সম্পাদকের দরবারে, তার বাহন রাণী, অমনি কলমের মুখে কাঁঠালিচাঁপা হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল এক একটা কাঁঠাল, অত্যন্ত সারবান, অত্যন্ত ভারবান— যাকে বলে প্রবন্ধ,— সে হাওয়ায় দোলেনা, মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে··· সেই আলাপ আলোচনার সংস্কার সাধনে লাগ্‌তে হল— এই কাজটা বড়ো দুঃখের। এ যেন পুরোনো কাপড় রিফু করবার সরঞ্জাম নিয়ে নতুন কাপড় বুনে যাওয়ার মতো।··· প্রতিলেখন পড়তে পড়তে দেখা গেল যে, মানুষ শুধু কান দিয়ে শোনে না; কথা তার "কানের ভিতর দিয়া মরমে" পশে। তার কানে-শোনা কথাগুলো মরমের হাতে পড়ে যে মূর্ত্তি ধরে তাকে বক্তার নামে চালাবে না শ্রোতার নামে? সেটা ব্যক্তিবিশেষের মরমের উপর নির্ভর করে। কারো কারো মরম অন্যের কথা শোনবার সময় নিজের কথা থামিয়ে দিতে পারে না, অর্থাৎ একজন যখন এক সুরে বীণা বাজাচ্চে তখন আর একজন আর এক সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলে— যেন ধনীর বাড়ির বিয়েতে শানাই আর গড়ের বাদ্যি একই সময়ে আওয়াজ দিতে থাকে।··· জীবনে যা বৃষ্টি আকারে বর্ষণ হয় তাকে শিলবৃষ্টি আকারে প্রকাশ করলে সেটা অসত্য হয়ে ওঠে এ কথা বোঝা উচিত। সব কথা প্রকাশ করবার নয় কেননা সব কথা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভূমিকা নেই— বৈঠকখানার বিশ্রব্ধ আলাপ চিৎপুর রোডের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে মেগাফোনে ঘোষণা করলে তার সত্যতা থাকে না। তা ছাড়া এই যে প্রকাশ করবার নেশা এটা সকল অবস্থায় শোভন নয়— হৃদয়হীন পাব্লিকের

কৌতূহল মেটাবার জন্যে দরদ-ওয়ালা কথার ফেরি করা অন্যায়— এতে ইতিহাস রক্ষাও হয় না, কেননা নির্বিচারে সবরকম কথাকে একত্র পুঞ্জীভূত করাকে ইতিহাস বলে না— মুহূর্ত্তের জিনিষকে চিরদিনের আসনে বসালে ইতিহাসকে নষ্ট করাই হয়।…

এই তো গেল লেখার হাঙ্গামা। তারপর, আদর অভ্যর্থনা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বক্তৃতা মোটর যাত্রা রেলযাত্রা প্রভৃতিতে অতিমাত্রায় ঠাসা হয়ে আমার দিনগুলো নানা আকারে ফুলে উঠেচে— ঠিক যেন আমাদের সুনীতির ঝুলিটার মতো— তার মধ্যে ময়লা কাপড় থেকে আরম্ভ করে পিতলের তৈজসপত্র পর্য্যন্ত সকল প্রকার অসঙ্গত জিনিষের সঙ্গতি— বাহকেরা যখন বহন করে, দেখি, তাদের পিঠ বেঁকে যায়। আমারো পিঠ বেঁকে এসেচে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয়, আর পেরে উঠ্‌চিনে। আমার দিনের ঝুলি সুনীতির ঝুলির মতোই প্রত্যহ তার বোঝাই বাড়িয়েই চলেচে— এখন কেবলি মনে হচ্চে আর ওটাকে টেনে বেড়ানো চলেনা। আশার কথা এই যে এখানকার পথের প্রায় প্রান্তে এসেচি। আজ ১২ই তারিখ— ১৬ই তারিখে জাভার মুখে পাড়ি দেব। তখন আর একটা ঝুলি ভর্ত্তি করা সুরু হবে।

শান্তিনিকেতনের শ্রাবণীমূর্ত্তির আভাস তোমার চিঠিতে পেয়ে ক্ষণকালের জন্যে মনটা ব্যাকুল হোলো। আমাদের সাম্‌নে এখনো অন্তত দুটো মাস আছে। অর্থাৎ আশ্রমে যখন শিউলিফুলের দিন ফুরিয়ে আস্‌বে তখন সেখানে ফিরব।

বিচিত্রায় সাহিত্যধর্ম্মে দুই একটা ভুল দেখলুম— এক-জায়গায় "রাজপুত্র" হবে সেখানে "রাজকন্যা" হয়েচে— সংসারে উভয়ের মধ্যে মিলন হয়ে থাকে, তাই বলে পার্থক্য লুপ্ত হয় না। আর এক জায়গায় "পাপড়ি" আছে সেখানে "পাখ্‌না" হবে।

তিন সপ্তাহ হয়ে গেল এ পর্য্যন্ত তোমার চিঠি ছাড়া আর কোনো চিঠি পাই নি— তোমাদের সব খবর জানতে চাই— মনে হচ্চে যেন দ্বীপান্তরে এক যুগ হয়ে গেল। ইতি ১২ অগস্ট ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২
২৩ অগস্ট ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চিঠি লেখার সময় পাই নে। গোলমালে দিন কাটচে। দেশটা সুন্দর। আজ বালি অভিমুখে যাচ্চি— সেখানে আরো সুন্দর। দেশে ফেরবার পূর্ব্বে বিস্তারিত খবর কিছুই পাবে না। তোমাদেরও খবর বিশেষ কিছু পাই নে। স্রোতের শেওলার মত ভাসচি। কোথাও কোনো মাটির সঙ্গে যোগ আছে মনে হ'চ্চে না। ২৩শে অগস্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আজ বালিদ্বীপে আমাদের শেষ দিন। মুণ্ডুক বলে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাঙলায় আশ্রয় নিয়েছি। এটা বালির পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে। পশ্চিম অংশে এতদিন ঘুরেছি— সমস্তই চাষ-করা বাস-করা জায়গা,— লোকালয়গুলি নারকেল সুপারি আম তেঁতুল সজনে গাছের ঘনশ্যামল বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এতদিন পরে এখানে পাহাড়ের গা-জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল। কতকটা শিলঙ পাহাড়ের মতো। নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের ক্ষেত, পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত। আকাশে অল্প একটু অস্পষ্টতার আবরণ। এখানকার পুরনো ইতিহাসের মতো। এখন শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু এমন রাত্রে আমাদের দেশের চাঁদ দিগঙ্গনাদের কাছে যেমন সম্পূর্ণ ধরা দেয় এখানে তা নয়, যে ভাষা খুব ভালো করে জানি নে যেন সেই রকম তার জ্যোৎস্নাটি। সে ভাষা ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে কানে আসে, ষোলো আনা প্রাণে এসে পৌঁছয় না।

এতদিন এ দেশটা একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। আহূত রবাহূত বহু লোকের ভিড়। কত ফোটোগ্রাফ-ওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কত ক্ষণিক পরিব্রাজকের দল।

পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ। মোটরের ধূলোয় এবং ধমকে আকাশ ম্লান। খেয়া-জাহাজ কাল জাভা অভিমুখে ফিরবে, তাই প্রতিবর্ত্তী যাত্রীর দল আজ নানা পথ বিপথ দিয়ে চঞ্চল হয়ে ধাবমান। এত সমারোহ কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পার।

বালির লোকেরা যারা হিন্দু, যারা নিজের ধর্ম্মকে আগম বলে, শ্রাদ্ধক্রিয়া তাদের কাছে একটা খুব বড়ো উৎসব। কেননা যথানিয়মে মৃতের সৎকার হলে তার আত্মা কুয়াশা হয়ে পৃথিবীতে এসে পুনর্জ্জন্ম নেয়, তারপরে বারে বারে সংস্কার পেতে পেতে শেষকালে শিবলোকে চরম মোক্ষে তার উদ্ধার।

এবারে আমরা যাঁদের শ্রাদ্ধে এসেছি তাঁরা দেবত্ব পেয়েছেন ব'লে আত্মীয়েরা স্থির করেছে, তাই এত বেশি ঘটা। এত ঘটা অনেক বৎসর হয় নি, আর কখনো হবে কিনা সকলে সন্দেহ করচে। কেননা, আধুনিক কাল তার কাটারি হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্চে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব্ব করবার জন্যে, তার একমাত্র উৎসাহ উপকরণ-বাহুল্যের দিকে।

এখানকার লোকে বল্‌চে, সমারোহে খরচ হবে এখানকার টাকায় প্রায় চল্লিশ হাজার, আমাদের টাকায় পঞ্চাশ হাজার। ব্যয়ের এই পরিমাণটা সকলেরই কাছে অত্যন্ত বেশি বলেই ঠেকচে। আমাদের দেশের বড়ো লোকের শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ হচ্চে, আমাদের শ্রাদ্ধের খরচ ঘটা করবার জন্যে নয় যেমন পুণ্য করবার জন্যে। তার প্রধান অঙ্গই দান, পরলোকগত

আত্মার কল্যাণকামনায়। এখানকার শ্রাদ্ধেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অর্ঘ্য ও আহার্য্য দান যে নেই তা নয়, কিন্তু এর সবচেয়ে ব্যয়সাধ্য অংশ সাজসজ্জা, সে সমস্তই চিতায় পুড়ে ছাই হয়। এই দেহকে নষ্ট করে ফেল্‌তে এদের আন্তরিক অনুমোদন নেই, সেটা সেদিনকার অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপারে বোঝা যায়। কালো গোরুর মূর্ত্তি, তার পেটের মধ্যে মৃতদেহ, রাস্তা দিয়ে এটাকে যখন বহন করে নিয়ে যায়, তখন শোভাযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। যেন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেন অনিচ্ছা। বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়। এইখানেই আগম, অর্থাৎ যে-ধর্ম্ম বাইরে থেকে এসেছে তার সঙ্গে এদের নিজের হৃদয়বৃত্তির বিরোধ। আগমেরই হল জিত, দেহ হল ছাই।

উবুদ ব'লে জায়গার রাজার ঘরে এই অনুষ্ঠান। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব'লে সুনীতির পরিচয় পেলেন সুনীতিকে জানালেন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এমন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে এদেশে পুনর্ব্বার হবার সম্ভাবনা খুব বিরল অতএব এই অনুষ্ঠানে তিনি যদি যথারীতি শ্রাদ্ধের বেদমন্ত্র পাঠ করেন তবে রাজা তৃপ্ত হবেন। সুনীতি ব্রাহ্মণসজ্জায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে "মধুবাতা ঋতায়ন্তে" এবং কঠোপনিষদের শ্লোক প্রভৃতি উচ্চারণ ক'রে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন বেদমন্ত্র-গানের সঙ্গে এই দ্বীপে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, বহুশত বৎসর পরে এখানকার শ্রাদ্ধে সেই মন্ত্র হয়তো বা শেষবার ধ্বনিত হ'ল। মাঝখানে কত বিস্মৃতি, কত বিকৃতি। রাজা

সুনীতিকে পৌরোহিত্যের সম্মানের জন্মে কী দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুনীতি বলেছিলেন, এই কাজের জন্মে অর্থগ্রহণ তাঁর ব্রাহ্মণবংশের রীতিবিরুদ্ধ। রাজা তাঁকে কর্ম্ম-অন্তে বালির তৈরি মহার্ঘ্য বস্ত্র ও আসন দান করেছিলেন।

এখানে একটা নিয়ম আছে যে, গৃহস্থের ঘরে এমন কারো যদি মৃত্যু হয় যার জ্যেষ্ঠরা বর্ত্তমান তা হলে সেই গুরুজনদের মৃত্যু না হলে এর আর সংকার হবার জো নেই। এইজন্মে বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত মৃতদেহকে রেখে দিতে হয়। তাই অনেকগুলি দেহের দাহক্রিয়া এখানে একসঙ্গে ঘটে। মৃতকে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

সংকারের দীর্ঘকাল অপেক্ষার আরো একটা কারণ, সংকারের উপকরণ ও ব্যয়বাহুল্য। তার জন্মে প্রস্তুত হতে দেরি হয়ে যায়। তাই শুনেচি, এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

শবাধার বহন করে নিয়ে যাবার জন্মে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেকসংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ূরপংখী যেমন ময়ূরের মূর্ত্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ; তার দুই ধারে বিস্তীর্ণ মস্ত দুই পাখা, সুন্দর করে তৈরি। শিল্পনৈপুণ্যে বিস্মিত হতে হয়। শ্রাদ্ধের এই নানাবিধ উপকরণের আয়োজন মনের ভিতরে সবটা গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। যেটা সবচেয়ে দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ

করে সে হচ্চে জনতার অবিশ্রাম ধারা। বহু দূর ও নানা দিক থেকে মেয়েরা মাথায় কত রকমের অর্ঘ্য বহন ক'রে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেচে। দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে, যেখানে অর্ঘ্য মাথায় বাহকেরা যাত্রা করতে প্রস্তুত, সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায় গামেলান বাজিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র উৎসব চল্‌চে। সর্ব্বসাধারণে মিলে দলে-দলে এই অনুষ্ঠানের জন্যে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা করে দিচ্চে। অর্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন করে আনা নয়, সমস্ত বহু যত্নে সুসজ্জিত। সেদিন দেখলুম, ইয়াং-ইয়াং ব'লে এক শহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তাঁর উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তাঁর প্রাসাদের পুরনারীরা, কি শোভা, কি সজ্জা, কি আভিজাত্যের বিনয়সৌন্দর্য্য! এমনি করে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণ বিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না।

সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয়, এইরকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দমিলনটি কি কল্যাণময়। এই মিলন কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র সুন্দর অবয়ব। নানা গ্রামে, নানা ঘরে, এই উৎসবমূর্ত্তিকে অনেক দিন থেকে নানা মানুষে বসে বসে নিজের হাতে সুসম্পূর্ণ করে তুলেচে। এ হচ্চে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত সৃষ্টি, যেমন করে এরা নানা লোক বসে নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে সুর মিলিয়ে একটা সচল ধ্বনিমূর্ত্তি তৈরি করে তুল্‌তে থাকে। কোথাও অনাদর

নেই, কুশ্রীতা নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেল না। জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের সৃষ্টি হয় নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্য্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি ; তিনি রেলগাড়িতে চড়ে বেড়ান না, টেলিগ্রামের ডাণ্ডাটার উপরে দাঁড়িয়ে থাকেন না। সুন্দরের সঙ্গে কল্যাণ যেখানে এক, সেইখানেই তিনি। যেখানে বিরোধ ঠেকাবার জন্যে পুলিসবিভাগের লাল পাগ্‌ড়ি সেখানে নয়, যেখানে অন্তরের আনন্দে মানুষের মিলন কেবল যে নিরাময় নিরাপদ তা নয়, আপ্‌না-আপ্‌নি ভিতরের থেকে সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ,— সেইখানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিষটিকে এমনিই সুসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা করি নিজের দেশে। কিন্তু এই ছোটো দ্বীপের রাস্তার ধারে যে ব্যাপারটিকে দেখা গেল সে কি সহজ কথা! কত কালের সাধনায় ভিতরের কত গ্রন্থি-মোচন করে তবে এইটুকু জিনিষ সহজ হয়। জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত, সেই ঐক্যকে সকলের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সুন্দর করে তোলা কতই শক্তিসাধ্য। আমরা যেখানেই যে কোনো কাজেই কয়েকজন মিল্‌তে চেষ্টা করেচি সেখানে কত ঔদাসীন্য, কত অহমিকা, কত বিরোধ ভেতর থেকে নানা মূর্ত্তিতে বেরিয়ে পড়তে থাকে। এইসব গ্লানি দূর করবার জন্যে আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হয়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে

নানা মূর্ত্তিতে নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন আপন ইচ্ছার আপন আপন শক্তির যোগদান করতে থাক্‌লে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচা-গুলো ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায়,— ঝরনার জল ক্রমাগত বইতে থাক্‌লে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হয়ে আসে। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন, সাধনায় জ্ঞান ও কর্ম্মই যথেষ্ট। কিন্তু বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েচেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনি প্রাণ আসে, তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়, সৌন্দর্য্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

বেলা আটটা বাজ্‌ল। বারান্দার সাম্‌নে গোটা দুই তিন মোটরগাড়ি জমা হয়েচে। সুরেনে সুনীতিতে মিলে নানা আয়তনের বাক্সে ব্যাগে ঝুলিতে থলিতে গাড়ি বোঝাই করচেন। তাঁরা একদল আগে থাকতেই খেয়াঘাটের দিকে রওনা হবার অভিমুখী। নিকটের পাহাড়ের ঘনসবুজ অরণ্যের পরে রৌদ্র পড়েচে, দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত। দক্ষিণ শৈলতটের সমুদ্রখণ্ডটি নিঃশ্বাসের ভাপ লাগা আয়নার মতো ম্লান। ঐ কাছেই গিরিবক্ষ-সংলগ্ন পল্লীটির বনবেষ্টনের মধ্যে সুপুরি গাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুল্‌চে। ঝরনা থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল বয়ে আনচে। নীচে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপারে সাম্‌নের পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের

অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়। নারকেলগাছ-গুলি মেঘমুক্ত আকাশের দিকে পাতার অঞ্জলি তুলে ধরে সূর্য্যালোক পান করচে।

এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত্তে মনে মনে ভাবচি দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভালো তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁচচ্ছে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েচি বলেই যে এমন হয় তা নয়,— ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আলোতে নদীতে প্রান্তরে প্রকৃতির একটি উদারতা দেখেচি, চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেচে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্ত্তি চার দিকে— তবু সমস্তকে অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদিকালের যে কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আশ্বাস পাই। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা যত বেশি এমন আর কোথাও দেখি নি তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। অতি দূরকালের তপোবনের ওঙ্কার ধ্বনি এখনো সেখানকার আকাশে যেন নিত্য-নিস্বসিত। তাই আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তার আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত করে রয়েচে। ইতি ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ। দ্রুত চল্‌তে চল্‌তে উপরে উপরে যে ছবি চোখে জাগ্‌ল, যে ভাব মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল তাই লিখে দিয়েছি, কিন্তু তাই বলে এটাকে বালির প্রকৃত বিবরণ বলে গণ্য করা চল্‌বে না। এই ছবিটিকে হয়তো আবরণ বলাও চলে। কিন্তু উপরের আবরণে ভিতরের ভাবের ছাপ নিত্যই পড়ে তো। অতএব আবরণটিকে মানুষের পরিচয় নয় বলে উপেক্ষা করা যায় না। যে আবরণটিকে কৃত্রিম ছদ্মবেশের মতো উপর থেকে চাপা দেওয়া হয় সেইটেতেই প্রতারণা করে,— কিন্তু যে আবরণ চঞ্চল জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের ওঠায় পড়ায় বাঁকায় চোরায় দোলায় কাঁপনে আপ্‌না আপ্‌নি একটা চেহারা পায় মোটের উপর তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখানকার ঘরে মন্দিরে বেশে ভূষায় উৎসবে অনুষ্ঠানে সব প্রথমেই যেটা খুব করে মনে আসে সেটা হচ্চে সমস্ত জাতটার মনে শিল্পরচনার স্বাভাবিক উদ্যম। একজন পাশ্চাত্য আর্টিস্ট এখানে তিন বছর আছেন, তিনি বলেন এদের শিল্পকলা থেমে নেই, সে আপন বেগে আপন পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেচে, কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সে সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তিনি বলেন কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এখানে চীনেদের প্রভাব ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটা আপনি ক্ষয়ে আসচে, বালির চিত্ত আপন ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতে বসেচে। তার কাজে এমন অনায়াস প্রতিভা আছে যে, আধুনিক যে দুই একটি মূর্ত্তি তিনি দেখেছেন সেগুলি য়ুরোপের শিল্প প্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চম্‌কে উঠ্‌বে এই

তাঁর বিশ্বাস। এই তো গেল রূপ উদ্‌ভাবন করবার এদের স্বাভাবিক শক্তি। তার পরে, এই শক্তিটিই এদের সমাজকে মূর্ত্তি দিচ্চে। এরা উৎসবে অনুষ্ঠানে নানা প্রণালীতে সেই রূপ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত। যেখানে এই সৃষ্টির উদ্যম নিয়ত সচেষ্ট সেখানে সমস্ত দেশের মুখে একটি শ্রী ও আনন্দ ব্যক্ত হয়। অথচ জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিষ আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে মেয়ে বন্ধ্যা প্রেতলোকে গলায় দড়ি বেঁধে তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয় এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে, এক পুত্র এক কন্যা, তাহলে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন করে সে শ্মশানে যায়, পরিবারের লোক যমজ সন্তান তার পিছন পিছন বহন করে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনোরকম করে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধরে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপক্ষালনের উদ্দেশে নানাবিধ পূজার্চ্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়, সেই কয়দিন তার সঙ্গে সকল রকম ব্যবহার বন্ধ। এই সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করচে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে করে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা

মানুষকে বাঁচায়, যেখানে তার চর্চ্চা নেই, তার প্রতি বিশ্বাস নেই সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে? তবুও এইগুলোকেই প্রধান করে দেখবার নয়। জ্যোতির্ব্বিদের কাছে সূর্য্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না, তবু সাধারণ লোকের কাছে তার আলোটাই যথেষ্ট। সূর্য্যকে কলঙ্কী বল্‌লে মিথ্যে বলা হয় না তবুও সূর্য্যকে জ্যোতির্ম্ময় বল্‌লেই সত্য বলা হয়। তথ্যের ফর্দ্দ লম্বা করা যে সব বৈজ্ঞানিকের কাজ, তাঁরা পশুসংসারে হিংস্র দাঁত নখের ভীষণতার উপর কলমের ঝোঁক দেবামাত্র কল্পনায় মনে হয় পশুদের জীবনযাত্রা কেবল ভয়েরই বাহন। কিন্তু এই সব অত্যাচারের চেয়ে বড়ো হচ্চে সেই প্রাণ যা আপনার সদাসক্রিয় উদ্যমে আপনাতেই আনন্দিত, এমন কি, শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ও চেষ্টা, সেও এই আনন্দিত প্রাণক্রিয়ারই অংশ। Inter-Ocean নামক যে মাসিকপত্রে একজন লেখকের বর্ণনা থেকে বালির মেয়েদের দুঃখের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল সেই কাগজেই আর একজন লেখক সেখানকার শিল্পকুশল, উৎসববিলাসী, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর সেই দেখার আলোতে বোঝা যায় গ্লানির কলঙ্কটা অসত্য না হলেও সত্য নয়। এই দ্বীপে আমরা অনেক ঘুরেচি, গ্রামে পথে বাজারে শস্যক্ষেত্রে মন্দিরদ্বারে উৎসবভূমিতে ঝরনাতলায় বালির মেয়েদের অনেক দেখেচি, সব জায়গাতেই তাদের দেখ্‌লুম সুস্থ সুপরিপুষ্ট, সুবিনীত, সুপ্রসন্ন— তাদের মধ্যে পীড়া অপমান অত্যাচারের কোনো

চেহারা তো দেখলুম না। খুঁটিয়ে খবর নিলে নিশ্চয় কলঙ্কের কথা অনেক পাওয়া যাবে— কিন্তু খুঁটিয়ে-পাওয়া ময়লা কথাগুলো সুতো দিয়ে একসঙ্গে গাঁথলেই সত্যকে স্পষ্ট করা হবে এ কথা বিশ্বাস করবার নয়। ইতি ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

সুরবায়া, জাভা।

৪৪

১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, অমিয়, এই কবিতাটি এতদিন অন্য কোনো সূত্রে দেখে থাকবে, তবু তোমাকে পাঠালুম।

আজ বিকালে আমার বক্তৃতা আছে। কাল সকালে অন্যত্র যেতে হবে। দেখবার জিনিষের অন্ত নেই কিন্তু এমন করে ঘুরে বেড়াবার শক্তি আমার কই। শুধু দেহ নয়, মন ক্লান্ত হয়ে যায়— কেননা আমার মন আপনাতে নিবিষ্ট হয়ে ভাবতে ভালোবাসে। যে পাখী ডিমে তা দিতে চায় বাইরে থেকে তাকে কেবলি তাড়া দিতে থাকলে তার যে দশা হয় আমার মনের সেই দশা।

চিঠিতে নানা বকুনি বকেচি,— সেগুলো পত্রযোগে দেশে পাঠানো হয়েচে। মালয় উপদ্বীপে বাইরে দৃষ্টি দেবার যোগ্য কোনো প্রলোভন না থাকায় আপন মনের এই সকল যা'-তা'-বহুল কথাগুলো জমে উঠ্‌ছিল। এখানে তার জো নেই— বাইরের জগৎ সর্ব্বদা ডাক পাড়চে।

অক্টোবরের শেষ অংশে দেশে পৌঁছব বলে আশা করি। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হয়ে এল। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময় বোধ হয়েচে। রামায়ণ মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কি রকম প্রাণবান হয়ে রয়েচে সে কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। প্রাণবান বলেই এ জিনিষটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তার অনেক বদল হয়ে গেচে। তার প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার করেচে। সংসারের কর্ত্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায় নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন মূর্ত্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই সব চরিত্রে। এই জন্যেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেকরকম বদল হয়েচে। কালে কালে বাঙালী গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হয়েচে এও তেমনি। কাল আমরা যে ছায়াভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলেম তার গল্পংাশটা টাইপ করে আমাদের হাতে দিয়েছিল। সেটা পাঠিয়ে দিচ্চি, পড়ে দেখো। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে এটা বাংলায় তর্জ্জমা করে নিয়ো। এ গল্পের বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে দ্রৌপদী নেই। মূল মহাভারতের ক্লীব বৃহন্নলা এই গল্পে নারীরূপে "কেন্‌বর্দ্দি" নাম গ্রহণ করেচে। কীচক এ'কে দেখেই মুগ্ধ হয় ও ভীমের হাতে মারা পড়ে। এই কীচক জাবানি মহাভারতে মৎস্যপতির শত্রু, পাণ্ডবেরা এ'কে বধ করে বিরাটের রাজার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল।

আমি মঙ্কুনগরো উপাধিধারী যে রাজার বাড়ির অলিন্দে বসে লিখ্‌চি চারদিকে তার ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর করে অঙ্কিত। অথচ ধর্ম্মে এঁরা মুসলমান। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবীর বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন করে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূবিবরণের গিরিনদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যেই গ্রহণ করেচেন। বস্তুত সেটাতে কোনো অপরাধ নেই কেননা রামায়ণ মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্ত্তিতে এঁদের দেশেই বিচরণ করচেন, আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্ব্বজনব্যাপী পরিচয় নেই— সেখানে ক্রিয়াকর্ম্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন করে বিরাজ করেন না। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ রাত্রে রাজসভায় জাবানি শ্রোতাদের কাছে আমার কথা ও কাহিনী থেকে কয়েকটি গল্প আবৃত্তি করে শোনাব। একজন জাবানি সেগুলি নিজের ভাষায় তর্জ্জমা করে ব্যাখ্যা করবেন। কাল সুনীতি ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে দীপচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেছিলেন। আজ আবার তাঁকে সেইটে বল্‌তে রাজা অনুরোধ করেচেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কথা জানতে এঁদের বিশেষ আগ্রহ।

৪৬

২ অক্টোবর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অক্টোবর সুরু হল— বোধ হচ্চে এখন তোমাদের পূজোর ছুটি। আন্দাজ করচি তুমি আশ্রমেই আছ। শরৎ-কালের আয়োজন তোমাকে টেনে রাখ্‌বে। পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্তত এই বুদ্ধি আমার মাথায় এসেচে যে ঘুরে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই। ভ্রমণ জিনিষটা উঞ্ছবৃত্তির মত, একটু একটু করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলা। নিজের ভরা ক্ষেত থেকে সেই আঁটি বাধা ফসলের জন্যে মনটা কেবলি হায় হায় করে। যাক্‌গে, নির্ব্বাসনের শেষ মাসটিতে এসে পৌঁচেছি— খুব জোরের সঙ্গে আশা করচি এ মাসটা পেরতে দেব না। ছুটির থেকে ছেলেরা ইস্কুলে এসে পৌঁছবে আমিও তাদের সঙ্গে গিয়ে জুটব।

এবারকার যাত্রায় দেশের খবর বিশেষ কিছু পাই নি বলে মনে হচ্চে যেন জন্মান্তর গ্রহণ করেচি। এ জন্মের প্রত্যেক দিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি সাবেক জন্মের অন্তত দশদিনের তুল্য। মনে হচ্চে ওপারে কত কি বদল হয়েচে তার ঠিক নেই, চারাগাছগুলো এতদিনে বনস্পতি হয়ে উঠ্‌ল বুঝি। তার কারণ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের কেবলি বদল হয়ে চল্‌চে। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন ঘটনার চলমান প্রবাহ হূহু করে এগচ্চে। আমাদের এই চলার মাপে মন তোমাদেরও সময়ের বিচার করচে— তোমরা যে অপেক্ষাকৃত স্থির হয়ে আছ এ কথা মনেই হয় না। রেলগাড়ির আরোহী যেমন মনে করে তার গাড়ির বাইরে নদী গিরিবন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়েচে,— তেমনি এই দ্রুতবেগবান সময়ের কাঁধে চড়ে আমারো মনে হচ্চে তোমাদের ওখানেও সময়ের বেগ বুঝি এই পরিমাণেই,— বুঝি সেখানেও আজকের সঙ্গে কালকের সাদৃশ্য নেই, মুকুলের সঙ্গে ফলের বয়সের ভেদ বুঝি অনেক কমে গেছে। দূরে বসে যখন বোরোবুদর বালি প্রভৃতির কথা ভেবেচি তখন তাকে একটা বিস্তৃত কালের উপর মেলে দিয়ে দেখেচি, নইলে যেন অতখানি ধরে না। সে সমস্তই আয়ত্ত করা হয়ে গেল,— যা স্বপ্নবৎ অস্পষ্ট হয়ে ছিল তা প্রত্যক্ষ হল। দেখাশুনো চুকিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্চি। দূরের কল্পনায় যে সময়টা অস্ফুটতার মধ্যে সুদীর্ঘ হয়ে ছিল নিকটের প্রত্যক্ষে সেই সময়টাই ঘন হয়ে উঠল,— অল্পকালের মধ্যেই অনেকটা কাল ঠেসে পাওয়া গেল। হিসেব করে দেখ্‌লে সেই পরিমাণে আমার

আয়ু বেড়েচে। চণ্ডীমণ্ডপে মন্দগমনে যার দিন চলে তার বয়স থেকে অনেকটা বাদ দিলে তবে তার যথার্থ আয়ু পাওয়া যায়। আমি বলিনে যে বাইরের পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্যে ছুটে চল্‌লেই আয়ু সেই অনুসারে কালকে ব্যাপ্ত করে। শাস্ত্রীমশায় কোণে বসে আছেন কিন্তু কালকে তিনি যেরকম ব্যাপকভাবে অধিকার করচেন অন্য লোকের সঙ্গে নব্বই বছরের চেয়ে সে অনেক বেশি। মনে পড়ে এই তো সেদিন এলেন আশ্রমে "মিত্রগোষ্ঠী"র সম্পাদক পদ থেকে নেমে। এসেই তাঁর মন দৌড় দিল পালিশাস্ত্রের মহারণ্যের মধ্যে— দ্রুতবেগে পার হয়ে চলেছেন কোথায় তিব্বতী কোথায় চৈনিক— নাগাল পাবার জো নেই। সময়ের মাপ পঞ্জিকায় নয় চিত্তে। খাঁটি দুধের সঙ্গে জোলো দুধের ওজন মিলিয়ে মাপতে গেলে ঠক্‌তে হয়।

সে যা হোক্, যাচ্ছিলুম কুলের দিকে, হঠাৎ শ্যামের বাঁশি বাজল। আরিয়াম তারযোগে সেই বাঁশির ডাক পাঠিয়েচেন। কিন্তু আমার মনের ভাব একেবারেই রাধিকার সঙ্গে মিল্‌চেনা। স্বদেশে হয়তো জটিলা কুটিলার অভাব নেই কিন্তু তবু সকল গঞ্জনা স্বীকার করেও সেইদিকেই হৃদয়টা ঝুঁকেছিল। এখন সজোরে তাকে নিয়ে হেঁচকা টান লাগাচ্চি কিন্তু সে আমার প্রতি প্রসন্ন হচ্চে না। আমি বলচি কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে, সে বল্‌চে ওটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তার মতে, বিধাতা কর্ত্তব্য সৃষ্টি করেচেন সে কেবল জীব সেটাকে লঙ্ঘন করে মুক্তির আনন্দ লাভ করবে বলেই।

জাহাজে বসে একটা কবিতা লিখেচি। বউমাকে তার

একটা কপি পাঠিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার কিছু পাঠান্তর হয়েচে, তার প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে নূতন পাঠ তোমাকে পৃষ্ঠান্তরে পাঠাই। ইতি ২ অক্টোবর ১৯২৭

মায়র জাহাজ

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোরের বেলা সেদিন শুভখনে
অরুণ আলো ঝলিতেছিল নারিকেলের বনে।
সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়া ছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
বক্ষ ছাড়ি লুটাতেছিল তোমার চারিপাশ।
মকর-চূড় মুকুটখানি ছিল আমার মাথে
ধনুকবান ছিল দখিন হাতে।
দাঁড়ানু রাজবেশী,
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী।"

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা আসন ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতি, তুলিনু চাঁপা ফুল।

দুজনে মিলি সাজানু ডালা, বসিনু একাসনে,
দুজনে মিলি নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি জাল বাতাসে গেল ভাসি
আকাশ ছেয়ে উঠিল ফুটি পার্ব্বতীর হাসি॥

সন্ধ্যা তারা উঠিল যবে গিরিশিখর পরে
একেলা ছিলে ঘরে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি," কহিনু দ্বারে আসি।
বাহির পথে দাঁড়ালে তুমি প্রদীপখানি জ্বেলে,—
চাহিলে মুখে, কহিলে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
তোমারে আমি সাজাতে চাহি আপন আভরণে।"
চাহিলে হাসিমুখে
আধো-চাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।
মধুর হ'ল মুখর হ'ল সেদিন নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিরিনি।
পূর্ণ চাঁদ আকাশে ওঠে হাসি,
সাগরে দোলে আলো-ছায়ার নৃত্য রাশি রাশি।

ফুরালো দিন কখন নাহি জানি।
সন্ধ্যাবেলা আবার জলে ভাসিল তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে
প্রলয় এল সাগরতলে প্রবল ঢেউ তুলে।
লবণ জলে ভরি'
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতন ভরা তরী।

এবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীনবেশে।
দেখিনু আসি নটরাজের দেউল দ্বার খুলি
তেমনি ক'রে সাজানো আছে পূজার ফুলগুলি।
উৎসবের তরল কলরবে
পূর্ণ চাঁদ দুলালো ছায়া সাগর জলে যবে
হেরিনু কৌতুকে
আমার সেই গলার হার দোলে তোমার বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে
আমারি গাঁথা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত কলিত কল্লোলে॥

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেকবার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি'।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবান নাহি আমার হাতে।

এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা॥

মায়র জাহাজ
জাভা সমুদ্র
১ অক্টোবর। ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

৪ অক্টোবর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অত্রসহ যে লেখাটা পাঠাচ্চি তার থেকেই সব বুঝতে পারবে। যথাস্থানে চালান করে দিতে দেরি কোরো না।

যে একটা কবিতা তোমাকে পাঠিয়েছি ডাকযোগে সেটা এখনো পেয়েছ কিনা জানিনে। যাই হোক তার প্রথম ছুটো লাইন বর্জ্জনীয়। অর্থাৎ তার প্রথম লাইন হবে—

"সাগরজলে সিনান করি সজল এলো চুলে।"

ইতি ৪ অক্টো ১৯২৭

"কিন্তা" জাহাজ

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

অক্টোবর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয় আজ বিজয়া দশমীর দিনে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে। ইতি ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

৮ এপ্রিল ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রথীরা চলে গেল। আমি আর কিছুদিন পরে সুবিধামত জাহাজ অবলম্বন করে যাব স্থির করেছি। যদি শরীর ভালো থাকে তবে ১লা বৈশাখে হয়ত যাব।...

আমার সব লেখাগুলো শ্রেণীবদ্ধ করে পাকাভাবে বাঁধিয়ে রাখবার জন্যে সুরেনকে বোলো।

এখানে কষে বৃষ্টি হয়ে গেল। তোমাদের ওখানেও আশা করি ভদ্র রকম বৃষ্টি হয়েচে।

শরীরটা ক্লান্ত আছে। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩৩৪

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

হৈমন্তীর জ্বরের খবর পেয়ে বড়ো উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম। নিয়মিত জানিয়ো সে কেমন থাকে।

আমাকে যে সব গালমন্দ করে কিছুই গ্রাহ্য করি নে— তোমাদের যখন আক্রমণ করে তখন সেটাতে আমাকে বাজে, আঘাতে আমার মতন লোকের পরীক্ষা— সে পরীক্ষা আমার উপর দিয়ে কতদিন থেকেই চলচে— এক সময়ে বেদনা বাজত— এখন আর ভয় করি নে— বোধ হয় পরীক্ষায় পাস করেচি। আমার একটা গর্ব্ব মনে এই আছে আমি কোনোদিন আমার আক্রমণের রূঢ় প্রতিবাদ করিনি।

জোড়াসাঁকোর জনতার উপদ্রব এড়াবার আশায় এখানে ম্যুজিয়ম সংলগ্ন মুকুলের বাড়িতে এসেচি। সুন্দর জায়গা— লোকের উৎপাত নেই। কাল বিকেলে আমাকে দিয়ে একটু বক্তৃতার মতো করিয়ে নিয়েচে— না করলেই ভালো হত— কিন্তু অনুরোধ এড়াবার মতো শক্তি না থাকলে তার দণ্ড থেকে নিষ্কৃতির আশা করা অন্যায়। যখন সময় পাবে ও নিরুদ্বিগ্ন হবে তখন একবার দেখা করে সব খবর দিয়ে যেয়ো। ইতি ৯ অগস্ট ১৯২৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

২৫ অগস্ট ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার শরীর সুস্থ হয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

একবার কলকাতায় এসো। তোমার সঙ্গে কাজকর্ম্মের কথা কয়ে দেখা যাক্। ইতি ২৫ অগস্ট ১৯২৮

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নন্দলালকে বোলো, তাঁর কাছে কাগজের নমুনা পাঠানো হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। কাগজ-ওয়ালারা অপেক্ষা করে আছে।

আরো একটা বক্তব্য— …কে বিদ্যালয় থেকে তাড়াবার হুকুম হয়েছিল। সেটা কি অপরিহার্য্য? আরিয়ামকে কিম্বা কোনো কর্ত্তৃপক্ষকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কোরো। কোনো ছেলেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে তার খুব বিপদ আছে। প্রথমত তার একটা বৎসর নষ্ট হবে— দ্বিতীয়ত এ রকমের অপমানে নৈতিক অবসাদ ঘটে।

৫২

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিদ্যালয়ের শিথিলগ্রন্থিগুলিকে আঁট করে তোলবার মুখেই আমাকে চলে আসতে হল তাই মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ভালো করে যখন ভেবে দেখি তখন বুঝতে পারি যে আমাদের যা সামর্থ্য আছে তার মধ্যেই নিজের কাজকে যথাসম্ভব সুসম্পন্ন করাই সঙ্গত। কোনোদিন এত বেশি সম্পদ আমাদের জুটবে না যখন বল্‌তে পারব, বাস্‌, আর দরকার নেই। আজ কুড়ি বছর পূর্ব্বে যখন হাতে কিছুই ছিল না তখন মনে হত বছরে যদি দু তিন হাজার পাই তাহলেই আর ভাবনা থাকে না। আজ বছরে বারো হাজার টাকা খরচ করেও মনে বুঝচি অভাব আগেকার চেয়ে বেশি বই কম নয়। বস্তুত অর্থলাভের দ্বারা দৈন্য কখনই ঘোচে না। কাব্য বা সঙ্গীত বা চিত্রের মতোই কর্ম্মেরও একটা art আছে। সম্পূর্ণতার দ্বারাই তার দৈন্য ঘোচে। উপকরণ বৃদ্ধির দ্বারা কোনোদিন দৈন্য ঘোচেনা, উপকরণের সামঞ্জস্য দ্বারাই সেটা সম্ভব। যা আমার হাতে আছে সেইটেকেই সুঘটিত করতে পারলে সে স্থায়ী মূল্য পায়, তাকে তার আপন সীমার চেয়ে বড়ো করতে গেলেই সে সুষমা হারায়। আমার কাজের সেই কুড়িবছর আগেকার সুকুমার মূর্ত্তিটি যখন মনে পড়ে তখন আমার অন্তরের থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ওঠে। তবু এ কথাও স্বীকার

করতে হয় সকল কর্ম্মই কাব্যের মতো অহৈতুক আনন্দময় নয়। অর্থাৎ কেবল তার রূপের সৌষ্ঠব নিয়েই সন্তুষ্ট হওয়া চলেনা তার ফলের বিচারও চাই। মানুষের অভাব আছে তা পূরণ করতে হবে। এর জন্যে যে সাধনা সে রূপের সাধনা নয়। তার শেষ লক্ষ্য সিদ্ধি। জলপাত্রের চরম কথাটা এই যে তাতে করে বেশ ভালো করে জলসঞ্চয় বা জল পান করতে পারা চাই— সেই সঙ্গেই গৌণভাবে তাকে সুন্দর করা ভালো। কীট্‌স্‌-এর Ode to Grecian Urn কাব্যটি ব্যবহারের অতীত, সুতরাং সুন্দর হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যে পাত্রটি দেখে তিনি ঐ কবিতা লিখেছিলেন, তার মূল প্রয়োজন ছিল আধারের কাজ ভালো করে করা— আনুষঙ্গিক ভাবে সুন্দর যদি সে নাও হত তাহলে খুব বেশি নালিশের কারণ থাকত না। বিদ্যালয়টাও তেমনি ব্যাবহারিক বস্তু, বিশেষ অভাব পূরণের জন্যে— অর্থাভাবে, লোকাভাবে, নিষ্ঠাভাবে তা যে পরিমাণে অসমাপ্ত থাকবে সেই পরিমাণেই সেজন্যে লজ্জিত হওয়া চাই। অতএব সমুদ্রের এপারে ওপারে দৌড়োদৌড়ি করতেই হবে, তাতে শরীর থাক্‌ আর যাক্‌।

তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, জিনিষটাকে আত্মীয়ের মতো দেখো। যদি কোথাও শৈথিল্য ধরা পড়ে তবে দুঃখবোধ ও প্রতিকারের চেষ্টা কোরো। আমার অনুপস্থিতিতেই তোমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেশি এই কথাটি ভুলোনা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই আত্মীয়োচিত দায়িত্ববোধ যদি জেগে ওঠে তাহলে আমি সব চেয়ে আনন্দিত

ও নিশ্চিন্ত হই। সম্প্রতি আমরা বিদ্যালয়ের যে সমস্ত ব্যবস্থাবিধিকে আঁট করে তুল্‌ছিলুম, তার মধ্যে ওখানকার মেয়েদের বেষ্টন করতে পারিনি। সেখানে শান্তিনিকেতনের পুরুষ কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি দেওয়া দুঃসাধ্য। আমি ওখানকার আশ্রমসম্মিলনী থেকে অনেক প্রত্যাশা করচি। এই সম্মিলনীর যোগে ওখানকার ছাত্রদের মধ্যে একটা স্বকর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ববোধ জেগে উঠ্‌চে অনুভব করে আমি মনের মধ্যে খুব একটা আশ্বাস বোধ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশ্রম-সম্মিলনীতে মেয়েরা আছে পদ্মপত্রে জলের মতো— তারা ওর সঙ্গে এক হয়ে যায় নি। এই কারণে সমস্ত আশ্রমের প্রতি মেয়েদের নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হচ্চে না। তারা কি পেতে পারে এ কথা যতটা ভাবচে কি দিতে পারে এ কথা তত ভাবচে না। তাতে করে আশ্রমের সঙ্গে মেয়েদের প্রাণের যোগ ত্যাগের পথে সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চেনা। এইটে আমাকে সবচেয়ে আঘাত দিয়েচে। কেননা যেদিন থেকে আশ্রমে আমি মেয়েদের স্থান দিয়েছি সেইদিন থেকেই আমার মনে এই কল্পনা ছিল যে আশ্রম রচনায় মেয়েদের ত্যাগ এবং সেবা সুন্দর এবং প্রাণবান হয়ে উঠ্‌বে। পূর্ব্বকালের ছাত্রীদের মধ্যে ইভা ও বাব্‌লি হৃদয় দিয়ে আশ্রমকর্ম্মের আনুকূল্য করেচে— সেইজন্যে আজো আশ্রমের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সরস ও সবল হয়ে আছে। তারা নিয়মরক্ষা সম্বন্ধেই যে কেবল সতর্ক ছিল তা নয় তারা আশ্রমের কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা ঘট্‌লে সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যথিত হয়ে উঠত— বারবার আশ্রম ব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনা

করতে আস্‌ত, সেটা তাদের নিজের অধিকারলাভের সুবিধা-সাধনের দাবী নিয়ে নয়, সাধারণ হিতের প্রতি লক্ষ্য করে। সেই জন্যে তখনকার দিনের উৎসব প্রভৃতিতে তাদের অক্লান্ত উৎসাহ আমাদের এত বেশি সাহায্য করেচে। আশ্রমের প্রতি আত্মীয়ভাবের নিষ্ঠা যদি ওখানকার মেয়েদের মনে স্বভাবতই স্ফূর্ত্তি না পায় তা হলে জানব ঐ অংশে সমস্ত আশ্রমের সাধনা ব্যর্থ হয়েচে। নুটু আমাদের আশ্রমেরই মেয়ে— শিশুকাল থেকে সে সর্ব্বতোভাবেই ঐখানে মানুষ হয়েচে— আশ্রমের জন্যে সে সাধ্যমত চেষ্টা করচে এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ওখানকার ছাত্রীমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপ্ত হতে না পারলে যথার্থ সফলতালাভ করবে না। তাই ইদানীং আমার মনে হচ্ছিল যে মেয়েরা যদি স্বতন্ত্র আশ্রম-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করে ও সম্মিলনীতে তাদের সম্মিলিত সাধনা যদি আশ্রমের হিতসাধনে তাদের দায়িত্বকে উদ্বোধিত করে তোলে তাহলে আমার সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়। একদিন শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লী ছিল না— তখন ওখানে দুই একটি গৃহস্থ বাড়িতে ছাড়া মেয়েরা কেউ থাকতেন না। তখন কতদিন আমি কবিসুলভ কল্পনায় আশ্রমলক্ষ্মীদের কথা ভেবেছি— তখন আমার মনে ছিল ওখানে গুরুপত্নীদের আসন প্রতিষ্ঠা যদি হয় তাহলে আশ্রম প্রাণে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু আমার সে কল্পনা রূপ গ্রহণ করেনি। এমেরিকায় Urbanaয় যখন ছিলাম তখন Mrs Seymour প্রভৃতি গুরুপত্নীদের লোকসেবা আমি দেখেছি ও তার মাধুর্য্য আমি ভোগও করেছি। ঠিক সেই

প্রাণের জিনিষটি হৃদয়ের যত্নটি পুরুষদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। আমার মনে ছিল মেয়েদের আগমনে আশ্রমে এই সেবাশুশ্রূষার অমৃতধারা কল্যাণে পূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। নানা উদ্যমের স্রোতে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবাহিত হবে এবং আশ্রমের মধ্যে একটি সামাজিকতার ভাবকে সরস করে তুল্‌বে। সেটা যে ঠিকমতো হয় নি এটা আমার কাছে নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকে। তাই মনে হয় এর মধ্যে আমাদেরই ত্রুটি আছে। হয়তো এর কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে মেয়েদের শক্তিকে ঠিকভাবে আবাহন করতে পারিনি। কিন্তু সেইরকম বাইরের আনুকূল্যের প্রতি অপেক্ষা করে থাকা ঠিক হবে না। মেয়েদের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে সে যেন আপনার স্থান আপনিই জয় করে নেয়। আশ্রমের মধ্যে সেটা কোনোকারণেই যেন অব্যক্ত না থাকে। মেয়েরা যদি আশ্রমসম্মিলনী স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার মধ্যে ওখানকার গুরুপত্নীরাও স্থান গ্রহণ করেন তাহলে তাঁদের সকলের যোগে শ্রীভবনের ও সেইসঙ্গে সমস্ত আশ্রমের শ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে। মনে আশা করে আছি একদা ওখানে নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত হবে। এখন থেকে মেয়েরা সকলে মিলে তার ক্ষেত্রকে নিষ্কণ্টক ও তার বিধিবিধানগুলিকে যদি সুদৃঢ় করে তোলেন, ওখানকার চিত্তকে সম্পূর্ণ অনুকূল করেন তাহলে কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। এখনো সেইজন্যে আশা করে থাকব।

পাঠভবনের জন্যে আমি যে আদর্শপত্র তৈরি করে দিয়েছি,

সেটিকে বিশ্লেষণ করে তোমরা অধ্যাপকেরা মিলে একটা কর্ত্তব্য তালিকা তৈরি কোরো। সেই তালিকার মধ্যে কোন্‌গুলি অনুষ্ঠিত হচ্চে কোন্‌গুলি অসম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্চে এবং কোন্‌গুলি আদৌ অনুষ্ঠিত হচ্চে না তা নিয়তই তোমাদের চোখের সামনে থাকা চাই। অন্য দেশের লোকের কাছে যখন শান্তিনিকেতনের কথা বলি তখন এই সব আদর্শের কথা বলে থাকি, এবং তা শুনে তারা বিস্ময় বোধ করে— কিন্তু এগুলি যদি অধিকাংশই অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে আমার পক্ষে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় কিছুই হতে পারেনা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুমাত্র নিষ্ঠা দাবী করি নি। খুব সম্ভব আমি তার অধিকারী নই। যদি অধিকারী হতুম তাহলে এতদিনে আশ্রমকে ঘিরে সহায়কারী লোকের অভাব হত না। আশ্রমের আদর্শের মধ্যে যে সত্য আছে আমি কেবল সেই সত্যের দোহাই দিয়েছি। যে কারণেই হোক্ আমাদের দেশে ব্যক্তিগত নিষ্ঠার প্রভাবই সব চেয়ে প্রবল— সেই নিষ্ঠার যোগেই আমাদের দেশে ত্যাগ সহজ হয়। এই ব্যক্তিস্বরূপের মহিমা নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা ছাড়া আর কেউ যদি তাঁদের মুখোষ পরে আড়ম্বর করেন তাহলে সেটা একটা গুরুতর অপরাধ হয়ে ওঠে। অতএব ও পথ আমার নয়। সেইজন্যেই তোমাদের কাছে নির্দ্দিষ্ট কাজের চেয়ে বেশি কিছু দাবী করতে আমি কুণ্ঠিত হই। কাজের ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই সেই বেশিটুকুর দরকার হয়। সেই বেশিটুকু দেওয়া সহজসাধ্য, এমন কি, আনন্দময় হতে পারত, যদি

বিছ্যালয়ের আদর্শগত সত্যরূপের প্রতি আমাদের অনুরাগ প্রবল হত। তাহলে নিজের কথা অনায়াসেই ভোলা যেত। কিন্তু সেটাকে দাওয়া করা যায় না। দেনাপাওনার সম্বন্ধেই দাবী-দাওয়ার কড়াক্রান্তি হিসাব নিকাস চলে— কিন্তু যা দেনা-পাওনার অতীত তার উপরে ব্যক্তিবিশেষের জোর খাটেনা, ব্যবস্থাবিভাগের জোর খাটে না— সত্য স্বয়ং তাঁর সমস্ত আনন্দ নিয়ে যাঁর অন্তরে আবির্ভূত হন তিনি বিনাবাক্যেই সর্ব্বসমর্পণ করেন। সেই কথা যখন মনে ভাবি তখন একথাও স্বীকার করি যে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের কাজকে সত্য করে তোলবার ভার আমার মতো লোকের নেওয়া [উচিত] ছিল না। আমি ভাবুকমাত্র, আমার মনে ভাবের রূপ প্রকাশ পায়, তাতে আমার নিজেকে উৎসাহ দেয়, আমার নিজেকে আমার সহজ আরামের আয়োজন থেকে সঙ্গহীন উপলবন্ধুর পথে বের করে আনে— কিন্তু আমার নিজের মধ্যে প্রেরণাশক্তি নেই। এ শক্তি কেউ চাইলেই পায় না। এ শক্তি ঈশ্বরদত্ত। যার এ শক্তি স্বভাবত নেই তার এমন কোনো কাজের ভার নেওয়া উচিত নয় যে কাজের জন্যে বিভিন্ন চরিত্রের নানা লোকের প্রয়োজন। সেই বহুকে এক লক্ষ্য অভিমুখে প্রেরণ করা কেবল ভাবুকের কাজ নয়। অথচ দুর্দ্দৈবক্রমে কোনো এক সময়ে এই কর্ম্মভার আমি স্বীকার করেছি। আমি এই কাজের যোগ্য নই বলেই প্রথম দিন থেকেই নিরতিশয় দুঃখ ও বিরুদ্ধতা পেয়ে এসেচি। এইজন্যেই এই কর্ম্মের অন্তরের দিকে যতই অভাব বেড়েচে বাইরের দিকে এর রূঢ়তা ততই কঠিন হয়েচে। ততই টাকার

প্রয়োজন এত উগ্র হয়ে উঠেচে। সকলের সব অভাব আমাকে একলাই মেটাতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি আমার একলারই স্কন্ধে। তাতে প্রত্যহ আমার শরীর পীড়িত, চিত্ত উদ্বেগে অশান্ত— দুরাশার তাড়নায় সমুদ্রের এপারে ওপারে ঘুরে বেড়াচ্চি ফল অতি অল্পই মিলচে— অপরপক্ষে অহৈতুক প্রতিকূলতা ক্ষণে ক্ষণে কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌চে। এমনি করে আজ ২৫ বৎসর বহু টানাটানি করে কেটে গেল, এখনও কূলের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলেম না। আর বেশিদিনের মেয়াদ নেই। এখন এই অল্প কয়দিনের জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য বা ক্লান্তির দোহাই দিয়ে আমার চেষ্টায় শৈথিল্য ঘটতে দেব না। প্রদীপে তেল জোগাতে হবে। নইলে আজ আমি কিছুতেই শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে আসতুমনা।

ইংরেজি সোপান ও সহজপাঠ যাতে অতি শীঘ্র ছাপানো হয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা হয় সেজন্যে বিশেষ চেষ্টা কোরো। ইংরেজি সোপান প্রথম ভাগখানা ছাপা শেষ হতে দেরি হওয়া উচিত নয়— অবিলম্বে হাতে নিয়ো। কত কপি ছাপা কর্ত্তব্য তার পরামর্শ কর্ম্মসচিবের কাছ থেকে নেওয়া দরকার। সহজপাঠের ছবিগুলি শেষ হতে আশা করি দেরি হবে না।

··· সম্বন্ধে আমার মনে একটা সঙ্কোচ রয়ে গেছে। তাঁর কাছে কিছুমাত্র ত্যাগের দাবি আমি করতে পারি নে। তাঁকে যেন অনুরোধের পীড়নে বাধ্য করা না হয়। আমাকে তিনি জানেননা আমার কাজকেও অল্পই জানেন— উৎসাহ-

পূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি আশ্রমের কাজে আত্মসমর্পণ করবেন তার কোনো হেতু নেই। সেটা যদি সহজ হত তবে আমার পক্ষে আনন্দের হত। কিন্তু কোনোদিনই হয় নি হঠাৎ আজই হবে এমন আশা আমি করব না।

মঙ্গলবারে বম্বাই মেলে যাত্রা করব। যদি সোমবার, এমন কি মঙ্গলবার অপরাহ্নেও একবার আসো তবে যদি কিছু বলবার থাকে বলব।

✓আমার সব Lectureগুলো ও বাংলা ও ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ও Personality Creative Unity, Sadhana সঙ্গে এনো। বিশ্বভারতীর সদ্যঃপ্রকাশিত Journal খানাও চাই, যার মধ্যে ক্ষিতিবাবুর বাউল আছে। ইতি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

এক খণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্ম চাই।✓

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

৭ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আমি যে কাজের কল তৈরি করে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম তার ভার এখন রথীর উপরে। রথী তাকে আরো বেশি পাকা করে তুল্‌তে পারবেন। তোমাকে এই কলের দৌত্য করতে হবে। অর্থাৎ হুকুমগুলোকে প্রচার করা, তদ্বির করা

ইত্যাদি। আসবার সময় দেখে এসেছিলুম লোকাভাবে পাঠভবনের শিক্ষাকার্য্যে বড় বড় ফাঁক পড়েছিল। জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে আমাদের বরাবর ক্ষতি হয়েচে। কিন্তু আমাদের সবচয়ে ক্ষতির কারণ এই যে, ওখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা সহযোগিতা এবং আদর্শের ঐক্য আজ পর্য্যন্ত ঘটে নি। আমাদের ভারতবর্ষীয়দের মনে ব্যক্তিগত অভিমান তাদের সত্যসাধনাকে ছাড়িয়ে পদে পদে উদ্যত হয়ে ওঠে বলেই এটা ঘটে। তোমাদের কর্ত্তব্য হবে আশ্রমে নানা উপায়ে একটা সামাজিকতা গড়ে তোলা। পরস্পরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করতে ভুলো না। রথী যদি প্রতিদিন পালা করে দুজন অধ্যাপককে আহারে নিমন্ত্রণ করেন ত অনেক গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। ওখানকার য়ুরোপীয়দের সঙ্গেও আমাদের অধ্যাপকদের সর্ব্বদা আলাপ আলোচনার উপলক্ষ্য থাকা উচিত। এখন দুইপক্ষ সমুদ্রের দুইকূলে বাস করেন— আমাদের বিশ্বভারতীর আদর্শের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে ক্ষতিজনক। ভিতরে ভিতরে আমাদের দুই জাতে পরস্পরের মধ্যে যে একটা মর্ম্মগত অসহযোগিতা আছে সেটা ক্ষয় করতে না পারলে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হব। এই সাধনার দায়িত্ব বিশেষভাবে আমাদেরই— যদি অকৃতকার্য্য হই তো সেজন্য প্রধানত আমরাই দোষী। কেননা আতিথ্যের ভার আমাদেরই উপর। দোষত্রুটি সকলেরই আছে। সেই ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে হবে। হাঙ্গেরি থেকে নতুন অধ্যাপক আসচেন— তিনি যেন এসেই না অনুভব

করেন যে, আশ্রমে আমরা উভয় পক্ষ তেলে জলের মতো থাকি। এই ব্যাপারে আমাদেরই সামাজিক গুণের খর্ব্বতা প্রকাশ পায়। আমরা অত্যন্ত গ্রাম্যপ্রকৃতির লোক। সকল দেশের সকল সমাজের লোককে সহজে আত্মীয়ভাবে গ্রহণ করতে পারিনে। এমন কি, ইংরেজরাও আমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ সে কথা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জোর করে বলতে পারি। কিন্তু এই লজ্জাজনক গ্রাম্যতা দূর করা চাই।

✓মহাভারতের সারাংশ চিহ্নিত করে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস ভালো হয়েচে। হৈমন্তী যদি এই অংশটুকু ছাপাখানার জন্যে কপি করেন তবে তাঁরও উপকার হবে আমাদেরও কাজে লাগ্‌বে। এটা এমন করে করেছি যে ছেলেমেয়ে সকলেই অসঙ্কোচে ব্যবহার করতে পারবে।✓

ইংরেজি সোপানের প্রথমভাগকেও দুই খণ্ড করা যায়—যেখান থেকে hasএর দৃষ্টান্ত আরম্ভ হল সেইখান থেকেই দ্বিতীয়ভাগ স্থরু করা ভালো। অর্থাৎ সব নীচের বর্গে এই এক এক অংশ এক এক বৎসরের খোরাকরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে। নীচের বর্গের বৎসর ছ মাস করে হওয়া চাই। বস্তুত পাঠভবনের সকল বর্গই অর্দ্ধবার্ষিক হলে ভাল হয়। তাহলে পাঠের উন্নতি আরো স্পষ্ট করে বিচার করা যেতে পারে।

বাংলা সহজপাঠ আশা করি ছাপানোর ব্যবস্থা হচ্চে। ইংরেজি সোপানের নাম বদলে "ইংরেজি সহজ শিক্ষা" নাম দিতে পারো—এই শ্রেণীর প্রথম অংশ হবে শ্রুতিশিক্ষা। শ্রুতিশিক্ষার উদাহরণ আরো অনেক বাড়ানো যায়। কোনো

য়ুরোপীয় Travellers' Guide নিয়ে তার থেকে প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য বাক্যগুলি অনুসরণ করে "সহজশিক্ষা" আরো সম্পূর্ণ করে লিখ্‌তে পারো।

বেনোয়ার খবর আশা করি ভালো। পুপের ফরাসী শিক্ষার ভার তারই উপর এ কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো—এবং আমার অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ৭ মার্চ্চ ১৯২৯

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টাকারের বাংলায় নলিনীকে বাসা দিলে কোনো ক্ষতি হবে না।

…কাছ থেকে আমার সেই ইংরেজি অনুবাদপদ্ধতির পাণ্ডুলিপি অবিলম্বে উদ্ধার করে নিয়ো— কোনোমতেই ভুলো না। সেগুলো যদি ছাপিয়ে রাখতে পারো এর পরে কাজে লাগবে।

৫৪

১০ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আমরা এই যে জাহাজে চলেচি এতে প্রতিদিন আমাদের একটা শিক্ষা হচ্চে। যাত্রা আরম্ভের মুখে আমাদের সকলেরই মনে একটা সঙ্কোচ ছিল— যাত্রীদের এড়িয়ে চলছিলুম। কিন্তু ওরা সহজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে

মিশে গেচে। সুধীন্দ্রদের মনে এখন কিছুমাত্র বিমুখভাব নেই। সামাজিকতা করবার মতো শক্তির অভাব ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যেই দেখি। এই চরিত্রগত অভাবই শান্তিনিকেতনে এতকাল প্রকাশ পাচ্চে। আমরা শক্তি থাকলে অতি সহজেই য়ুরোপীয় বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতে পারতুম। কিন্তু তাতে যে পরিমাণে প্রয়াসের দরকার সেটুকু এ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে পারি নি। ওদের আমরা দূরেই রেখে দিয়েচি। অথচ শান্তিনিকেতনে এই অধ্যাপকেরা এমন কোনো ব্যবহার করেন না যাতে আমাদের অভিমান ক্ষুণ্ণ হয়। এটা নিতান্তই আমাদের স্বভাবের দৈন্য। যতই বিদেশে আসি ততই এটা আরো স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। আমাদের এই গ্রাম্যতার জন্যে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গেও আমরা এই চিত্তসঙ্কীর্ণতাবশতই সহজে মিলতে পারি নে। অন্য প্রদেশের ছাত্ররা ওখানে বেড়ার মধ্যে বাস করে— আমরা একটুও এগিয়ে গিয়ে ওদের আপন করে নিতে পারি নে। তাতে নিজেদের যেটুকু স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত ঘটে সেটুকুও সহ্য করা আমাদের পক্ষে শক্ত। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ এই কারণেই আমাদের লোকের পক্ষে এত বেশি দুঃসাধ্য— ভারতের বাইরেই এর প্রশস্ত ক্ষেত্র। কিন্তু শান্তিনিকেতনেও যদি আমরা বিদেশকে স্বদেশে না টানতে পারি তাহলে ঐ আশ্রমের আদর্শ একেবারেই ব্যর্থ হল। শুধু ক্লাস চালানো আমাদের কাজ নয়। আত্মীয়তার সম্বন্ধকে ওখানে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করতে হবে। যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ং

—এক নীড়ও বাঁধতে পারি নি, এক গাছেও আশ্রয় নিই নি। আমরা আছি নানা পক্ষী নানা বৃক্ষে। এমন হয় কেন— নিজেদের একবার জিজ্ঞাসা কোরো। ওখানে অতিথি এলে কেউ তাদের কোনো খবর নেন না কেন সেও জিজ্ঞাস্য, আদর অভ্যর্থনার একটি ভাব ওখানকার আকাশে ছড়িয়ে যাবে এইটেই সাধনা করতে হবে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এই সৌজন্য যথেষ্ট ছিল— এখন আমরা প্রতিদিন বর্ব্বরতায় তলিয়ে যাচ্চি। ওখানে ছাত্র ও বিশেষত ছাত্রীরা এই বর্ব্বরতা থেকে যদি উদ্ধার পায় তাহলে সে একটা বড়ো কাজ হবে। ইতি ১০ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

১৪ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এই জাহাজে চল্‌তে চল্‌তে একটা বিষয় নিয়ে মনে খুব বিস্ময় বোধ করেচি। অনেক ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে আমার বই আছে। আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েচে। তারা নানা রকম কাজে ভ্রমণ করতে বেরিয়েচে— কেউ জানত না যে এই জাহাজে আমার সঙ্গে দেখা হবে। এমন ভাবে ভ্রমণ কালে আমার বই সঙ্গে করে নিয়ে আসবার মধ্যে অনেকখানি কথা আছে। আমাদের সহযাত্রী ডারুয়িন

(*বিখ্যাত ডারুয়িনবংশীয়*) দীর্ঘকাল থেকে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমার Gardener বহন করে বেড়ান। আমার রচনা আমার মত প্রভৃতি সম্বন্ধে এদিককার এত লোকের জানা আছে হঠাৎ তার পরিচয় পেয়ে মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠতে হয়। পৃথিবীতে সব চেয়ে যেখানে আমার যথার্থ পরিচয় ও আমার রচনার আলোচনা কম সে হচ্চে শান্তিনিকেতন। কিন্তু এই শান্তিনিকেতনের কোনো লোক যখন য়ুরোপে যাবে তখন তাদেরি কাছ থেকে আদর পাবে যারা তাদের চেয়ে যথার্থভাবে আমাকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালো করে জানে।··· সাবরমতী আশ্রমে মহাত্মাজির কার্য্য সম্বন্ধে এ পরিমাণ অজ্ঞতা বা উপেক্ষার সুদূর সম্ভাবনা মাত্র নেই। আমি কোনো অনিচ্ছুক মনের উপর কখনো আমার মত চাপাতে চেষ্টা করি নি— কিন্তু সাহিত্যিকভাবে আমার লেখার যেটুকু মূল্য আছে অন্তত সেটুকুও শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জানা উচিত। তোমরা দেশ থেকে বেরিয়ে এলে বুঝতে পারতে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে কত বিস্তীর্ণভাবে আমার যোগ আছে— সেই যোগের একটা সার্থকতা আছে— পৃথিবীর ইতিহাসে সে একটা কাজ করচে, সেটা স্থানীয় পলিটিক্‌সের চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও মূল্যবান— এই কথাটা কেবল আমার কাছের লোকদের পক্ষে বোঝাই সব চেয়ে অসম্ভব হয়েচে। এই মানসিক বাধাটুকু বরাবর থেকে গেছে বলেই আমি শান্তিনিকেতনে বেশি কিছু দিতে পারলুম না— সেইজন্যেই ওখানকার কাজে ঔদাসীন্য ঘুচল না। অথচ ওখানে যা

বহুকাল থেকে আমি ছড়িয়ে দিয়ে এসেচি, যা কোনো চিহ্ন না রেখে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তারি কিছু কিছু অংশ কুড়িয়ে নিয়ে এসে সমস্ত পৃথিবীতে আমার আপন করতে পেরেচি— কিন্তু ওখানে এমন আসন তৈরি হল না, যাতে আমাকে কুলোয়। তাই আমাকে এত দুঃসহ পরিশ্রম করতে হচ্চে, এত প্রাণপণ দুঃখ করেও যথেষ্ট ফল পাচ্চিনে। কিন্তু ফল পাওয়ার মানেই মজুরি চুকিয়ে পাওয়া— তাতেই বোধ হয় কাজের দাম কমে যায়— এইজন্যেই বিনা প্রতিদানে নিজের কাজ দিয়ে প্রাণ দিয়ে মানুষকে ঋণী করে যাওয়াই ভালো —পাওনা চুকিয়ে নেওয়া একেবারেই ভালো নয়। বুঝে পড়ে নিতে অনেক সময় চাই— সেই সময় আমার জীবিতকালের পরে আসাই ভালো। ইতি ১৪ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসুমতীর একটা লেখা দেখ্‌তে পাই নি যেটাতে টাইটানিক ডোবার উল্লেখ আছে। সেটার সংশোধন আবশ্যক। ঐ পত্রগুলির তর্জ্জমা পেলে কাজে লাগত।

৫৬

৩ নবেম্বর ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চার নম্বর ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও তার মূল বাংলা (নৈবেদ্যে) কপি করে পাঠিয়ে দিয়ো এখানে বই হাতের কাছে নেই। হারাসানের অসুখ নিয়ে আশা নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে দিন যাচ্চে। কিন্তু মনটাকে বর্ত্তমানের হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করচি।

তুমি তোমার নতুন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েচ শুনে খুসি হলুম— আমিও কবে উপরিতলায় অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারব সেই চিন্তা করচি।

লেখবার চেষ্টা করি— বাধা বিস্তর। দায়গুলো ঘাড় থেকে নামলে শরৎকালটার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে মোকাবিলা করতে পারব। ইংরেজি সোপান? নন্দলালকে মনে করিয়ে দিয়ো সহজ পাঠের ছবিগুলো সেরে ফেলতে। বছর খানেক প্রায় হতে চলল— আর দেরী সয় না। ইতি ১৭ কার্ত্তিক ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

৯ এপ্রিল ১৯৩০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। ইংলণ্ডে এসে ইংলণ্ডের মহত্ত্ব যদি চোখে না পড়ে তবে সেটা দুর্ভাগ্য, ওখানে তোমার ভালো লাগ্‌চে তার চেয়ে ভালো খবর আর কিছু নেই। আমার প্রায় চারটে লেকচার হল। ড্রামণ্ডের চিঠি পেলুম। ১৯ মে ও ২১ মে এই দুদিন দুটো লেকচারের জন্যে রেখেচে। কিন্তু চারটের কমে জিনিষটা জোর পাবে না। ওকে লিখ্‌তে হবে। এখানে বেশ রোদ্দুর পড়েচে। কদিন বৃষ্টিবাদলের উৎপাত ছিল— সে কেটে গেছে। এখন থেকে এই রকমই চল্‌বে আশা করচি।...

বিজয়ার খবর এতদিনে পাওয়া গেল। বোধ হয় আসবে। এখানে চেম্বারলেন এসেচেন, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন। প্রথম দিন আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। ইতি

৯ এপ্রেল ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮

৬ জুন ১৯৩০

কল্যাণীয়েষু

হয় ত এতদিনে বাসায় পৌঁচেছ। আমি ডানা মেলচি নতুন রাস্তায়। কিন্তু মন ক্লান্ত, বুঝতে পারি আমি তোমাদের বয়সী নই। দেশ থেকে দুঃখের খবরে মন পীড়িত হয়ে থাকে এই বেদনার ভার সত্যভাবে বহন করবার জন্যে যৌবনের জোর চাই। কিছুদিন থেকে নিজের একলা জীবনের বোঝাটা বড়ো বেশি অনুভব করচি। বহুদিন থেকে মানুষকে নানা কথা শুনিয়েছি কিন্তু কাছে টানতে পারি নি। দায়িত্ব নিয়েছি প্রকাণ্ড আকারের, তার দাবী মস্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন, চেষ্টা করেচি সহায় পেতে— ফুটো ঝুলি থেকে সব খসে পড়ে, কিছুই জমিয়ে তুলতে পারি নে। ভিতরে একটা ছেলেমানুষ আছে, সে বাজে খেলা নিয়ে দিন কাটাতে চায়, কিন্তু বাইরে যে-বুড়োটা আছে সে কর্ত্তব্যের দোহাই পেড়ে খেলা মাটি করে দেয়। কাজ করতে গেলে উপকরণ চাই, খেলতে গেলে কিছুই চাই নে। আমার শাস্তি এই যে, উপকরণ পাব না, কাজ করব— খেলাঘরে আপিস বানাতে হবে— দিন বয়ে গেল। এই দোটানার মাঝখানটাতে দিনান্তকালের পূরবীর সুরে রব উঠ্‌চে, আর কেন, আর কতদিন? খেলা জমাতে পারতুম, কিন্তু কাজ জমাবার হুকুম এল— অথচ কাউকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। শেষ পর্য্যন্ত পাঁকের

উপর দিয়ে একলা লগি ঠেলে নৌকো চালাতে হবে। ইতি
৬ জুন ১৯৩০

আজও সেই বায়োকেমিক ওষুধ এল না। থাকগে ওষুধ
—এখন চল্‌লুম—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯
১৬ জুন ১৯৩০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। লণ্ডনে তাড়াহুড়ো করে একজিবিশন হতে দেবনা। আমরা যখন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত য়ুরোপে আছি তখন কোনো এক সময়ে ভালো করে উদ্যোগ করা কঠিন হবেনা। Illustrated London News ওয়ালারা আপনা হতে ছবি ছাপবার প্রস্তাব করেচে। Studioতে ছাপা হতে পারলে আরো খুসি হই।— বসুমতীতে যে পত্রাবলী ছাপা হয়েছিল Unwinরা তারি তর্জ্জমা ছাপতে ইচ্ছুক। তোমার কাছে যদি থাকে আমাকে পাঠিয়ে দিলে একটু একটু করে তর্জ্জমা করার চেষ্টা করি। তুমি যখন এখানে আসবে Boots এর Ragesan Hair Tonic এক বোতল আমার জন্যে নিয়ে এসো— উপকার হয়েচে।

Manchester[এ] যাতে Exhibition হতে পারে এণ্ড্রুজের সেই ইচ্ছে। হলে ভালোই হয়। লণ্ডনে যে ৪৭ খানা ছবি ইণ্ডিয়া সোসাইটির দেয়ালে অকারণে ঝুলচে সেইগুলো এণ্ড্রুজ বর্ম্মিংহামে নিয়ে যাবে।

এখানে আমার দিন ভালোই যাচ্চে। হৈমন্তীকে সেমন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ১৬ জুন ১৯৩০

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

৯ জুলাই ১৯৩০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, দীর্ঘকালের মতো ঘুরপাক খেতে চল্‌লুম। মনে করলে ভয় হয়। তুমি সঙ্গে থাকলে খুসি হতুম, তোমারও উপকার হ'ত— কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব হবেনা মনে করে এণ্ড্রুজকেই স্থির করেচি। আপাতত সঙ্গী সহায় রূপে চল্‌ল এরিয়ম— তার পরে ২০শে তারিখ নাগাদ এণ্ড্রুজ সেখানে গিয়ে জুট্‌বে। চিত্রপ্রদর্শনী আরম্ভ হবে ১৭ই তারিখে। আশা করি সেখানে সমাদর পাবে। এই ছবি সম্বন্ধে ভিতরের দিকেই আমার নেশা আছে, বাইরে থেকে উৎসাহের দরকার হয় না। কিন্তু আমার দেশের কণ্ঠে এখানকার ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি ওঠে, সেইটেকে জাগাতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত

হতে পারি। তাদের কাছ থেকে স্তুতি আমি চাইনে— কিন্তু তাদের ক্রূর কটাক্ষবিক্ষেপ থেকেও আত্মরক্ষা করবার ইচ্ছে আছে। ইতিমধ্যে তোমাদের ওখানে রথী যাচ্চে— আশা করি ভালোই থাকবে। তোমরা ডেনমার্কে চলে যাবার আগেই রথীদের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হতে পারবে আশা করি। তোমাদের সঙ্গে বোধ হয় দেশে ফেরবার আগে আর দেখা হবেনা। চেষ্টা করব আর ব্রিটিশ খাড়ি পাড়ি না দিতে। সুধীর কর জেলখানায়, আমার বই ছাপানো সম্প্রতি লবণাশ্রু জলে পরিপ্লাবিত। সেমন্তী ওরফে অমিতি এবং তোমরা উভয়ে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ৯ জুলাই ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

৮ নবেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বৃহস্পতিবারে যাব। অতএব এখন এখানে এসোনা। অনেক জরুরি চিঠিপত্র জমে উঠেচে। আমি সেই গল্প মাজাঘষা এবং লেকচার লেখায় নিবিষ্ট আছি— তা ছাড়া কুঁড়েমিও আছে। কোনো দায়িত্বকে স্বীকার করতে এখন একটুও ভালো লাগেনা।…

এখানে বেশ অনুভবগম্য রকমের শীত পড়েচে।...ইতি
২২ কার্ত্তিক ১৩৩৯

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগ্রহায়ণের পত্রধারা পাঠিয়েছ কি? প্রুফ পাই নি।

৬২
[১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার জন্যে মনটা ব্যথিত হয়ে আছে। য়ুরোপে হয় তো যাওয়া ভালোই হবে— তবু তার পূর্ব্বে একবার এখ[া]নকার সহজ চিকিৎসা চেষ্টা করে দেখো। ছাঁচি কুমড়োর রস প্রভৃতি পথ্যযোগে বিশেষ উপকারের দৃষ্টান্ত দেখেচি। একবার জীবন রায়ের পথ্য ও ওষুধ দেখতে দোষ কি। পথ্য সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সতর্ক। সেই সতর্কতার গুণে রাণী অনেক দিন অনেক পরিমাণেই সুস্থ আছে। কিশোরী তারই বিধানে অসম্ভব রকমে আরোগ্যলাভ করেছে। ইতিমধ্যে তুমি যদি বায়োকেমিক সাইলিসিয়া খেয়ে দেখ তাতে দোষ নেই আর সেই সঙ্গে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌।

কলকাতায় এসেছি। এখানকার দুই একটা ঝঞ্ঝাট সেরে যতশীঘ্র পারি শান্তিনিকেতনে ফিরব। ঘনঘোর বর্ষা নেবেছে —বৃষ্টির প্লাবনে দেশ ভেসে যাচ্চে— আকাশ মেঘাবৃত।

গরম নেই। শান্তিনিকেতন নিশ্চয়ই খুব মনোরম হয়েছে। আশ্রমে তোমার অভাব খুবই অনুভব করব— কিন্তু যাই হোক তোমার আরোগ্য হওয়া চাইই। কবিতাটি নিশ্চয়ই ভালো এবং পরিচয়ওয়ালারা নেবেই। আজকালের মধ্যে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হবে আশা করি। যদি অল্পদিনের মতো আশ্রমে আসো তাহলে তোমাকে খুবই সাবধানে রাখতে পারব— আশঙ্কা কোরোনা।

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ

৬৩

[অক্টোবর ? ১৯৩৩]

ওঁ

অমিয়

এতদিন পরে আজ তোমরা চলে গেলে কীরকম খারাপ লাগচে বলতে পারি নে। এ যেন মৃত্যুর বিচ্ছেদের মতোই কেবলি মনকে বৃথা আঘাত করচে। যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন কোনোমতেই মনে হয় না কোনোদিন মৃত্যু আসতে পারে। কিন্তু শেষকালে আসে। তার পরে মনকে সেই শূন্যতার সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়ে নিতে হয়। তোমাদের পুরোনো বাসায় জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল— তোমাদের ছোটো সংসার ঐখানে সুদূর পর্য্যন্ত শিকড় মেলেছিল। আজ ছিন্ন করতে হোলো— কেননা মনের প্রসার সংসারকে

ছাড়িয়ে যায়— তাকে দুঃখ পেয়ে দুঃখ দিয়ে নতুন নীড় বাঁধতে হয়। একদিন হয় ত মনে মনে এ কথা উঠ্‌বে যে ভাগ্যে বন্ধন ছিঁড়েছিলেম। টবের গাছকে বড়ো ভূমিতে যাবার সময় আঘাত পেতেই হয়— আশা করি এ আঘাত কাটিয়ে নিরাময় হয়ে উঠবে— এবং তখন তোমার পুরাতন জীবনের সঙ্গে মুক্ত নিঃসংসক্তভাবে আবার একবার আনন্দের যোগ অনুভব করবে। আমার বয়স হয়ে গেছে, নতুন সম্বন্ধ আর সহজে গড়ে ওঠে না— অল্প কয়েকদিনের জন্যে মনের বাসা বদল করা বড়ো কঠিন। তোমার সঙ্গে এমন একটা নিবিড় যোগ হয়ে গিয়েছিল যে এ বয়সে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়। কিন্তু তরুণজীবনকে এমন করে আঁকড়ে থাকা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যন্ত অন্যায়। একান্ত মনে কামনা করি তুমি স্বাধীনতার অবারিত মুক্ত আলোকে মনের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে ধন্য হবে। আমি যদি কোনো সাহায্য করতে পারি খুসি হব— চাইতে সঙ্কোচ কোরোনা। তুমি আমার অনেক করেচ, অনেক ক্লান্তি থেকে বাঁচিয়েছ— তোমার সহযোগিতা আমার পক্ষে বহুমূল্য হয়েছিল সে কথা কোনোদিন ভুলতে পারবোনা— কোনোদিন তোমার অভাব পূর্ণ হবেনা। কিন্তু কতদিনই বা বাকি আছে।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

৬৪

২ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার কথা বারবার মনে পড়ে। তুমি আমাকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলে পেয়েছিলে, এমন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়, এইজন্যে আমি তোমার পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেরেছি। এরকম সঙ্গ আমি আর কারো কাছ থেকে আশা করি নে। সৌভাগ্যক্রমে অক্সফোর্ডে তুমি প্রবেশ করতে পেরেছ, সেখানে কৃতিত্বলাভ করতে পারবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তোমার এই অভিজ্ঞতা তোমার জীবনকে মূল্যবান কোরে তুলবে মনে কোরে খুশি আছি। আমার চিত্তের ধারা বাইরে তার বেগ ক্রমশই হারাচ্চে বোধ করি এখন তার অন্তঃশীলা হবার সময় হোয়ে এল। লোকচক্ষুর গোচরে অনেক দিন কেটে গেছে, এখন আস্তে আস্তে আলো নিবিয়ে নেপথ্যে যাবার সময় হোলো এই কথাটাকে সহজ মনে স্বীকার করা উচিত। মহাভারতে আছে অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করতেই জানতেন বেরোবার বিদ্যা তাঁর জানা ছিল না— আধুনিক কালের মানুষ আমরা, জীবনসংগ্রামে ব্যূহ থেকে বেরোবার রাস্তাটা শিখি নি। আমার মনের অবস্থা যাই হোক বাইরে এখনো পথ খোলসা হয় নি। এখানকার সব খবর হৈমন্তীর কাছ থেকে পাচ্চ

আমার নিজের খবর এই যে সমস্ত খবর সংক্ষেপ করবার জন্যেই আমার মন উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২ এপ্রেল ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

২৫ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম।...

য়ুরোপে তুমি বরাবরকার মতো স্থিতিলাভ করতে চাও, অন্তরে বাহিরে হয়তো বাধা পাবে না। যেখানে না পাওয়া যায় সেইখানেই আমাদের যথার্থ দেশ। আমি নিজেও এই সংকল্প অনেকবার মনে এনেছি। য়ুরোপে মানবমনের সংঘাতে মনের নিগূঢ় শক্তি চরম পূর্ণতায় উদ্বোধিত হয় তাও আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তবু অনেকখানি বাকি থাকে, সেটা হচ্ছে অন্তরতম সম্বন্ধ, তাকে বিশ্লেষণ করে জানাতে পারিনে। অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুর সমাবেশে তার বহুধা বেদনা আমার সমস্ত মনকে জড়িয়ে রেখেছে— জন্মপূর্বের স্মৃতি আছে তার মধ্যে, আমার দৃষ্টিতে আমার শ্রুতিতে, আমার চিন্তায় আমার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের বহুতন্ত্রবিশিষ্ট

বীণায় সে আপন সুর বেঁধে দিয়েছে। তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে আমার ভোজে খাদ্য থাকে, এমন কি খাদ্য বেশিও থাকে কিন্তু তার স্বাদ থাকে না। এই কারণে যতবার আমি দেশের বাইরে গেছি এখানকার রূপে রসে ভরা আকাশ আমাকে ডাক দিয়ে পাঠায়। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমস্ত মন দিয়ে আমি ভালোবেসেছি বাঙালীর মেয়েকে, তার সকরুণ মাধুর্য্যে আমার মন অভিষিক্ত হয়েছে। যখন দূরে যাই এখানকার শ্যামশ্রীর স্মৃতিপটে তারি ছবিটি ফুটে ওঠে আমার মনে, মেঠো মূলতানের সুরে দূর থেকে বাজ্‌তে থাকে তারি কণ্ঠের গান বাংলার ভাষায়—

মনে রইল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায়গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হোলো না।

তখন কেবলি মনে পড়তে থাকে তমালতালীবনরাজিনীলা তটভূমি, সমুদ্রের পূর্ব্বপারে। আর মনে পড়ে মেঘচ্ছায়াঘন বর্ষার দিন আর ধারামুখরিত বর্ষার রাত্রি; বুকের মধ্যে বাজ্‌তে থাকে, মেঘৈর্মেদুরমম্বরংবনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অন্য কোন্‌দেশে পাব মাঘের শেষে আমের বোলের গন্ধের সঙ্গে মেশানো ক্লান্ত কোকিলের করুণ ডাক। আরো কত বলব কত সূক্ষ্ম কত বিরাট, কত গভীর, দেশে কালে সুদূর-প্রসারিত তার কত প্রতিবেদন, যার ভাষা নেই, যার ইঙ্গিত যূথীমালতীর সৌরভের মতো আর্দ্রবাতাসে সর্ব্বব্যাপী। অথচ এদেশের মানুষ পদে পদে আমাকে কঠিন আঘাতে জর্জ্জর

করেছে, নির্ম্মমভাবে আমাকে অবমানিত করেছে, অসহ্য হয়েছে কতবার, নিঃশব্দে আমি তা সহ্য করে এসেছি, তবুও আজ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারলুমনা তোমাদের আমি চাইনে। আমি অত্যন্ত বেশি বাঁধা পড়ে গেছি, দুঃসহ দুঃখেও আমার নিষ্কৃতি নেই। অথচ এও জানি সমাজের বাইরে একটা পারিবারিক দ্বীপের নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমার জন্মদেশের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলুম, সেই বিচ্ছেদের সমুদ্র পেরিয়ে দেশের শস্যক্ষেত থেকে আমি ফসল আনতে পারিনি, নিজের খাদ্য আমার নিজেকে একলা জন্মাতে হয়েছে, তার জাত আলাদা। দেশকে আমি যতই ভালোবাসিনে কেন, অনিবার্য্য কারণে আমার মন তবু আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সেইজন্যে এখানকার বাজারে সাহিত্যযাচনদার প্রবীণ মুরুব্বি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করতে বসে আমার অনেক সময়ে হাসি পায়। আমি যে জন্মব্রাত্য, শিশুকাল থেকেই আমি শ্রেণীভ্রষ্ট, এমনকি ব্রাহ্মসমাজও আমাকে খুঁটিতে বাঁধতে পারেনি। এইজন্যেই দেশের লোকের কাছ থেকে আমি প্রশংসা পেয়েছি প্রীতি পাইনি। কিন্তু বাঁধনের সর্ত্তে প্রীতি যদি না পেয়ে থাকি তবে তা নিয়ে খেদ করব না।···

এ কথা মনে রেখো যে দেশেই থাকো তোমার সার্থকতা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। ইতি ২৫ এপ্রেল ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬

২৯ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এ মেলে তোমার আর একখানি চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। বোধ হয় শুনে থাকবে আমরা দলবল নিয়ে সিংহলে যাচ্চি। অর্থসংগ্রহের এই পন্থা অত্যন্ত ক্লান্তিকর, সব সময়ে সন্তোষজনকও হয় না। কিন্তু অনুশীলনার দিক থেকে এর মূল্য আছে। সিংহলবাসীরা উৎসুক হয়ে আছে তারা আর্টের এমন একটা আদর্শ পাবে, যেটা তাদের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নতুন পথ করে দেবে। বোম্বাইয়ে আমরা কিছু অর্থ পেয়েছিলুম কিন্তু উপকার করেছি তার চেয়ে বেশি। এই কাজটাকে বোধহয় বিশ্বভারতীর একটা প্রধান কাজের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। আজকালকার দিনে সব চেয়ে তারস্বর পলিটিক্সের; তার কাছে যখন আমাদের গান নিয়ে নাচ নিয়ে দাঁড়াই তখন সভাসুদ্ধ লোক অবজ্ঞা করে আমাদের তাড়িয়ে যে দেয় না এইটেতে বুঝতে পারি বধিরের কানেও মন্ত্র প্রবেশ করে। আজকাল বাংলাদেশ থেকে নাচ গান ও ছবির ঢেউ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়চে এর প্রথম প্রবর্ত্তনা এইখান থেকেই, সে কথা স্বীকার করতে হবে। হৈমন্তী নাচে বিশেষ একটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেচে। ওর মধ্যে সত্যিকার আর্টিস্ট্ আছে সে জেগে উঠেচে— এই নিয়ে সে খুব আনন্দ পেয়েছে। আমরা চেষ্টা করব ওকে এই পথে যথাসম্ভব এগিয়ে দিতে।—

তুমি ওখানে আমার বাণীকে প্রকাশ করবার ভার নিতে চাও শুনে খুসি হলুম। আজকাল আমার নীরব হবার সময় এসেছে। এখন আমার গোধূলির কাল। এখন আমার দূরকালের স্মৃতিপটে নানা রং ভেসে উঠ্‌চে, কিন্তু গানের সময় শেষ হয়ে এলো। যে সব কথা বলবার ছিল তাদের অজস্র বলতে পেরেচি জীবনের বসন্তকালে প্রথম উপলব্ধির আনন্দে —প্রজাপতি যেমন ডানা নিয়ে গুটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে চিত্তভাবও তেমনি আপন নানাবর্ণবিচিত্র ভাষা সঙ্গে নিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল। আজ নূতন প্রসারিত সেই সহজ-চঞ্চল ভাষা নেই— নিজের পুরোনো লেখা— অন্তত ইংরেজি লেখা— সম্পূর্ণ অন্য জন্মের বলে বোধ হয়, এখন আর সে আপন ইন্দ্রজাল নিয়ে ধরা দেয় না। অতএব আজ আমার হয়ে বলবার ভার তোমাদেরই পরে, তোমাদের কণ্ঠস্বরে বাধা নেই ব'লে তাই আনন্দ পাবে— আমার হাতে যা এতদিনে ম্লান হয়ে গেছে তোমার হাতে আবার তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ইতি
২৯ এপ্রেল ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

১৫ মে ১৯৩৪

ওঁ

কলম্বো

কল্যাণীয়েষু

বড়ো দুঃসময় পড়েছে। প্রথমত প্রজারা নিঃস্ব, শস্যের দাম অসম্ভব কমে গেছে, খাজনা প্রায় একেবারেই বন্ধ। নোবেলপ্রাইজের সুদ বন্ধ। বরোদার রাজা তাঁর মাসিক ৬০০ টাকার দান বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের সাংসারিক ও বিশ্ব-সাংসারিক খরচপত্র আয়ের তলানি এবং ঋণ দিয়ে চালাতে হচ্চে। তাই বেরিয়েছি দলবল নিয়ে, নাচগান করে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি। গেলবারে বোম্বাই থেকে কিঞ্চিৎ পেয়েছিলুম, না পেলে মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হোতো। এবারে এসেছি সিংহলে। মনোহরণ করতে পেরেছি কিন্তু সেই পরিমাণে অর্থহরণ করা সহজ নয়। বিশেষত এতদূরে সমস্ত দল নিয়ে আসার ব্যয় বিপুল। খরচ বাদে অল্প কিছু উদ্বৃত্ত থাকার আশা করা যায়। এ কিন্তু ফুটো কলসীতে জল ঢালা, যে টাকা আনি তাতে ছিদ্র বোজে না— ক্রমাগতই অকুলানের ধারাকে প্রবাহিত রাখার জন্যেই আমি দেশ বিদেশ থেকে টাকা আনচি— কিন্তু চিরদিন তো বাঁচব না।—

য়ুরোপের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার জন্যে আমাদের কাউকে সেখানে যদি রাখতে পারি তবে সেটা নিশ্চয় কাজে লাগবে। রথীকে সে কথা বলেচি। তার কোনো ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না রথী ভাবচেন। শান্তিনিকেতনে কলেজ ইস্কুলটা

বস্তুত বিশ্বভারতীর আপন সন্তান নয়, পোষ্যপুত্র। ওরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই— অথচ ওদের পোষবার জন্যেই আমাদের যথার্থ নিজের কাজকে দেউলে অবস্থার অতলস্পর্শ গহ্বরের মুখের কাছে দাঁড় করিয়েছি— সবসুদ্ধ একদিন ডুবতে হবে। কিন্তু মোহের ছলনা এ'কেই বলে— সত্যের চেয়ে মায়ার প্রলোভন বেশি। আমার কিছু করবার দিন নেই। এখন কন্‌স্টিট্যুশন— তার জন্যে খাটতে হয় কিন্তু তাকে দূর থেকে নমোনমঃ। ইতি ১৫ই মে ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮

২৬ মে ১৯৩৪

ওঁ চন্দননগর

কল্যাণীয়েষু

এ বৎসর অসহ্য গরমে তাড়া করে বের করে এনেছে শান্তিনিকেতন থেকে। গঙ্গার শরণাপন্ন হয়েছি— অনেককাল পরে আরেকবার সেই বোটের আতিথ্য নিতে হোলো। এ পদ্মার চর নয় চন্দননগরের নদীতীর। ঠিক এই জায়গাটাতে সামনের ঐ বাড়িতে ছিলুম যখন আমার বয়স আঠারো। মনে পড়ে সেই কাঁচা বয়সের কথা। মনটা কীরকম ছিল নৈহারিক, আপনাকে ভালো করে পাই নি বলে নিজেই নিজের কাছে সব চেয়ে অচেনা ছিলুম। কিন্তু যখন ছিলুম বোটে

তখন মনটা দানা বেঁধে উঠছিল। তখন সোনার তরীর কবিতার কাছাকাছি ঘুরচি। সাধনায় ছোটো গল্প লিখচি মাসে মাসে। কল্পনার ফোয়ারার মুখে লেখার ধারা তখন অজস্র চলছিল। বোটের বাসা আমার সেই অবারিত রচনার সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। বোটে প্রাণযাত্রার আয়োজন উপকরণ অত্যন্ত বিরল; প্রকৃতির আমন্ত্রণ চারদিকে ছিল সীমাহীন বাধাহীন, কিন্তু সংসারটা ছিল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে— দিনযাপনের মধ্যে ভার ছিল না, দায় ছিল না, আসবাব-পত্রের বোঝা ছিল না, লোকব্যবহারের উত্তর প্রত্যুত্তর ছিল না— আপনার মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়বার পথে দরজার কাছে কিছুই পায়ে এসে ঠেকত না। আজ বোটে এসে কতকটা সেই রকম সামগ্রীবিরল দিন পাওয়া গেছে। এখানে কোনো খবর এসে পৌঁছয়না, খবরের কাগজ পড়ি নে, যাদের কিছুমাত্র খাতির করতে হবে এমন সঙ্গী একজনও নেই। পড়বার বই অল্প কয়েকটা আছে, না পড়বার সময় সুদীর্ঘ। বেশ লাগচে। কবিতায় সনেট যেরকম বোটের জীবনযাত্রা ঠিক সেই জাতের, সুপরিমিত, তাতে বাহুল্য কিছুই নেই— দিনটা রাত্রিতে এসে পরিসমাপ্ত হয় অতি সহজে। টমসনের চিঠি পেয়েছি— আমার কবিতা সঞ্চয়িকায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেচে। আনুষঙ্গিকভাবে বলেছে জগতে আমি best short story writer। নির্ব্বাচনের কাজ কি চল্‌চে? তোমার কি যথেষ্ট অবকাশ আছে? উপযুক্ত লোকের পরামর্শ নিয়ো —মাঝে মাঝে মাজাঘষা করারও বোধ হয় প্রয়োজন হবে।

টমসনের চিঠিতে দেখলুম, তোমাকে অপ্রকাশিত যে কবিতা-গুলো পাঠিয়েছিলুম, তার সম্বন্ধে Sturge Moore প্রশংসা করে বলেছে, They are of first rate quality। সেগুলোও কি কাব্যসংগ্রহে স্থান পাবেনা? বাছাই করার পরে আমার সম্মতির জন্যে আমাকে পাঠাবার যে কোনো প্রয়োজন আছে তা আমার মনে হয় না। কেননা এ সম্বন্ধে সেখানকার সমজদারের বিচারই চরম বলে গণ্য করতে হবে। আমার পক্ষে ঠিকমতো বোঝা একেবারেই অসম্ভব। যাই হোক এই কাজটা যত সত্বর পারো সেরে ফেলো।...

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা যত শীঘ্র পারি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। ও বইটা নিয়ে আমার দেশবাসীর মধ্যে নিন্দা-প্রশংসার তুমুল তোলাপাড়া চলচে। বিদেশেও যদি নিন্দিত হয় তাহলে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে। কিন্তু আজকাল আমার মন নিন্দাপ্রশংসায় অত্যন্ত উদাসীন হয়ে আসচে। সাহিত্যিকের পক্ষে সেটা ভালো কি না সন্দেহ করি।

যে ফরাসী যুবকদের কথা লিখেছিলে তাঁরা এসে পৌঁচেছেন— আজকালের মধ্যেই আমার এখানে দেখা করতে আসবেন।—

তোমাকে আমার কবিতার যে তর্জ্জমা পাঠিয়েছি তার শেষ দুটি লাইন বাদ পড়েছে বলে নালিশ করেছ। বইখানা হাতের কাছে নেই— তাই ওটাকে সম্পূর্ণ করা শক্ত।

In the heart of the day allowed to me
I feel the invisible roll of
Time's chariot wheel rushing in silence।

কিন্তু এটা ঠিক জোড়া লাগবে কিনা তা তো আন্দাজে বলতে পারচিনে। ইতি মে ২৬ ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

২৩ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

Adyar
মাদ্রাজ

কল্যাণীয়েষু

তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। এতরকম লেখাও লিখ্তে হয়েছে। আজকাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায়। মনটা এখন স্বভাবত ছোটে ছবির দিকে। লেখায় খাটাতে হয় কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে। কর্ত্তব্য ফাঁকি দেওয়ার দিকেই মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। জীবন আরম্ভ করেছিলুম লীলা দিয়ে— পড়া এড়িয়ে লিখেছি কবিতা। মধ্যবয়সে সেই অকর্ম্মণ্যতা খুব কষে পূরণ করেছি লিখে লিখে। সে সব লেখা বোঝাটানা লেখনীর লেখা। তখন সেটাতে প্রবৃত্তি ছিল। নানা ভাবনা ভাবতুম আর লিখ্তুম— গদ্য ভাষায় নানা চাল উদ্ভাবন করতে ভালোই লাগত— তখন বাংলা গদ্য ভাষার গতিতে কলাবৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল না। তার

চাল দুরস্ত করবার কর্ত্তব্য শেষ করেছি। তার আড়ষ্টভাব গেছে, সে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে হাত পা খেলাতে পারে। তাই এখন আমার কলাচর্চ্চার সখটা ছুট্‌চে ছবির দিকে। এর মাঝখানে কর্ত্তব্যের গদি থেকে বক্তৃতার ফরমাস এলে ধৈর্য্য থাকে না। অথচ উপায় নেই। এখন মাদ্রাজে এসে এই লোকহিতকর পালা চলচে— টাগোরকে সাজতে হচ্চে কখনো শিক্ষাসংস্কারক, কখনো পল্লিসংস্কারক, কখনো বিশ্বসংস্কারক। এখন সব সাজ ফেলে দিয়ে চিত্রকূটের শিখরে চড়ে নির্জ্জনবাসের জন্যে মন উৎসুক।

তুমি তো পাড়ি দিলে সমুদ্রপারের দিকে— মনটা পিছনের টান এড়াতে পারছিল না— কেননা তখনো ওপারের ভোজে পাত পড়ে নি, দুদিকেই তখন ফাঁকা। আমি নিশ্চয় জানি সেখানে পৌঁছলেই মানুষের আহ্বান আসবে, সাড়া দেবে তোমার মন। এদেশে ভিড় আছে, এক খাঁচায় অনেকগুলি বন্দী পাখীর ভিড়। তাদের বাণী নেই, গান নেই, তারা কিচিমিচি করে, খোঁচাখুঁচি করে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে থাক্‌তে হয় কেননা সর্ব্বদা খাটো হয়ে আছি বলে। ভূমৈব সুখং —এখানে মানুষের ব্যবহারে ভূমার স্পর্শ নেই। তারস্বর উঠচে পলিটিক্সের হাটে। কিন্তু তার মধ্যে কী ক্ষুদ্রতা, কত মিথ্যা। মিথ্যার মিশোল সকল দেশের পলিটিক্সেই আছে। কিন্তু সে যেন দুধের সঙ্গে জলের মিশোল। আমাদের এখানে গোড়ার জিনিষটাই জল, অবাস্তবতা— তাতে হোয়াইটয়্যাবের দোকান থেকে কেনা টিনের দুধের ছিটে। গোড়ায় মস্ত ফাঁকি

ওঁ

Adyar
মাদ্রাজ

কল্যাণীয়েষু

তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। এত রকম লেখাও লিখতে হয়েছে। আজকাল একেবারে প্রকৃতি বদলেছে লেখায়। মনটা এখন সম্পূর্ণ ঝোঁকে ছবির দিকে। লেখায় খাটাতে হয় কর্তব্যবুদ্ধিকে। কর্তব্য ফাঁকি দেওয়ার দিকেই মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। জীবন আরম্ভ করেছিলুম গান দিয়ে — তার পরে লিখেছি কবিতা। মধ্যবয়সে সেই একাগ্রতার সুর কাট দূর করেছি লিখে লিখে। সে সব লেখা কোনোরকম লেখনীর লেখা। তখন লেখাতে প্রবৃত্তি ছিল। নানা ভাবনা ভাবতুম আর লিখতুম — গদ্য ভাষায় নানা চাল উদ্ভাবন করতে ভালোই লাগত — তখন বাংলা গদ্য ভাষার সাহিত্যে কলাবৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল না। তার চাল দুরস্ত করবার কর্তব্য শেষ করেছি। তার আড়ষ্টভাব গেছে, সে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে হাত পা খেলাতে পারে। তাই এখন আমার কলম চঞ্চল, সবেগে ছুটেছে ছবির দিকে। এর মাঝখানে কর্তব্যের দাবি থেকে বন্ধুদের ফরমাস এলে দিশে থাকেনা। অথচ উপায় নেই। এখন

মন্দিরে এসে এই লোককাহিনিরই পালা চলছে — দেবতাদের সবাকে হয়, কখনো শিক্ষাসংস্কারক, কখনো শান্তিসংস্কারক, কখনো বিশ্বসংস্কারক। এখন সেই কাজ ফেলে দিয়ে ত্রিকূটের শিখরে চড়ে নির্জনবাসের জন্যে মন উৎসুক।

তুমি তো পাড়ি দিলে সমুদ্র পারের দিকে — মনটা ডিঙিতে চড়ে এগোতে পারছিল না — কেননা তখনো ও পারের ঘোর হাত পড়ে নি, দুদিকেই তখন ফাঁকা। আমি নিশ্চয় জানি সেখানে পৌঁছলেই মানুষের আহ্বানে আবার সাড়া দেবে তোমার মন। এদেশে ভিড় আছে, এক খাঁচায় অনেকগুলি পোষা পাখীর ভিড়। তাদের ডানা নেই, গান নেই, ওরা কিচিমিচি করে, খোঁচাখুঁচি করে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে থাকতে হয় কেননা সর্বদা খাড়া হয়ে আছি মনে। দূরের সুর — এখানে মানুষের ব্যবহারে ভূমার স্পর্শ নেই। আবহাওয়া উঠেছে পলিটিক্সের হাটে। কিন্তু তার মধ্যে কী ক্ষুদ্রতা, কত মিথ্যা। মিথ্যার মিশোল সকল দেশের পলিটিক্সেই আছে। কিন্তু সেখানে দুধের সঙ্গে জলের মিশোল। আমাদের এখানে খোরাকের জিনিসটাই জল, যথাসম্ভব — তাতে হোয়াইটওয়ের দোকান থেকে কেনা টিনের দুধের ছিটে। গোড়ায় মস্ত ফাঁকি রয়ে গেছে — এ জন্যে

উদ্বৃত্তির পরে তার দিকে মহাশক্তির নজর পড়েছে।

উনসব তোমার Edit করতে দিচ্ছি। তার সঙ্গে এ বিষয়ে মোকাবিলার কোনো। তাতে সংশোধিত ও মুদ্রিত এক কপি দিয়েছি। সেই সঙ্গে তার মতামত। ওটা একটু হাত চালিয়ে শেষ করতে পারো যদি ভালো হয়। আমার নিজের মনে হয়, কোনো আপত্তি না করে ছাপিয়ে দেওয়াই ভালো। উনসব কী বলেন?

আমার সমস্ত ইংরেজি কবিতাগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে ছাপাবার প্রস্তাবটা ভুলো না। ইয়েটস কিংবা কোনো কবির সাহায্য নিয়ে বাছাই করা ভালো। ওতে কিছুর কাঁচা জিনিষ আছে — হয়তো কাঁচা লাইনগুলোকেও মাজাই করা দরকার। সুধ- সুধীরের উপস্থিতি থাকলেই ভালো হোতো। কিন্তু সেই অবকাশের প্রত্যাশায় থাকা না। নিজের লেখার তর্জমায় দুটি দুটি অবিচার করেছি। নিজের লেখা বলেই বোধ করি এত শৈথিল্য, এত সাহস।

রয়ে গেছে— এতদিন ধস্তাধস্তির পরে তার দিকে মহাত্মাজির নজর পড়েছে।

টমসন গোরা Edit করতে রাজি। তার সঙ্গে এ নিয়ে মোকাবিলা কোরো। তাকে সঞ্চয়িতা ও পুনশ্চ এক কপি দিয়েছি। সেই সঙ্গে চার অধ্যায়। ওটা একটু হাত চালিয়ে শেষ করতে পারো যদি ভালো হয়। আমার নিজের মনে হয়, কোনো অপেক্ষা না করে ছাপিয়ে দেওয়াই ভালো। টমসন কী বলেন ?

আমার সমস্ত ইংরেজি কবিতাগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে ছাপাবার প্রস্তাবটা ভুলো না। ইয়েট্‌স্‌ কিম্বা কোনো কবির সাহায্য নিয়ে বাছাই করা ভালো। ওতে বিস্তর কাঁচা জিনিষ আছে— হয় তো কাঁচা লাইনগুলোকেও ঝালাই করা দরকার। স্বয়ং স্বশরীরে উপস্থিত থাকলেই ভালো হোতো। কিন্তু সেই অনিশ্চয়ের প্রত্যাশায় থেকো না। নিজের লেখার তর্জ্জমায় ভূরি ভূরি অবিচার করেছি। নিজের লেখা বলেই বোধ করি এত শৈথিল্য, এত স্পর্দ্ধা।

আমার মাদ্রাজিকীর্ত্তির কিছু নমুনা খবরের কাগজের আবর্জ্জনা থেকে উদ্ধার করে পাঠাচ্চি।

Man নামক তিনটে বক্তৃতা Unwinরা ছাপায় এইটেই রাধাকৃষ্ণনের অভিমত। কিন্তু অত ছোটো বই তাদের পছন্দসই হবে কিনা সন্দেহ। আর্ট সম্বন্ধে একটা বড়ো লেখা লিখেছি সেটা ঐ সঙ্গে চলত— কিন্তু সেটা রাধাকৃষ্ণন দখল

করচেন Contemporary Indian Philosophy নামক বইয়ের জন্যে। ইতি ২৩ অক্টোবর ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০

১৫ নবেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার প্রেরিত দুখানা প্যাম্ফলেট শেষ করে তোমাকে লিখতে বসলুম। মাদ্রাজ থেকে তোমাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছি বোধ হয় পেয়েচ। ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে নাচগান বর্ষণ করে বেড়ানো এই আমার এক কাজ হয়েচে। হাসি পায় মনে করলে যখন ভাবি এই সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রনেতারা সমস্ত দেশ জুড়ে বক্তৃতামঞ্চে কন্‌গ্রেসের উত্তেজনা বিস্তার করে বেড়াচ্চেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু কী স্তূপাকার অবাস্তবতা, কৃত্রিমতা। এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের অনৈক্য কেবল ভাষাগত নয় স্থানগত নয় মজ্জাগত। পরস্পরের মানবসম্বন্ধ কেবল যে শিথিল তা নয়, অনেকস্থলেই বিরুদ্ধ। আমরা ভোটের ভাগ বিভাগ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছি, যেন অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাক্‌লেও ভোটের সামঞ্জস্যে এই ফাটল ধরা দেশের সর্ব্বনাশ নিবারণ করতে পারবে।

আজকাল আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিকভাবে দেখবার চেষ্টা করি; মরবার কারণ যেখানে আছে সেখানে মরেই এর চেয়ে সহজ কথা কিছুই নেই। পার্লামেণ্টরি রাষ্ট্রতন্ত্র! একি বিলিতি দাওয়াইখানা থেকে ভিক্ষে করে আন্‌লেই তখনি আমাদের ধাতের সঙ্গে মিলে যাবে! নিয়ুয়র্কের আকাশ-আঁচড়া বাড়ি আমাদের পলিমাটির উপর বসিয়ে দিলে সেটা তার অধিবাসীদের কবর হয়ে উঠবে। সাদা কাগজের মোড়কে আমাদের ভাগে কী দান কী পরিমাণে এসে পোঁছল সেটা বেশি কথা নয়, যাকে দেওয়া হচ্চে তারি পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে কতটা টেঁকে সেইটেই ভাববার বিষয়। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় যে আমাদের এতখানি দিতে প্রস্তুত হয়েচে। সন্দেহ নেই যে এই দেওয়াটাই শেষ কথা নয়, এটা আমাদের ভবিষ্যতের বড়ো দাবীকে উত্তেজিত করে দেওয়া মাত্র—থলির মুখ খুলল, এর পরে শেষ পর্য্যন্ত থলি ঝেড়ে দিতে হবে,— ওর শিলমোহরটা এবার টুট্‌ল। বিদেশী সাম্রাজ্যের এতটা দাক্ষিণ্য ইংরেজজাতের ছাড়া আর কোনো জাতের হাত দিয়ে হতে পারত না। হয়তো এই দানের সঙ্গে সঙ্গে সুবুদ্ধিও আছে। জগৎ জুড়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণিবাতাস জেগে উঠচে তাতে ভারতবর্ষের মন না পেলে ভারতবর্ষকে শেষ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করা সম্ভব হতে পারে না। যে মুসলমানকে আজ ওরা সকলরকমে প্রশ্রয় দিচ্চে সেই মুসলমানই একদিন মুষল ধরবে। যাই হোক্, লুব্ধতা স্বভাবে প্রবল থাকলে

সুবুদ্ধির দূরদর্শিতা কাজ করতে পারে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস য়ুরোপের অন্য যে কোনো জাত এমন কি আমেরিকান কর্ত্তা হলে ভারতবর্ষের গলার ফাঁসে আরো লাগাত জোর— নিজেদের নির্ম্মম বাহুবলের পরেই সম্পূর্ণ ভরসা রাখত।— আমাদের তরফে একটা কথা বলবার আছে, ইংরেজের শাসনে যতই দাক্ষিণ্য থাক্ আজ পর্য্যন্ত না মিলল আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা, না জুটল যথেষ্ট পরিমাণে পেটের ভাত, না ঘটল স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। শাসনতন্ত্রের কাঠামো রক্ষা করতেই পুঁজি শেষ হয়ে আসে, প্রজাদের মানুষ করে তুলতে হাতে কিছুই থাকে না। এই ঔদাসীন্য আমাদের শতাব্দী ধরে হাড়ে মজ্জায় জীর্ণ করে দিল। আমাদের পাহারা আছে আহার নেই এমন অবস্থা আর কতদিন চল্‌বে। অথচ ওদের নিজের দেশে প্রজার অন্নাভাব সম্বন্ধে ওদের কত চিন্তা কত চেষ্টা। কেননা ওরা ভালো করেই জানে আধপেটা অবস্থায় কোনো জাতের মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। আমাদের বেলায় সেই মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ওরা ছোটো করে নিয়েছে তারি নির্ম্মমতা আমাদের সুদূর ভাবীকালকে পর্য্যন্ত অভিভূত করে রেখেচে। তাই মনে হয় নিজেদের স্বভাবগত সমাজগত প্রথাগত সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও নিজের দেশের ভার যে করেই হোক নিজেকেই নিতে হবে। পরের উপর নির্ভর করে থাকলে দুর্ব্বলতা বেড়েই চলে, তা ছাড়া ইতিহাসের আবর্ত্তমান দশাচক্রে অনন্তকাল ইংরেজের শাসন অচলপ্রতিষ্ঠ থাকতেই পারে না। নিজের ভাগ্য নানা ভুলচুক নানা দুঃখকষ্ট বিপ্লবের

মধ্য দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই।— সেই শিক্ষার আরম্ভপথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম। য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়,— চিরদিনই চীনের মতোই ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব কী দুঃখ কী অন্ধতা কী শোচনীয় নিঃসহায়তা, বলে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্ব্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি, না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার এই গ্রামের কাজে। এতদিন পরে মহাত্মাজি হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন— অনেক আগে সুরু করা উচিত ছিল, এ কথা আমি বারবার বলেচি। আজ তিনি কন্‌গ্রেস ত্যাগ করেছেন। স্পষ্ট না বলুন এর অর্থ এই যে কন্‌গ্রেস জাতিসংঘটনের মূলে হাত দিতে অক্ষম। যেখানে কাজের সমবায়তা স্বল্প সেখানে নানা মেজাজের মানুষ মিল্‌লে অনতিবিলম্বে মাথা ঠোকাঠুকি করে মরে। তার লক্ষণ নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী কাজ কেউ

করতে পারে না। আমার অল্পশক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারি নি কিন্তু এই কথা মনে রেখো পাবনা কন্‌ফারেন্স থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার করে এসেচি। আর, শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে, ফলের কথা আজ কে বিচার করবে।— খেলাচ্ছলে আমার তিনটে গানের ইংরেজি তর্জ্জমা করেছি তোমাকে এই সঙ্গে পাঠাই। ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজি চয়নিকার প্রস্তাব ভালো। প্রবন্ধগুলো type করিয়ে পাঠাব। চার অধ্যায়ের কথা ভুলো না। Gilbert Murrayর চিঠি পাইনি। তোমার হাত দিয়ে Maud Roydenকে চিঠি পাঠিয়েছিলুম— তিনি পেয়েছেন তো? Muriel Lester?

৭১

২৮ নবেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার কবিতার ইংরেজি তর্জ্জমা পড়ে দেখলুম। Fruit Gathering এবং Lover's Giftএর অধিকাংশ কবিতাই একেবারে অচল। পড়তে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হোলো। কী

রকম কাঁচা হাতে অবহেলা করে লিখেচি। এগুলো বরাবরকার মতো বাদ দিতে হবে। Fugitive থেকে গোটাকতক বাদ পড়বে। যেগুলো বর্জ্জনীয় বলে দাগ দিয়েছি তার ছু চারটে সম্বন্ধে ঈষৎ দ্বিধা হয়েচে। যাই হোক ভালো করে পড়ে দেখো। Crossingএর অনেকগুলোই ভালো লাগল। আমার বোধ হয় গীতাঞ্জলির পরেই সেগুলো ছাপানো যেতে পারে। মূল কবিতাগুলির সময়পর্য্যায় দূরবর্ত্তী নয়। ইংরেজি বইয়ের নাম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ না করে এবং ঐ নামগুলো একেবারে বাদ দিয়ে যদি কবিতাগুলি ছাপানো যায় তাহলেই আমার মতে সেটা ভালো হয় কারণ ঐ বইগুলি এখন থেকে একেবারে চাপা দিতে হবে। অমনিতেই বিক্রি হয় না সুতরাং লোকসানের আশঙ্কা নেই। Gitanjali, Gardener, Crescent Moon, Fugitive, Chitra, Sacrifice and Other Plays— এইগুলো একত্র করে একখানা বই বের করাই শ্রেয়, আর ওরি সঙ্গে অন্য বই থেকে বর্জ্জনীয় বাদ দিয়ে বাকিগুলো গেঁথে দিলেই চলে যাবে। Stray Birds এবং Fireflies একদল পাঠকের কাছে উপাদেয়— সকলের কাছে হয় তো নয়। ওর কোন্‌গুলো রাখা যেতে পারবে উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির কোরো— আমার পক্ষে বলা শক্ত। Sacrifice and Other Plays চলবে কি না জানিনে— সেও তোমরা ঠিক কোরো। চিহ্নিত বইগুলি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।...

বিশ্বভারতী Journal থেকে আমার গদ্য লেখা টাইপ

করিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। হাল আমলের কবিতাগুলোও *সেইসঙ্গে পাঠাব*— যদি ইংরেজি চয়নিকায় সেগুলো যাবার যোগ্য মনে করো তো দিতে পারো। মোদ্দা কথা এই চয়নিকা[র] জন্য কাব্যবিচারে আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কোরো না। আমি ঠিক বুঝতেই পারিনে। কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবার দরকার নেই— কারণ আমার ইংরেজি লেখা সম্বন্ধে লেখকজনোচিত অহঙ্কার আমার লেশমাত্র নেই। এ চিঠিটা Air Mailএ যাবে কিন্তু বইগুলো যাবে সাধারণ ডাকে— অতএব পৌঁছতে দেরি হবে। য়ুরোপে যাবার সঙ্কল্প মাথার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে গুঞ্জরিত হচ্চে। ইতি ২৮ নবেম্বর ১৯৩৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Gitanjali, Gardener, Crescent Moon, Chitra পাঠাবার দরকার নেই বলে পাঠালুম না— Gitanjali থেকে শিশুদের কবিতা অবশ্য বাদ পড়বে। আমি যেগুলো চিহ্নিত করেছি তারো অতিরিক্ত কিছু যদি ছাঁটতে চাও নির্ম্মমভাবে ছেঁটো।

৭২

১১ ডিসেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ইতিমধ্যে কাশি ঘুরে এসেচি। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন মালব্যজির অস্বাস্থ্যের জন্যে পিছিয়ে গেছে, কিন্তু সঞ্জীব রাওয়ের বিদ্যালয়ে আমার আমন্ত্রণ ছিল সেটা আর কাটাতে পারলুম না। আবার আমাকে যেতে হবে ৮ই ফেব্রুয়ারিতে। আজকাল বাইরের দিকে দৌড়ধাপ আমার একটুও ভালো লাগে না। উদার প্রান্তর এবং উন্মুক্ত আকাশের নীচে আপনার মধ্যে নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট হয়ে বসে থাকতে ভারি ভালো লাগে। এখন কাজ না করাটাই আমার সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য এ কথাটা সবাইকে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না। অথচ বাইরের ছোটো বড়ো নানাবিধ দায় আমার চারদিকে প্রতিদিন জটিল জাল বিস্তার করচে— কিছুদিন থেকে জনতার ক্ষেত্রে আমাকে আগেকার চেয়ে বেশি করেই ঘুরপাক খাওয়াচ্চে। এর প্রয়োজনীয়তা অতি যৎসামান্য। এদের সরকারী ধুমধামের একটা সজ্জারূপে এরা আমাকে ব্যবহার করতে চায়— অথচ এই ব্যবহার্য্য জিনিষটির প্রতি এদের আন্তরিক মমতা কিছুমাত্র নেই— খুচ্‌রো কাজে আমাকে জীর্ণ করে ফেল্‌তে এরা অকুণ্ঠিত। আমি জানি অন্য দেশের সমাজে আমার মতো মানুষের প্রতি যেমন তেমন দাবী প্রয়োগ করতে সঙ্কোচ বোধ করে, এখানে সঙ্কোচ মাত্র নেই,

তার কারণ যথেষ্ট পরিমাণ শ্রদ্ধা নেই। এই কারণেই আমার মন অত্যন্ত ক্লান্ত এবং চারিদিক থেকে বিমুখ হয়ে পড়েচে। যদি অর্থে এবং সামর্থ্যে কুলোতো তাহলে কিছু কালের জন্যে বিদেশে অজ্ঞাতবাস করে আসতুম।

এতদিনে আমার চিহ্নিত বইগুলি বোধ করি পেয়েছ। ওগুলোর প্রতি চোখ বুলোতে গিয়ে দেখলুম একদা কী. অযত্ন করে তর্জ্জমা করেচি। মূলটা ভাষান্তরে তার মূল্যটা কতদূর হারিয়ে ফেলচে সেটা যথোচিত সময় নিয়ে বিচার করি নি—আজ তার জন্যে লজ্জা বোধ হয়। তোমার কাছে আমার নিবেদন, সম্পূর্ণ আমার উপরেই নির্ভর না করে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ কোরো। অবিচার করবার আশঙ্কা আমার তরফ থেকেই বেশি।

তুমি সেই তিনটে গানের অনুবাদ ওখানে ছাপতে দিতে চেয়েচ। দিয়ো।

চার অধ্যায় গল্পের গোড়ায় একটা সূচনা লেখা হয়েচে—সেটা তোমাকে পাঠাব। ইতিমধ্যে স্থির করেচি বইটা এখানে প্রকাশ করে দেব। দেখাই যাক্ না কী পরিণাম হয়। কিন্তু তাই বলে তোমার তর্জ্জমায় ঢিল দিয়ো না। যদিই এখানে ওরা এটা বন্ধ করে দেয় সেখানে ওটা প্রকাশ চল্‌বে। এ কথা ওদের বোঝা উচিত সমস্ত গল্পটাই বৈভীষিক রাষ্ট্র-উদ্যমের বিরুদ্ধে।

আমাদের এখানে শীতের আবির্ভাব পরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে। তোমাদের ওখানকার কুহেলিকাবৃত মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিসিক্ত শীতের

কথা কল্পনা করলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রকৃতির স্পর্শ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার জন্যে সর্ব্বদাই তোমরা আচ্ছাদন বহন করে বেড়াচ্চ। সেই নিত্যবন্ধনদশার ভয়ে ও দেশে বাস করতে ইচ্ছে করে না। এখানে, বিশেষত, শান্তিনিকেতনে শীতকালটা অত্যন্ত রমণীয়— রৌদ্রের মধ্যে কী বিস্তীর্ণ প্রসন্নতা! পাতাঝরানো গাছ অতি অল্পই আছে। দুঃশাসন শীত বনলক্ষ্মীর বস্ত্র হরণে কৃতকার্য হতে পারে নি। শিউলি ফুলের দিন ফুরিয়েছে, কাঁটা নাগেশ্বর ফুলের গন্ধে বাতাস মদবিহ্বল, আর আমাদের হিমঝুরি ফুলের উচ্চচূড়-বীথিকা তার পাতার স্তবকে স্তবকে ঘন দোদুল্যমান ফুলের রূপোলি কারুকার্য্যে নিবিড় বিচিত্রিত। হিমঝুরি নামটা আমারি দেওয়া— ওর চলিত নাম জানি নে।

এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান্ ঘরে বাস করে এসেছি— কোথাও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারি নি। এবার কোণার্কের এই কোঠা থেকেও সরে যাবার চেষ্টায় আছি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্ত্ত্যলোকে ঐটেই আশা করচি আমার শেষ বাসা হবে। তারপরে লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলবার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা। ইঁট পাথরের অহঙ্কারকে লজ্জা দিতে হবে।

আমার ছবির সম্বন্ধে আমার খুব বেশি আগ্রহ নেই। এমন কি ওর সম্বন্ধে আমার সঙ্কোচ আছে। আজও ছবিতে খ্যাতি অর্জ্জন করি নি বলে চিত্রকর-রূপে আমার মনটা মুক্ত, ও আপন খেয়ালে লীলায় রত লোকমতের নেপথ্যে—

কোনোদিন যদি দশের মনোরঞ্জন করে তো ভালোই, না করে তো ক্ষতি নেই। এই আঁকাজোকার যে স্থায়ী মর্য্যাদা আছে তা আজো আমার বিশ্বাসগম্য হয় নি। ভাবীকালের কাছে আমার পরিচয়ের সম্বল নিতান্ত কম জমে নি, তার উপরে আরো বাড়িয়ে তুলে লাভ কী। আমার মনে হয় কীর্ত্তিস্তম্ভকে যত প্রশস্ত করে গড়া যায় ততই কালের হাতে আক্রমণের লক্ষ্যকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যশের তরীতে বোঝাই যতই স্বল্প অথচ মূল্যবান করা যায় ততই ডুবির আপদ কমে। ইতি ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

১ জানুয়ারি ১৯২৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি চিঠিতে চিত্রপ্রদর্শনী সম্বন্ধে যা লিখেছিলে তা অল্প একটুখানি মেজে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিয়েছি, তোমার নাম দিইনি। তোমরা লণ্ডনে আমার ছবি দেখাতে চাও, আমি কিন্তু মনে উৎসাহ পাইনে— আমার ছবি এতই যূথভ্রষ্ট শ্রেণীহারা এতই অশিক্ষিত আঙুলের খেলামাত্র যে ওগুলোকে সমজ্‌দারের দৃষ্টির কাছে ধরতে আমি কুণ্ঠিত। আমার মৃত্যুর

পরে ওর আবরণ মোচন কোরো— তখন ওর মূল্য হবে ঐতিহাসিক দিক থেকে।

রাশিয়ার চিঠিতে এমন কিছু যদি বাদ পড়ে থাকে যেটাতে ওর স্বাদ নষ্ট হয় তাহলে সে তোমরা ফিরিয়ে নিতে পারো। কিন্তু নাম না দিয়ে একজায়গায় টমসনের উপর খোঁচা ছিল সে যেন না থাকে। ঝগড়াটে সুরটা undignified বলে অনেক জায়গায় ছেঁটেচি, কিন্তু তোমাদের মতে যদি তাতে ক্ষতি হয়ে থাকে যথোচিত ব্যবস্থা কোরো। বিশ্বভারতী পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখ্‌লুম তাতে রাশিয়ার দুই একটা চিঠির তর্জ্জমা আছে। তর্জ্জমা আমার নয়, হিরণ-কুমার সান্যালের— যদি তুলনা করে এটাই গ্রাহ্য মনে হয় তবে যথাকর্ত্তব্য কোরো। কপি করে পাঠিয়ে দেব।

গিল্‌বর্ট্‌ মারের সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তিনি তিন জায়গায় মাত্র অল্প কিছু বদল করেছেন, তাই নিয়ে তিনি কুণ্ঠিত। আমি তাঁকে চিঠি লিখব, ইতিমধ্যে যদি দেখা হয় তবে তাঁকে বোলো, তিনি যেটুকু বদল করেচেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, নিজের ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে আমার লেশমাত্র অভিমান নেই সে তুমি জানো। নিজের শক্তির পরে অবিশ্বাস আছে বলেই ইংরেজি লিখতে আমি এত অনিচ্ছুক, কাউকে সহায় পেলে তবে ভরসা হয়। ইংরেজি ভাষার সাধনা করি নি তবু সিদ্ধির পুরস্কার পাব এ তো ন্যায়সঙ্গত নয়।— তোমাকে আর বারে যে কয়টা কবিতা পাঠিয়েছি— তার উপরে আরো গোটাকতক চোখে পড়ল— এইসঙ্গে পাঠাই। কিন্তু বারবার বলচি বাছাই

করবার ভার তোমাদের উপরে— সেইজন্যেই নিজে বাছাই করলুম না।— বাংলা সঞ্চয়িকা সম্প্রতি সুধীন্দ্রের হাতে এসে আট্‌কা পড়ে আছে··· তাকে তাড়া দিয়ে এসেছি।

"আবার জাগিনু আমি" কবিতার তর্জ্জমা চেয়েছ। সে কবিতা কার রচনা জানিনে। যদি আমার হয়, তবে কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যায় কে আমাকে বলে দেবে। আমার আধুনিক কালের কবিতা আমার আধুনিককালীন বিস্মরণশক্তির স্রোতে ভেসে চলে যায়, আমি তার নাগাল পাইনে। সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। উর্ব্বশী ও সাজাহানের পূরো তর্জ্জমা চেয়েচ। শক্তি নেই আমার— মন অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েচে— কী আমার বাংলা কী ইংরেজি, ভাঁটার নদীর মতো আমার মনের তটভূমি থেকে বহুদূরে সরে গেছে, স্রোতে পৌঁছতে সময় ও পরিশ্রম লাগে, তাই লেখা মাত্রেই আমার এত বিতৃষ্ণা। তবু দেখব যদি পারি।

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমাটা এসিয়া কাগজ চেয়েচে— অবশ্য দাম দেবে। সেটা আমার হাতের শোধন পাবার জন্যে আমার কাছে পাঠাবার দরকার আছে বলে মনে করিনে। তোমাদের সেখানকার ওস্তাদরা পছন্দ করলেই যথেষ্ট। ইতি
১ জানুয়ারি ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩ ক

৬ জানুয়ারি ১৯৩৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চার অধ্যায় প্রকাশ করে দিয়েছি। বিশ্বাস করিনে কর্ত্তারা ওটা বন্ধ করে দেবে— বন্ধ করবার ন্যায্য কারণ কিছুমাত্র নেই, তৎসত্ত্বেও যদি উপদ্রব করে তবে সেটা বোকামি হবে। বোকামির বিরুদ্ধে সতর্ক হবার দরকার বোধ করিনে। যাই হোক্ বইখানা যখন প্রকাশিত হোলোই তখন ওটা তর্জ্জমা করবার কোনো হেতু রইলনা। ⌐সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এরকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়, যদি তার সজীবতা না থাকে ⌐ এবারে আমারই পুরানো তর্জ্জমা ঘাঁটতে গিয়ে একথা বারবার মনে হয়েচে। তুমি বোধ হয় জানো বাছুর ম'রে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায়না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্ত্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্ত্তি তৈরি করা হয়, তারি গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে। তর্জ্জমা সেইরকম মরা বাছুরের মূর্ত্তি— তার আহ্বান নেই ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জন্মায়। সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক না হয়, তবে যার গরজ সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে। পরিচয়ের

অন্য কোনো পন্থা নেই। যথাপথে পরিচয়ের যদি বিলম্ব ঘটে তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যে দিন ও রাত্রির মতো পর্য্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের দশা ঘটে, মিলটনের পর ড্রাইডেন পোপের আবির্ভাব হয়। আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া ভাঙবার নাড়া। এইজন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীন রূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্ব্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল— তার মধ্যে ছিল সর্ব্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রতমনকে পথ নির্দ্দেশ করলে বিশ্বের দিকে। সহজেই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, কেবল বিজ্ঞান নয় সাহিত্যসম্পদও আপন উদ্ভবস্থানকে অতিক্রম করে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়; তার দাক্ষিণ্য যদি সীমাবদ্ধ হয় যদি তাতে আতিথ্যধর্ম্ম না থাকে তবে স্বদেশের লোকের পক্ষে সে যতই উপভোগ্য হোক না কেন সে দরিদ্র। আমরা নিশ্চিত জানি, যে,

যে-ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে দরিদ্র নয়, তার সম্পত্তি স্বাজাতিক লোহার সিন্ধুকে দলিলবদ্ধ হয়ে নেই।

একদা ফরাসী বিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাস-পরায়ণ। ধর্ম্মই হোক রাজশক্তিই হোক যা কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায় তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান, সেই বিশ্বকল্যাণ ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ, সে মুক্তদ্বার সাহিত্য, সকল দেশ সকল কালের মানুষের জন্য সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতি ও পরজাতির মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ। স্বার্থসাধনার বাহন যারা তাদেরই ঈর্ষা, তাদের ভেদনীতি অনেকদিন থেকেই য়ুরোপের অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে উঠছিল, সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ করে আগ্নেয়স্রাবে য়ুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেইজন্যে এই যুদ্ধের যে দান তা দানবের দান, তার বিষ কিছুতেই মরতে চায়না, তা শান্তি আনলেনা।

তারপর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আস্‌চে— প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগলের সংখ্যা

বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয় যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠ্‌চে তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখিনে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জান্‌তুম— অকস্মাৎ দেখ্‌তে পাই সমস্ত যাচ্চে বিপর্য্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠচে, হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা। এর মূলে আছে ভীরুতা, যে-ভীরুতা বিষয়বুদ্ধির। ভয়, পাছে ধনের প্রতিযোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্থভাণ্ডারে এমন ছিদ্র দেখা দেয় যার মধ্য দিয়ে ক্ষতির দুর্গ্রহ আপন প্রবেশপথ প্রশস্ত করতে পারে। এইজন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারা-ওয়ালাদের কাছে তারা আপন স্বাধীনতা আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন কী, স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্ব্বরতাকে শিরোধার্য্য করে নিয়েছে। বৈশ্যযুগের এই ভীরুতায় মানুষের আভিজাত্য নষ্ট করে দেয়, তার ইতরতার লক্ষণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

পণ্যহাটের তীর্থযাত্রী অর্থলুব্ধ য়ুরোপ এই যে আপন মনুষ্যত্বের খর্ব্বতা মাথা হেঁট করে স্বীকার করচে, আত্মরক্ষার উপায়রূপে নির্ম্মাণ করচে আপন কারাগার এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করচে না? ইংরেজি সাহিত্যে একদা আমরা বিদেশীরা যে নিঃসঙ্কোচ আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম আজ কি তা আর আছে? একথা বলা বাহুল্য

প্রত্যেক দেশের সাহিত্য মুখ্যভাবে আপন পাঠকদের জন্য, কিন্তু তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দূর নিকটের সকল অতিথিকেই আসন জোগাতে পারে। যে সাহিত্যে সেই আসন প্রসারিত সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য, সকল কালেরই মানুষ সেই সাহিত্যের স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে তোলে, তার প্রতিষ্ঠাভিত্তি সর্ব্বমানবের চিত্তক্ষেত্রে।

আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে। আমি যা বল্‌তে পারি তা আমারি ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলচি,— অথবা তাও নয়— একজন মাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলচি— আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার একথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই কথা বলতে হবে এই সাহিত্যের অন্য নানাগুণ থাক্‌তে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্ব্বভৌমতা, যাতে করে বিদেশ থেকে আমিও এ'কে অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের

যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করচি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্চে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই একটা ব্যতিক্রম যে নেই তা হতেই পারে না। মনে পড়চে রবার্ট ব্রিজেসের নাম। আরো আছে।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকর্তর নিকটবর্ত্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্ত্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্দ্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের

আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য্য যে প্রেম যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, কোনো আইনস্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারেনা, বল্‌তে পারেনা বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিস্টাইন। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বল্‌তে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজণীয়কে অপমানিত করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে তাহলে বল্‌তেই হবে এই মনোভাব চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধ।৮ সাহিত্য সর্ব্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ-নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহবেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করচে মানুষের সাহিত্য মানুষের শিল্পকলা। এইজন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা সর্ব্বমানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্ত্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন; যে-তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। যে-নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারিনে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগে হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল—

তাকে যেন সত্যই নূতন বলে ভ্রম না করি, সে আপন জরা

নিয়েই জন্মেছে, তার আয়ুঃস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে।✓

এতটা কথা তোমাকে কেন বল্‌লুম তা বলি। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত ইংরেজি কবিমণ্ডলীর প্রতি আমার আকর্ষণ যখন প্রবল ছিল তখন সেই প্রীতির টানেই তাদের কাছে যাবার চেষ্টা করেচি। সেই প্রীতির প্রতিদানও পেয়েছিলেম। তখন কালের মধ্যে নমনীয়তা ছিল। এখন তার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, এ যেন অনাবৃষ্টির যুগ। মরুতে যে গাছ ওঠে তার টেক্‌নিক্ কাঁটার টেক্‌নিক্— সে কেবলি বলে দূরে থাকো, যে যার আপন আপন চণ্ডীমণ্ডপে। এখন ঐ মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতে আমার সাহস হয়না— ওরা এমন-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যাতে ওদের আমরা বুঝিনে ওরাও আমাদের বুঝতে চায় না। আমার লেখাগুলোকে গুছিয়ে তুলতে তোমার যতটুকু উৎসাহ আমার তা নেই। ওখানকার মাটিতে আমাদের গাছ কিছুদিন তাজা থাকলেও তার পরে তার পাতা কুঁক্‌ড়ে মুক্‌ড়ে যায়। তাকে লুপ্ত হতে দেওয়াই তার প্রতি সদ্ব্যবহার। সেজন্যে ভয় তো নেই, এখানকার মাতৃভূমিতে হয়তো তার ফসল কোনোদিন নিঃশেষিত হবে না। অবশেষে একদা বিশ্বসাহিত্যে আমদানি রপ্তানিতে কৃত্রিম-মাশুলের পাহারা যাবে ঘুচে, তখন এপারের ফসল পৌঁছবে ওপারে।— আমার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে আমার অন্তরের অনুরাগ সবচেয়ে অক্ষুণ্ণ আছে Sturge Mooreএর প্রতি। তিনি জনতার ফরমাসে নব্যতার ভেক ধরেন নি, তাঁর মধ্যে

সাহিত্যের আভিজাত্য অম্লান। আর আমি জানি আধুনিকতার কঠোর ঘর্ষণে তাঁর সহৃদয়তায় কড়া পড়ে যায় নি। একবার কোনো অবকাশে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানিয়ো আমি তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করি তেমনি ভালোবাসি। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪
৭ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, প্রায় একমাস ধরে ঘুরেছি। এবারে বেরিয়েছিলুম পশ্চিম ভারতের অভিমুখে। গিয়েছি লাহোর পর্য্যন্ত। এই কারণে চিঠিপত্র অনেককাল বন্ধ। শান্তিনিকেতনে যখন আপনাদের ভাবে ও কাজে বেষ্টিত হয়ে থাকি, তখন সমগ্র ভারতের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক রূপটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই নে। এবারে মূর্ত্তিটা দেখা গেল। তুমি যে মহাদেশে আছ সেখানে মানুষের চিত্তসমুদ্রে সুরাসুরের মন্থন চলচে, আবর্ত্তিত হয়ে উঠ্‌চে বিষ এবং অমৃত প্রকাণ্ড পরিমাণে। সেখানে চিন্তা বলো, কর্ম্ম বলো, কল্পনার লীলা বলো সমস্তের মধ্যেই একটা বিরাট বেগের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নিরন্তর চলেচে— প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেখানে সমস্ত মানুষের উদ্বেলজীবনের আঘাত

প্রতিঘাত কেবলি কাজ করচে। সেখানে মানুষের সম্মিলিত শক্তি ব্যক্তিগত শক্তিকে অহরহ রাখ্‌চে জাগিয়ে। ভারতবর্ষের দিগন্ত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীরে, সেই বেড়ার মধ্যে যা হচ্চে তাই হচ্চে, তার বাইরের দিকে বেরোবার কোনো গতি নেই। যেখানে জীবনের ভূমিকা এত ছোটো সেখানে মানুষের কোনো চেষ্টা চিরন্তনের ক্ষেত্রে কোনো বৃহৎরূপ প্রকাশ করবে কিসের জোরে। ইতিহাসের যে পটে আমাদের ছবি উঠচে, সে ছিন্ন ছিন্ন পট, তার চিত্রের রেখা ক্ষীণ, বর্ণ অনুজ্জ্বল, তাতে প্রবল মনুষ্যত্বের স্পষ্টতা ব্যক্ত হবার পরিপ্রেক্ষণিকা পাওয়া যায় না। তাই আমাদের পলিটিক্স, সাহিত্য, কলাবিদ্যা সব কিছুরই মাপকাঠি ছোটো। এই নিয়ে মহাজাতির পরিচয় গড়ে তোলা অসম্ভব। এই পরিচয়ের অভাবে আমাদের আত্মসম্মানবোধের আদর্শ নীচে নেমে যায়।

সর্ব্বত্রই দেখা গেল White Paper নিয়ে আলোচনা চলচে। ছেলেবেলায় কাঙালীবিদায়ের যে দৃশ্য দেখেছি তাই মনে পড়ে গেল। ধনীর প্রাসাদ অভ্রভেদী, তার সদর ফাটক বন্ধ। বাহিরের আঙিনায় জীর্ণ চীরপরা ভিক্ষুকের ভীড়। কেউ পায় চার পয়সা, কেউ দু আনা, কেউ চার আনা। তক্‌মা-পরা দ্বারীদের সঙ্গে তাদের যে দাবীর সম্বন্ধ তা কেবল কণ্ঠের জোরে। এই জন্যে তারস্বরের চর্চ্চাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে যেটা লজ্জা, সে এই ভিক্ষুকদের নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি নিয়ে। যে ব্যক্তি দান করছে সুদূর ঊর্দ্ধে দোতলার বারান্দায় তাদের আত্মীয়-কুটুম্বের মজলিশ।

যত কম দিয়ে যত বেশি দেওয়ার ভড়ং করা যেতে পারে স্বভাবতই তাদের সেইদিকে দৃষ্টি। রাজদ্বারীদের একহাতে শিকি ছুয়ানির থলি, আরেক হাতে লাঠি ; সেটা পড়চে, যারা চোখ রাঙায় তাদের মাথার পরে।

দেখতে দেখতে হিন্দুমুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, এর মধ্যে ভাবীকালের যে সূচনা দেখা যাচ্চে তা রক্তপঙ্কিল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বলছিলেন, কী করা যায়। আমি বল্‌লুম, রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে। আজকাল পল্লীগঠনের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার ঐক্যবন্ধন সৃষ্ট হতে পারে। তিনি বল্‌লেন আগা খাঁ এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্চে। পাছে গান্ধিজির অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দূর করবার এই উপক্রম। বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্ম্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক্ করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক্ করে দিল— মিল্‌ব কোন্ শুভবুদ্ধিতে আপীল করে? না মিললে ভারতে স্বায়ত্ত শাসন হবে ফুটো কলসিতে জল ভরা।

ইংরেজ মানব ইতিহাসে হেয়তম যে পাপ করেছে সে হচ্চে চীনের মতো অত বড়ো দেশের কণ্ঠে জোর করে আফিম ঠেসে দিয়ে। নিজের উদরপূরণের জন্যে এত বড়ো নরহিংসা সভ্য-

বর্ব্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। অবশেষে নিজের স্বার্থকে চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশে ইংরেজ আজ হিন্দুমুসলমানের ভিতরকার প্রভেদকে যে প্রশস্ত করে দিলে এও উক্ত প্রকার বিষপ্রয়োগেরই অনুরূপ। কোনো এক সময়ে য়ুরোপে যখন প্রলয়কাণ্ড ঘটবে তখন ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশে দুই প্রতিবেশী জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই যে বিষবীজ সে রোপণ করে দিয়ে গেল কবে আমরা তাকে উৎপাটিত করতে পারব? একটা জাতির ভাবী ইতিহাসকে এমনতর কলুষিত করে দিলে; সভ্য য়ুরোপের সঙ্গে সম্পর্কের এই নিদারুণ পরিশিষ্ট ভারতবর্ষকে সুচিরকাল বহন করতে হবে। আজ আগা খাঁ এসেছেন সেই সর্ব্বনেশে সভ্যতার দূত হয়ে আমাদের মৃত্যুশেল নিয়ে। আমরা নিরস্ত্র আমরা নিঃসহায়, বিনাশের সঙ্গে লড়ব কী করে? পঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকর রূপে অসভ্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই— এখানে উভয়পক্ষের বিকৃতসম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে সব বীভৎস অত্যাচার ঘটচে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্চি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট করে দিলে।

ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি একটা কোনো আকস্মিক অভাবনীয় উপপ্লব না ঘটলে এই নাগপাশবন্ধন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না। ভারতবর্ষ যে ইংরেজের একান্ত লোভের সামগ্রী; তার বিষয়সম্পত্তির সামিল; এ'কে

না হলে তার অন্নবস্ত্রের কম্‌তি ঘটবে, রাষ্ট্রীয় প্রতাপের প্রথম শ্রেণী থেকে তাকে নিচে নাম্‌তেই হবে। এতবড়ো ত্যাগ-স্বীকার করতে তাকে যে বলব সে কিসের দোহাই দিয়ে? সভ্যতার দোহাই? কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্ত্তমান সে সভ্যতা মানুষখাদক। তার একদল victim চাই-ই যারা তার খাদ্য, যারা তার বাহন। তার ঐশ্বর্য্য, তার আরাম, এমন কি তার কাল্‌চার উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের উপর চড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে আজ শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। লোভ প্রবৃত্তিটা সর্ব্বব্যাপী হতে পারে কিন্তু লোভের ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের অধিকারীকে স্বল্পপরিমিত হতেই হবে। যে কোনো কারণবশতই হোক যার জোর আছে সে সেই ক্ষেত্রকে নিজে অধিকার ক'রে অন্যের উপর প্রভুত্ব করে। এমন অবস্থায় জোরের সঙ্গে জোরের সমানে সমানে লড়াই চলে, কিন্তু সেখানে ডিপ্লমাসির চাল চেলে নানা আকারের রফানিষ্পত্তি হতে থাকে। কিন্তু যেখানে একপক্ষের জোর আছে অন্যপক্ষের জোর নেই সেখানে নির্ব্বল পক্ষ আপনার প্রাণ দিয়ে অপরকে পোষণ করবার কাজে লাগে। যতক্ষণ লোভ রিপু এই বর্ত্তমান সভ্যতার ও স্বাজাত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে কাজ করে ততক্ষণ এর থেকে বলহীনের নিষ্কৃতি নেই; কেননা, যে দুর্ব্বল এই সভ্যতা তারই প্যারাসাইট। অতএব প্রবলের হাত থেকে যখন দানপত্র আসবে তখন তা অত্যন্তই White

paper হয়ে আস্‌বে, তাতে রক্তের লেশ থাক্‌বে না; সেই পাতে যে উচ্ছিষ্ট আমাদের ভোগে পড়বে সেটা হবে কাঁটা-চচ্চড়ি, তাতে মাছের গন্ধ থাকবে মাত্র খাদ্যবস্তু অতি অল্পই থাকবে। লোভী মনিবের পাত থেকে সেই মোটা মাছের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করব কিসের জোরে? কেবলমাত্র পেটভরার চেয়ে বেশি জোগান তার যদি না থাকে তবে সেটাতে তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেবে না; তার যে সভ্যতা প্রাচুর্য্য-অভিমানী তারও দাবী তো মেটাতে হবে। কী দিয়ে? যে দুর্ব্বল তারই ক্ষুধার অন্ন দিয়ে। এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত কতবড়ো চিরদুর্ভিক্ষের আসন পেতে আছে তা কি জানো না? এর অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অনটনও যখন ওদের ভাগ্যে দৈবাৎ ঘটে তখন ওরা কী রকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাও তো আমরা দেখেছি।

এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? শুধু তাদের প্রাণ-রক্ষার জন্যে নয়, তাদের মানরক্ষার জন্যে, তাদের অতিরিক্তের তহবিলকে স্ফীত রাখবার জন্যে! এই যদি অপরিহার্য্য হয় তবে লর্ড চার্চ্চহিলের জবাব দেব কী? এই সমস্যা তো সবলের সামনে নেই। তাদের সমস্যা বলের সঙ্গে বলের প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই প্রতিযোগিতা আজকাল সাংঘাতিক হয়ে উঠেচে। সম্প্রতি এর প্রকাণ্ড আঘাতে ওদের দেহগ্রন্থি শিথিল হয়ে আছে, আরো আঘাতের আশঙ্কা চারদিকেই উদ্যত। এমন অবস্থায়

যারা বুদ্ধিমান তারা দুর্ব্বলের সহায়তাকেও উপেক্ষা করে না। বিগত যুদ্ধে সেই সহায়তা পেয়ে লর্ড চর্চ্চহিল্‌ও কৃতজ্ঞের বদান্যতায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আর কখনো যে সেই সহায়তার প্রয়োজন হবেনা তা বলা যায় না। কিন্তু কৃতজ্ঞতার স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী, তার উপরে ভর দিয়ে আমাদের আবেদনের ভিত্তি পাকা করবার ব্যর্থ চেষ্টা দুর্ব্বলের পক্ষে বিড়ম্বনা।

যখন সামনে এতবড়ো দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি তখনি বুঝতে পারি যে এই দুর্ব্বলের প্রতি নির্ম্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুক্‌রো নিয়ে আমরা বাঁচব না। সভ্যতার বণিক্‌বৃত্তি যতদিন না ঘুচবে ততদিন ভারতবর্ষকে ইংরেজ মহাজনের পণ্যদ্রব্য হয়ে থাকতেই হবে, কোনোমতেই তার অন্যথা হতে পারবে না। একপক্ষে লোভ যে রাষ্ট্রব্যবস্থার সারথি সেখানে অপরপক্ষে দুর্ব্বলকে বল্গাবদ্ধ বাহনদশা যাপন করতেই হবে। অবস্থাবিশেষে কখনো দানা বেশি জুট্‌বে কখনো কম। অসহিষ্ণু হয়ে যে-জীব হ্রেষাধ্বনি করবে পা-ছোঁড়াছুঁড়ি করবে তার স্পর্দ্ধা টিঁকবে না।

সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্ত্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখরাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্ব্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত

হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব— এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। আর আজ য়ুরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা, ঐশ্বর্য্যভোগের বিষবাষ্প তার তলায় তলায় জমে উঠেছে। সে কি নিরাপদ প্রতাপের কোনো মন্ত্রের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে তার লোহার ক্যাশবাক্সের মধ্যে? অনেক বড়ো বড়ো জাত লুপ্ত হয়েছে, অনেক উদ্দামগতি ইতিহাস হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে স্তব্ধ হয়েছে, আর আমরাই যে White Paperএর ক্ষুদকুঁড়ো খুঁটে খুঁটে খেয়ে চিরকাল টিঁকে থাকব এমন আশা করি নে— মরণদশার অনেক লক্ষণ তো দেখতে পাই। কিন্তু সর্ব্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ কথা মনে আপনি আসে যে, নব্যরাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহু কালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ঘুরে অবশেষে ফিরে এলাম আপন কুলায়ের কোণে। ভারতে দেখলুম আলোহীন,

মাহাত্ম্যহীন ধূলিনত জীবনের রঙ্গভূমি, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লুম আমাদের য়ুরোপের প্রভু সেই আমাদের ভাবীকালের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। অল্পকিছু সম্বল নিয়ে অভুক্তপ্রাণের ছোটোখাটো প্রয়োজন, জীর্ণ আসবাব, উপস্থিত মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র দাবীর উপর বহুকোটি মানুষ প্রতিদিনের মাথা গোঁজবার পাতার কুঁড়ে বাঁধচে, তাতে বৃষ্টির জল রৌদ্রের তাপ নিবারণ হয় না। ধনী পথিক কটাক্ষে চেয়ে চলে যায় আর ভাবে এই এদের যথেষ্ট, কেননা ওরা আমাদের থেকে অনেক তফাৎ— আমরাও ভাবি এই আমাদের বিধিলিপি। বুঝতে পারি ওরা যে-গ্রহের আমরা সে গ্রহের নই। যখন এ কথাটা সম্পূর্ণ বুঝি তখন সমুদ্রের ওপারের খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই চলে যায়। এও মন বলে, ওদের ভাষা, ওদের প্রকাশের পদ্ধতি, ওদের ভালোমন্দর বোধসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টায় শুধু ব্যর্থতা নয়, অমর্য্যাদাও আছে। যেখানে আমার আপন অধিকার নিঃসংশয় সেইখানে ওদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।— সম্প্রতি আমার তর্জ্জমা-গুলো পড়ে কথাটা মনে আরো সুস্পষ্ট হোলো। এ তো আমার লেখা নয়। নিজের এ পরিচয় কেনই বা দিতে যাওয়া— এ তো নিজেকে ব্যঙ্গ করা। যত পারো কবিতাগুলো ছেঁটে ছুঁটে বাদ দিতে দিয়ো।— একবার গলদ করেছি বলেই তার সংশোধনের অধিকার আমার নেই এ কথা মানতে পারি নে।

আপন পরিচয়ের জন্যে তাগিদই বা কিসের? যখন

ভাবি অজন্তার গুহাচিত্রগুলির কথা, তখন নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ মনের মধ্যে উপলব্ধি করি। ওরা কা'রা, একদিন অন্ধকারে বসে যারা দিনের পর দিন বিচিত্র সৃষ্টির আনন্দকে গুহাপ্রাচীরে চিত্রিত করেছিল? তারা তো এই সৃষ্টির সাফল্যেই আপন প্রয়াসের মূল্য হাতে হাতেই পেয়েছিল। তাদের যে-আত্মা সত্য সেই পেয়েছে আনন্দ, তাদের যে নাম মায়া খ্যাতির মজুরী তার জন্যে ওরা দাবী করে নি? অনাগত কালের সম্মুখে ঐ নামটাকে চাঁদার ঝুলির মতো পেতে রাখতে চাই কেন? এই দানের লোভের মতো এতবড়ো বিড়ম্বনা আর কী হতে পারে? আজ সকালে আকাশে আতপ্ত বসন্তের আভাস এসেছে, আমার সামনে ঘাসের মধ্যেকার অনামা ফুলগুলোর উপর লাল ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্চে; এই সদ্য মুহূর্ত্তের প্রাণনের আনন্দে আমার মনটা ফাল্গুনের তরুণ আলোকে ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছের হিল্লোলিত পাতার মতো ঝলমল করচে। জীবনের অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্চি যা পাওয়ার জিনিষ, এর চেয়ে আরো লোভ কেন? যখন কিছু লিখেচি সেও তো আপনার মধ্যে এই রকম পাতার হিল্লোল, হাওয়ার চাঞ্চল্য, রৌদ্রের ঝলক, প্রকাশের হর্ষবেদনা। সে তো বিনা-নামের অতিথি, গর্‌ঠিকানার পথিক। তাকে নামের ঠেলা-গাড়িতে চাপিয়ে হাটে হাটে ফিরিয়ে বেড়াবার কী দরকার! নামটা মায়া বলেই নাম নিয়ে যত ঈর্ষা বিদ্বেষ, বিবাদ বিরোধ। একদিন আমার লক্ষ্যের অতীত অজানা লোকালয়ের রাজপথে

লক্ষ লক্ষ নামে নামে ঠেলাঠেলি হতে থাকবে, তারি মাঝখানে আমারো বেদনাহীন চেতনাহীন শব্দমাত্রসার নামটা চলবার জায়গা পেতে পারবে এই কল্পনার মরীচিকা নিয়ে আজ আমার মনে কোনো উৎসাহ হচ্চে না। জীবযাত্রার সমস্ত উদ্যোগ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার এল, আজ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ঠেকে বিশ্বসত্তার স্পর্শে আমার চৈতন্যের তন্ত্রীতে এই যে ঝঙ্কার উঠ্‌চে— আমার পক্ষে এই তো চরম। তারো পরে একটা নাম থাক্‌বে কি না থাকবে তাতে কী আসে যায়!

চার অধ্যায় অনুবাদের কপি পাঠিয়ো না, হয়তো পথেই মারা যাবে। তোমার তর্জ্জমা পুনঃসংস্কার করবার মতো মেজাজ আমার নেই— ঐখানেই ছাপিয়ে দিয়ো। যদি ছাপানো দরকার না বোধ করো তাহলে ছাপিয়ো না।—

দোল পূর্ণিমা আসচে, বসন্ত উৎসবের আয়োজন করচি। এইই আমার কাজ। ইতি ৭।৩।৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিঠি পাবে কি না সন্দেহ। নাইবা পেলে, আমি লেখবার দরকার বোধ করেছিলুম লিখেচি। বাস্‌।

৭৫
২৮ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল হোলো তোমাকে একটা মস্ত চিঠি লিখেছি। সম্ভবত সেটা তোমার হাতে পৌঁছয় নি। এরকম চিঠিপত্রের অনিশ্চয়তা ঘটলে লিখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কাজের কথা থাকলে চুপ করে থাকা চলে না। সুবিধে এই রথীরা য়ুরোপে যাত্রা করে বেরিয়েছেন, তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় কথাবার্ত্তা হতে পারবে।

আমার নতুন এডিশন সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ পরামর্শ যদি পেতে চাও সে ঘটবে না। আর যে আমি কখনো য়ুরোপে যাব সে সম্ভাবনা নেই। চলাফেরার বয়স পেরিয়ে গেছি। তা ছাড়া নিজের খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা ক্রমশই কমে আসচে। এই কথাই কেবলি মনে হয় যে যদি সাহিত্যে কোনো স্থায়িত্বযোগ্য কীর্ত্তি করে থাকি তবে তার স্থায়ী হবার দামটাকেই বড়ো করে দাবী করা মূঢ়তা। কিছু করতে পেরেছি এইজন্যেই আমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ। দামের জন্যে পরের কাছে হাত পাতলেই বাজারে তার হিসাব নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়। দামটা শেষপর্য্যন্ত পাবেই বা কে? আমার ব্রহ্মদত্যি? অর্থাৎ যার না আছে ক্ষুধা, না আছে রসনা, না আছে পাকযন্ত্র, খেয়ে নিতেও যে পারে না, বেঁধে নিতেও যে জানে না। আমি জানি কালের পরিবর্ত্তন হবে,

রুচির গতিও বাঁক ফেরাতে ফেরাতে চলবে। সেই পরিবর্তনের থানায় থানায় নতুন নতুন কবি আড্ডা করবে, যুগে যুগে নব নব পরিতৃপ্তির রসদ জোগাবে তারাই। জানি এমন সব কবি আছেন গুণী আছেন যাঁরা সকল কালের ভাণ্ডার ভরে দিয়ে গেছেন— সেটা আপনিই ঘটেচে—না ঘটলেও তার লোকসান তাঁদের কাছে পৌঁছত না। মৃত্যুর যতই কাছে আসচি ততই ভাবীকালের কাছে হাত বাড়াবার আগ্রহ চলে যাচ্চে। ভাবীকাল আপনার পাওনার হিসাব আপনিই করে; যা রক্ষণীয় তাকে বর্জ্জন করেছে নিশ্চয়ই এমন হয়েছে ভূরি ভূরি। তা নিয়ে জগতের কোথাও কি কোনো শোক আছে? ঐ যে মহেঞ্জদারো ধ্বংসাবশেষ অতীত মানবমহিমার সাক্ষ্য নির্ম্মমভাবে মরুবালুর তলায় চাপা দিয়ে রেখেছিল। তাদের কবিরা সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কি বাণীরূপ দেয় নি? আর কোনোদিন তার গুঞ্জনমাত্রও শোনা যাবে না। কার বুকে বেজেছে সেই ক্ষতি? কত শতাব্দী গেল তার উপর দিয়ে— চাষীরা চাষ করচে, মাঝিরা নৌকো বাইচে, রাজার রাজত্ব ভাঙচে গড়চে, সমস্তই চলেছে মহাবিস্মৃতির অভিমুখে। পৃথিবীতে দিনের পর দিন সূর্য্য উঠবে সূর্য্য অস্ত যাবে, অসংখ্য যারা জাগবে আর যারা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাবে তাদের মধ্যে এই একটিমাত্র আমি কোথাও থাক্‌বো না। সেই অন্তহীন জীবনপ্রবাহের মধ্যে আমার আজকের দিনের কয়েকটা কথা হয়তো কিছুকালের জন্যে ফেনার মতো ভেসে চলবে। সেদিনকার সেই বেদনাশূন্য চলার অনিশ্চিত কল্পনা নিয়ে কেন আমি ভেবে মরব, সম-

সাময়িকের হাটের খাঁচার মধ্যে পরস্পরের খোঁচাখুঁচি জাগিয়ে তুলব? অতএব যাক্‌গে। আমার দরজার সামনেই সজনে গাছের পাতা ঝরে গেল, আবার কচি পাতা ওঠবার রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে। প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া এখন চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে; মধ্যাহ্নের তপ্তহাওয়ায় গাছে গাছে দোলাদুলি লেগেছে; উড়তি ধূলোয় আকাশের নীলিমাতে ধূসরের আভাস দিয়েছে— চারদিকে নানা পাখীর কলকাকলী। এরা সবাই মিলে আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল জাগিয়ে চলেছে— এদেরি মধ্যে মনটাকে ছড়িয়ে দিই না কেন, এই নিরন্তর বহমান অনিত্যের স্রোতে সাঁতার কেটে যাই না কেন? আর ক'দিনই বা বাঁচব? একে আমরা বলি মায়া, কিন্তু এই তো বাস্তব, খ্যাতিই তো মায়া, সেই তো প্রেতের অন্ন। বর্ত্তমান অন্নপূর্ণার প্রাঙ্গণে আমি রবাহূত, আমার জন্যে পাত পাড়া রয়েছে, নানা রসের আয়োজন, ভোজ শেষ করে দিয়ে যাই, সন্ধে হয়ে এল।

বইগুলো পেয়েছ— তাতে আমার উচ্ছেদ চিহ্ন দেখেছ। কিন্তু মনে কোরো না তাতেই আছে আমার চরম বিচার। স্পষ্ট অনুভব করেছি বিস্তর আবর্জ্জনা আছে। আমার কোনো মমতা নেই, বরঞ্চ লজ্জাই আছে। সম্মার্জ্জনার জন্যে আমার পরামর্শ বাহুল্য। যে কোনো আমার ইংরেজ কবিবন্ধু যেরকম করেই ওগুলো নিয়ে বর্জ্জন মার্জ্জন করুন আমার তাতে লেশ-মাত্র আপত্তি ঘটবে না। তুমি তাদের সম্মতি নিয়ে যা দাঁড় করাবে তাতেই আমি স্বাক্ষর দেব। এ কথা আমি নিশ্চিত জানি ওর মধ্যে থেকে বিস্তর ত্যাগ করা উচিত।

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা Asiaতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা রথী ঠিক করবেন। ঐ কাগজের খাতিরে ইংলণ্ডে ছাপা বন্ধ রাখা চলবে না। মূল্যও ওরা সামান্যই দেবে, দুশো ডলার। ওদের আগ্রহ অনুসারে আমাদের চলবার দরকার নেই। তোমার পাব্লিশরের মত নিয়ে কাজ কোরো। রথীদের পরামর্শেই চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা এখানে পাঠাতে cable করেছিলেম। কোনই প্রয়োজন ছিল না, কেননা নিশ্চিত জানি আমি কোনো বদলই করব না। এতে কেবল সময় নষ্ট হবে। এখনো বলচি আমার অপেক্ষা না রেখে তুমি ছাপতে দিয়ো। বস্তুত তোমার এই ম্যানস্‌ক্রিপ্ট আমার হাতে পৌঁছবে কিনা তাও জানিনে, যদি পৌঁছয় বহু দেরি হবে। কবে পাঠানো হোলো আমাকে জানিয়ো।

তোমার অনুরোধমতো design আঁকতে বসেছি। শাদা কালো করি নি— রং দিয়েছি, তাতে ক্ষতি নেই— রং বাদ দিলে আপনিই ওগুলো হবে শাদা কালো। রঙের জন্যে আমার হাত নিশপিস্‌ করে।...

জাপানে দলবলসমেত আমাদের যাবার একটা আমন্ত্রণ শীঘ্রই পাব বলে অনুমান করচি। লোভের কারণ আছে বলেই হয় তো যেতে হবে নতুবা যাবার আর কোনো তাগিদ দেহে মনে নেই। ইতি ২৮।৩।৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

১২ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মেল পাবার দুই একদিন পরে তোমার তর্জ্জমা এসে পৌঁছল। পড়বার সময় পাই নি— অনেকগুলি ছোটবড়ো কাজে জড়িয়ে আছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্চে একটা নতুন কবিতার বই ছাপানো। এই জাতের কাজে হাত দিলেই নিজের জাতটা নিজের কাছে ধরা পড়ে। আমি কবি, এইটেই হোলো আমার প্রথম এবং শেষ কথা— আর যে সব আমার কাঁধে ভর করেছে সেগুলো বাহ্য। বটগাছে বাঁদর লাফায়, পাখী বাসা বাঁধে, কিন্তু বটগাছটা তাদের বাদ দিয়েই। আমি গল্প লিখে থাকি— তার সদ্য প্রমাণ চার অধ্যায়। কিন্তু যখন কবিতা নিয়ে পড়ি তখন মনে হয় ওগুলো পরগাছা, শিকড় নেই অন্তরে। সন্দেহ হয় ওদের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে। ওদের হাঁক-ডাক বেশি, কিন্তু সাঁচ্চাই? চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটা পায় সেটা ঠিক খাঁটি গদ্যের বাহন নয়। অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা— নবেলের নির্জ্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয় তো দেরি হবে। যোগাযোগটা ওর চেয়ে গদ্যের এলাকায় টেঁকসই হবার কথা —যদিও তার মধ্যে কবির কলম শিল্পকাজ চালায় নি তা

বলতে পারিনে। কেননা কবি যদি ত্রিসীমানায় থাকে তাকে চাপা দেওয়া অসম্ভব। তোমার সাহিত্যিক বন্ধুরা নিশ্চয় তর্জ্জমাটা দেখেচেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যের তরফ থেকে তাঁরা কী বিচার করেন জানতে ইচ্ছে করি। সাহিত্যের বাইরেও এর মধ্যে তাঁদের ঔৎসুক্যের কারণ আছে— সে হচ্চে আধুনিক বাংলায় বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্বের একটুক্‌রো ছবি। এ ঔৎসুক্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। অন্তত কবির তরফে এটাতে আমার নিজের কোনো দরদ নেই— আমার দরদ হচ্চে এলা অন্তর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। যে ভাষায় তার বেদনা ফুটে উঠেছে সে ভাষা কোনোমতেই রূপান্তরিত করা যায় না। সুতরাং বাঙালী পাঠক এর থেকে যা পাবে ইংরেজি পাঠক কোনোমতেই তা পেতে পারে না। এমন ফল আছে রস বাদ দিয়েও যার শাঁস থাকে, তা নিয়ে ব্যবসা চালানো যায়— কিন্তু আমের রস যে পেল না আঁঠি নিয়ে সে কী বিচার করবে আন্দাজ করা শক্ত নয়। এই সব কথা যখন চিন্তা করি তখন মনে সংশয় হয়। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ এই ওখানকার সমজদারদের মত নিয়ে যদি বোঝো এটা কেবলমাত্র চলনসইয়ের চেয়ে বেশি নয়, অথবা তার চেয়েও কম তাহলে ছাপতে দিয়ো না। এ ক্ষেত্রে পাব্লিশরদের মতের দাম অর্থের দাম দিয়ে। তারা জানে এটা যাকে বলে সেন্সেশনাল, একদফা বিক্রি হবে— লোকে দুইপক্ষ থেকে গোলমাল করবে, মুনফার দিক থেকে এর সার্থকতা আছে। কিন্তু সেই বিচারটা অশ্রদ্ধেয়। যা হোক্, ওখান থেকে তুমি খাঁটি ওজন পেতে

পারবে। প্রথম যখন ইংরেজিতে তর্জ্জমার কথা উঠেছিল তখন সংশয় ছিল বাংলায় ওটা চলতে দেবে কিনা। সে সম্বন্ধে আশঙ্কা নেই। বস্তুত আপত্তি উঠ্‌চে দেশের লোকের পক্ষ থেকেই।

টমসনকে যে চিঠি লিখেচি তার নকল তোমাকে পাঠাই। আমি সরেজমিনে হাজির হয়ে তোমাদের আলোচনায় যোগ দিতে পারব সে আশা কোরো না। আমার দৈহিক মানসিক ও আর্থিক অবস্থা সমস্তই এর প্রতিকূলে। যদি রথীর সঙ্গে যেতুম তাহলে খরচ কিছু বাঁচত কিন্তু দেহটার আপত্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি নে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অভ্যাসগুলি ক্রমশই পাকা হয়ে উঠতে থাকে। তখন বিশল্যকরণীর উদ্দেশে গন্ধমাদন সুদ্ধ উৎপাটন করা এ যুগে আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। এখন জীবনটা নিশ্চলতার দিকেই ঝুঁকেছে— মনটা তারি মধ্যে যেটুকু লাফা-লাফি করে তার বেশি আর আশা করা যায় না।

Collected Editionএ ছেঁটে ফেলার কাজে একটুও মমতা দেখিয়োনা। তোমাদের কার্ট্ ব্লাঁশ অধিকার দিচ্চি। আমি যা দাগ দিয়েছি তাতেও আমার মন তৃপ্তি পায় নি। লাগাও কোপ। পরিবর্ত্তন যদি উপযুক্ত লোকের হাতে হয় কিসের আপত্তি? তুমিই আমাকে represent করতে পারবে। তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় Sturge Mooreএর মত কবি যদি মাজাঘষা করেন আমি স্বয়ং থেকে তার বেশি কিছুই করতে পারি নে। তাঁকে অবশ্য পারিশ্রমিক দিতে হবে। এবং

বইটার মলাটে লিখে দেওয়া চলবে Edited by Sturge Moore— অবশ্য যদি তোমাদের মত থাকে।

কাল বর্ষশেষ— পর্শু নববর্ষ। আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি ২৯ চৈত্র ১৩৪১

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

১৪ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ পয়লা বৈশাখ। আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আজকের [দিনে] তোমাদের সকলকেই আশ্রমে একত্রে পেতে ইচ্ছে করে। এবারে রথী বৌমা চলে গিয়ে অত্যন্ত ফাঁকা ঠেকচে।

বিলেতের কাগজগুলো আজকাল সময় পেলে পড়ি। একটা জিনিষ তিনচার বার লক্ষ্য করেছি। দেখেছি এমন কি ভদ্র কাগজেও "বাবু"দের উপরে তীব্র অবজ্ঞার কটাক্ষপাত চলিত হয়ে উঠচে। বুঝতে পারচি, বাংলাদেশের হাতে ওরা যে আঘাত পেয়েছে সে ওরা ভুলতে পারচে না। এটা হয়তো ওরা জানেই না ঢাকা প্রভৃতি সহরে যে কাণ্ড ঘটেছিল সেটা বাঙালী যুবকদের স্মৃতিতে কী রকম বিঁধে আছে। যাই হোক বাঙালীদের প্রতি ওদের বিদ্বেষ এত তীব্র বলেই Gilbert Murrayকে আমি যে অমন চিঠি লিখেছি তার মধ্যে থেকেও

ওরা খুঁৎ বের করেছে। আজই Time & Tide কাগজে Wyndham Lewis লেখায় "বাবু"র উপরে বিশ্রী খোঁচা। তাই আমার আশঙ্কা হচ্চে আমার চার অধ্যায় বইখানাকে ওরা সেই বিদ্রূপ ও বিদ্বেষের খোরাক করবে। ওটার থেকে বাছাই করে ওরা নিজের মনের মতো বচন তুলে ব্যবহারে লাগাবে। সেটা প্রথমত আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর হবে, দ্বিতীয়ত তাতে আমার দেশের লোক আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হবে। বর্ত্তমান সঙ্কটের সময় এ সব কথা ভালো করে বিচার করা দরকার। আমি এখনো তোমার তর্জ্জমা পড়বার সময় পাই নি— কদিন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েচে। কিন্তু কথাটা তুমি বিশেষ করে ভেবে দেখো। রথীর সঙ্গেও পরামর্শ কোরো। রথীর সঙ্গে এতদিনে হয়তো দেখা হয়ে থাকবে।···
ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮

৪ মে ১৯৩৫

কল্যাণীয়েষু

"শেষ সপ্তক" বলে নতুন কবিতার বই আমার জন্মদিনে বেরবে। প্রতিদিন একটা দুটো করে লিখে চলেছি তাই নিয়ে মন হয়ে আছে গুঞ্জরিত। চার অধ্যায় দেখবার সময়ই

পাই নি। আজ কবিতার পালা শেষ করলুম। আজ একবার তর্জ্জমাটা নিয়ে পড়ব।

ইংরেজি কবিতার সঞ্চয়িকার প্রস্তাবটা ভালো। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজটা সম্পন্ন কোরো— ভালোই হবে। এর পরে আমার রচনার পুনঃসংস্কার সহজ হবে। যখন বাছাই চলবে তখন কিছু কিছু শোধনও যদি চলে দোষ কি।

রথীর সঙ্গে দেখা এতদিনে নিশ্চয় হয়েছে। তাদের কোনো খবরই পাই নি। আন্দ্রের চিঠি থেকে জানলুম তারা গেছে হাঙ্গেরিতে তাও নিশ্চিত তথ্য বলে জানা গেল না। মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার কথা। মে মাস ত পড়েচে।

আমার জন্মোৎসব নিয়ে গোলমাল চলচে। একটা মাটির বাসা ফেঁদেচি সেইদিন গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান হবে। ঘরটা দেখবার যোগ্য হয়েচে।

আজই air mail দিন— বেলা দুপুরের মধ্যে। তাই তাড়াতাড়ি সারলুম। ইতি ২১ বৈশাখ ১৩৪২

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯

২৬ জুন ১৯৩৫

চন্দননগর

কল্যাণীয়েষু

এতদিনে চার অধ্যায়ের কৃত তর্জ্জমা আমাদের শেষ হল। তুমি ইংরেজি পাঠকের দিকে তাকিয়ে অনেকটা বদল সদল

করেছ— তাতে বাঙালী পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয়— এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির আশঙ্কা আছে। ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের ওখানকার উপদেষ্টারা যদি আধুনিকতার প্রলেপ দিয়ে দেন সে ভালোই, কিন্তু ভাব বদলানো সঙ্গত হবে বলে মনে করি নে। বাংলা বইটা নিয়ে যদিও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যাচ্চে তবু লোকের বিশেষ ভালোও লেগেছে সন্দেহ নেই। এক সংস্করণ শেষ হ'য়ে গেছে। শেষ সপ্তকটা সমঝদাররা ভালোই বলছে। আজ কালিদাস নাগের চিঠিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া গেছে। এর পরে একটি ছোট্ট পদ্য কাব্যের বই ছাপা শুরু করেছি। লোকে না মনে করে প্রাচীনের কলমে ছন্দ ক্ষরতে চাচ্চে না। এ বইটার নাম হবে ছায়াছবি। গোটা ৩৫শের বেশি কবিতা দেব না। ভূরিভোজন কবিতার পক্ষে বর্জ্জনীয়, শরীরের পক্ষেও ভালো নয়, এ কথা তোমার দৃষ্টান্তের দ্বারা তুমি প্রচার করতে থাকো।

রথীরা আর দিন ১০।১২র মধ্যে দেশে পৌঁছবে। তখন তোমাদের সব খবর পাওয়া যাবে। এণ্ড্রুজ সিমলায় নির্জ্জনে বসে কি একটা লেখায় মগ্ন। আমরা আশ্রমে ফিরলে তিনি বোধ হয় আসবেন। কবিতার সঞ্চয়নকার্য্য কি কিছু এগিয়েছে? ওটা সম্বন্ধে সেখানকার পাঁচজনের মতই গ্রাহ্য। ইতি ২৬ জুন ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০

১১ জুলাই ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা রওনা হয়ে গেছে। এতদিনে পেয়ে থাকবে। ওটা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে করা। অপ্রিয় কথা হয়তো থাকতে পারে। সেজন্যে ও বইটা যদি ওখানকার পাঠকদের পথ্য না হয় তাহলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বইটা বন্ধ করে দিয়ো। মূল বাংলাটা যখন বেরিয়েছে তখন তর্জ্জমা না বেরলেও ক্ষতি নেই। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতির জন্যে রুচি চলে গেছে। যে বইগুলো পূর্ব্বেই বেরিয়ে গেছে সেইগুলোকে ছেঁটেছুঁটে যথাসম্ভব চলনসই করলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। বস্তুত আমার দায়িত্ব বাংলা লেখাগুলো নিয়ে। মনে বিশ্বাস আছে ওর অন্তত অনেকটা অংশ টেঁকসই হয়েছে। যারা বাংলা ভাষার সাধনা করবে এ তাদের জন্যেই রইল। আমার দেশেও চার অধ্যায়ের প্রতি অনেক পাঠক প্রসন্ন নয়। দেখতে পাচ্চি সাহিত্যের সঙ্গে চাটুবাক্য না মেশালে রসসম্ভোগে বাধা হয়। এই চাটুভাষণ বর্ত্তমান কালের উদ্দেশে। ভাবীকালে তার প্রয়োজন চলে গেলে সাহিত্যের বিচার বিশুদ্ধ হতে পারবে।

সেদিন Ernest Rhysএর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি। ভালো লাগল। গীতাঞ্জলির সত্যযুগে ওঁর সঙ্গে আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওঁর স্ত্রী খুব সহৃদয় এবং রসজ্ঞ

স্ত্রীলোক ছিলেন। গোল্ডর্স্ গ্রীনে ওঁদের বাড়ি ছিল, পিছনের ছোটো আঙিনায় ছিল গোলাপের ক্ষেত— কতদিন অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদে সেখানে ছায়ায় বসে চা খেয়েছি গল্প করেছি। ড্রয়িংরুমের কোণে একটি কেদারা ছিল, সেইটেতে আমারি যেন বিশেষ স্বত্ব জন্মে গিয়েছিল। রিজ্ খুব কাজে ব্যস্ত লোক, অথচ যখনি আমার কোনো প্রয়োজন হোত ওঁকে ডেকে পাঠালেই কাজ কামাই করে গোল্ডর্স্ গ্রীন থেকে কেন্সিঙটনে এসে উপস্থিত হতেন— ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁকে নিয়ে কাটিয়েছি। ওঁদের দুজনের মধ্যে যথার্থ একটি কবিত্বের রস ছিল। আমার কোনো লেখা নিয়ে যখন ওঁর পরামর্শ নিতুম শব্দের বাছাই নিয়ে অত্যন্ত খুঁটিনাটি করতেন— আমার অনেক শিক্ষা হয়েছিল। আমার কাব্যসঞ্চয়নের কথা ওঁকে লিখেছি। আমার বিশ্বাস তুমি যদি ওঁর পরামর্শ নাও তবে উনি যথেষ্ট যত্ন করে বিচার করবেন। যাই হোক চয়ন সম্বন্ধে ইদানীং তোমার কাছ থেকে কোনো খবর পাইনি। যদি এমন হয় তুমি নিতান্ত ব্যস্ত থাকো সময় না পাও তাহলে রীজের মত লোকের উপর ভার দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

রথী বৌমা কাল ফিরে এসেছেন— শরীরও দেখলুম ভালো, মনটাও আশান্বিত। ওখানে বন্ধুমণ্ডলীতে তোমার প্রতিষ্ঠা দেখে ওঁরা খুব খুসি হয়েছেন। যে দেশে গেছ সে দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পারলে নিজের দেশেরই প্রতি অন্যায় করা হয়। আমাদের নব্যযুবকেরা অনেকে তার উল্টো পথে চলেন। ওদের প্রতি অপ্রিয়তা ও অসৌজন্যকে তারা পৌরুষ

বলে মনে করে। এ কথা ভুলে যায় পরুষ ব্যবহার ইংরেজ যদি সহ্য করে সেটাতে আমাদের বাহাদুরি নেই, সে ওদেরি ঔদার্য্য। যেখানে শাস্তির আশঙ্কা নেই সেখানে দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকেরা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে আনন্দ পায়। এ কথা আমি বারবার স্বীকার করি যে, বুদ্ধিতে এবং চরিত্রে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক উপরে। ওরা মাঝে মাঝে যতই অন্যায় অবিচার ও ভুল করুক ওদের চিত্তবৃত্তিতে যে শ্রেয়োবুদ্ধির বেদনা আছে সে আমাদের নেই। যতই আমার বয়স হচ্চে ততই স্বজাতির জন্যে আমার লজ্জা ও নৈরাশ্য বেড়ে উঠচে। ইংরেজিতে যাকে malice বলে সেটা এদের স্বভাবে অহৈতুক।... যে মানুষ কোনো কিছুতে কৃতকার্য্য হয়েছে তার মাথা হেঁট করতে এদের কী অসীম আনন্দ। ইতি ১১ জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

৪ অগস্ট ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি বোধ হচ্চে গ্রীষ্মের অবকাশে ঘুরে বেড়াচ্চ। তাই অনেককাল পরে তোমার চিঠি পেলুম। লেস্‌নির জন্যে চিঠিখানি আজকের ডাকেই রওনা করে দেব— তিনি এলে ভালোই হবে। এণ্ড্রুজ এতদিন পরে আশ্রমে এসেছেন— তাঁকে

আমার ইংরেজি কাব্যসম্বন্ধে আমার অনুশোচনা জানালুম। তাঁরও মত এই যে বর্জ্জনীয় কবিতাগুলি বাদ দিয়ে একটা সমগ্র পরিশোধিত সংস্করণ বের করা। গীতাঞ্জলি, Crescent Moon এবং Gardener অখণ্ডই থাকবে— বাকি বইগুলো ছাঁটা আবশ্যক। আমার রুচিমতো ছেঁটেছি— কিন্তু আমার রুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবার দরকার নেই— ঐটেকে অবলম্বন করে তোমরাও ছেঁটেকেটে একটা ভদ্র জিনিষ দাঁড় করালে খুসি হব। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে আবর্জ্জনাগুলো সরিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাব। ম্যাকমিলানরা লিখেছিল সিলেক্‌শনের কথা, সেটা ভালো প্রস্তাব। কিন্তু তার চেয়ে ভালো প্রস্তাব, সমস্তটাকে মেরামৎ করা। এই সংশোধিত সংস্করণে চিত্রা, Cycle of Spring এবং Post Officeটা জুড়তে পারো— অথবা শুধু চিত্রাকেই কাব্যের অন্তর্গত করে নিয়ে অন্যগুলোকে স্বতন্ত্র বের করতে পারো।

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা এণ্ড্রুজকে পড়তে দিয়েছিলুম। তার খুব ভালো লেগেছে।··· তোমাকে পূর্ব্বেও বলেছি আবার বলছি ঐ তর্জ্জমাটা প্রকাশ করা যদি তোমরা সঙ্গত না মনে করো তাহলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হবো না। খ্যাতি অর্জ্জনের মোহ আমার মন থেকে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসচে। ঐ নেশাটার মতো দুঃখকর জিনিষ পৃথিবীতে অল্পই আছে। অথচ কী ফাঁকি ওটা! জগতে সত্যকার আনন্দের উপকরণ যথেষ্ট আছে, সে সব বিনি পয়সার দান, এবং সৌভাগ্যক্রমে

তা ভোগ করবার শক্তিও আমার আছে ; লোকের মুখের কথার জন্যে ঘুর খেয়ে বেড়ানোর মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নেই। এই শূন্য মরীচিকার রাজ্য থেকে বিদায় নেবার সময় আমার আসন্ন হয়ে এসেছে, তাই রোজই ভাবি এর থেকে মন সরিয়ে নিয়ে এবার পাত্র ভরে নিই আনন্দের চিরউৎসধারা থেকে। মনকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নেওয়া কঠিন, কিন্তু এই সাধনায় লেগে থাকাই দরকার।

শেষ সপ্তক তো প্রকাশ হোলো— যাদের ভালো লেগেছে তাদের বিশেষ ভালো লেগেছে— আবার অনেকে এতে চিনির অংশ কম দেখে নিজেদের বঞ্চিত বোধ করচে। বোধ হয় তারা স্থির করেছে বয়সে বাড়চি রসে কমছি— হয়তো বা কথাটা সত্যি। এবার ছন্দে লেখা কবিতার বই বের করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, নাম দিয়েছি বীথিকা। জানিনে তাতে গুড়ের অংশ কী পরিমাণ আছে।

এ বৎসর বর্ষা নিতান্তই ফাঁকি দিয়েছে। বর্ষামঙ্গল করে দেখি, দেবতা কবির আহ্বান মানেন কি না। ইতি ৪ অগষ্ট ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

২৫ অগস্ট ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

দিশি এমন একটি কাগজও নেই যাতে আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করেনি। রাষ্ট্র-নৈতিক শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই যে এটা করা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে বর্ণভেদমূলক উত্তেজনা আছে।

আমার জীবলীলার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে সে কথা বলা বাহুল্য। আমি য়ুরোপীয় নই, কর্ম্মের কাছে আত্মবলি দিয়ে শক্তি সাধনার চরমমূল্য স্বীকার করিনে। ভাঁটার গতি সমুদ্রের দিকে, জীবনের এই ভাঁটার খেয়াকে উজানের দিকে লগি ঠেলে চলবার প্রাণপণ প্রয়াসকে ধন্য ধন্য করা আমার ভারতীয় স্বভাববিরুদ্ধ। আজ আমার মন সমুদ্রমুখে, কর্ত্তব্যের দোহাই পাড়লে ফল হবে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বোঝা সম্পূর্ণ হালকা করতে পারি নি, চেষ্টায় আছি নূতন কর্ম্ম বাড়াব না।

বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের নিরুপায় অক্ষমতা সুদীর্ঘ-কাল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। তার বিরুদ্ধে কণ্ঠচালনা করে সান্ত্বনাচেষ্টারও অন্ত নেই। সেই ক্ষীণ কলরবের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি নিজের কাছে ফিরে এসে আমাদের পরিহাস করে। তবুও এই পথে অনেকদিন স্বর সাধনা করতে ছাড়ি নি—এখন দিন শেষ হয়ে এল, বহির্মুখী চেষ্টাগুলোকে প্রতিসংহার করবার সময় এসেছে।

প্রবলের বাহুবল প্রয়োগের যুদ্ধরূপটা আমাদের কাছে স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু যুদ্ধের চেয়ে দারুণতর অভিঘাত আছে তার লাল রংটা চোখে পড়ে না বলে সে সম্বন্ধে ইণ্টর-ন্যাশনাল দরদ জাগাবার সম্ভাবনা নেই। তারি সাংঘাতিকতা দুর্ব্বল জাতির পক্ষে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক।

আমাদের মতো দুর্ব্বল যখন মার খায় তখন স্বীকার করে নিতে হয় সেটা অনিবার্য্য। আমরা মারের জন্যে নিজের হাতে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছি, অথচ বোকার মতো কান্নাকাটি করি। আমাদের কলসকে শতছিদ্র করেই গড়েছি, ঘরে যখন আগুন লাগে জল তখন যায় নিকেশ হয়ে; ধর্ম্মের নামে সেই ফুটো ঘটটাকে মঙ্গলঘট বলেই সযত্নে তুলে রাখি, তার পরে জলাভাব নিয়ে পরের অনুকম্পার পরিমাণ বিচার করি। এমন স্থলে বিদেশী রাজন্যবর্গকে দোষ দিয়ে আত্ম-পরিতোষ লাভের চেষ্টা লজ্জাজনক মূঢ়তা। ইতিহাসে আমাদের চেয়ে অনেক মজবুৎ জাত মরেছে, আর আমরাই যে দুর্ব্বলতা বুকে আঁকড়ে ধরে চিরকাল বেঁচেই থাকব বিধাতার এমন আদুরে ছেলে আমরা নই। অতএব মরণের রোগীর চিকিৎসা শেষ পর্য্যন্তই করতে হবে কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়ে। এত কথা তোমাকে বলবার উদ্দেশ্য হচ্চে এই যে, পঁচাত্তর বছরের জীর্ণ শরীরের বোঝা নিয়ে আয়ুপথের শেষ মাইলটা যখন চলতে হচ্চে তখন উপস্থিত দায় সামলানোই যথেষ্ট কঠিন, আর কোনো উত্তেজনায় এই ফাটলধরা মনটাকে দোল খাওয়াতে উৎসাহ হয় না।

চার অধ্যায় বোধ হয় পাও নি, হয়তো পাবে না। বিশেষ ক্ষতি হবেনা। তোমরা যে সিলেক্‌শন সঙ্কলন করেছ তার খসড়াটা আমার কাছে পাঠালে না কেন? হয়তো সেইটেতেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল, শারদোৎসবের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। পশ্চিম মহাদেশে তোমরা যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিপুল সমুদ্যোগের সম্মুখে আছ, তোমাদের কাছে আমাদের এই কোণের ঘরের খেলা অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হবে। কিন্তু এইটুকুর জন্যেই বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ— আমাদের থলি ছোট্ট, অল্প দানই অনেকখানি। ইতি ২৫ অগষ্ট ১৯৩৫

তোমাদের কবি—

৮৩

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বাইরে থেকে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবেনা যে এবার আমার জীবনে প্রদোষকাল ঘনিয়ে এসেছে। মন বলচে সংসারে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই। আমাদের জীবনের আরম্ভকালে শৈশবে আমরা দায়মুক্ত, জীবনের প্রান্তেও তাই। এখন যা কিছু সক্রিয়তা সব অন্তরের দিকে। এই ক্রিয়াটা ধীরে ধীরে বোঁটা আলগা করবার দিকে। আমাদের বয়সে কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়েই হোক বা আসক্তির আকর্ষণবশতই

হোক সংসারকে যদি চারদিক থেকে আঁক্‌ড়ে থাকি তবে সেটাতে কল্যাণ নেই। দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতই সম্বন্ধসূত্র-গুলো জীর্ণ হয় তবু মরতে চায় না, আমি সেটাকে লজ্জাকর মনে করি। উপনিষদে আছে দুই পাখী এক ডালে আছে। একটি পাখী ভোগ করে আর একটি পাখী দেখে। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে সেই ভোগের দিক থেকে নিরাসক্ত দেখার দিকে সরে আস্‌তে ইচ্ছে করচি। ভোগ বলতে কেবল সুখ-ভোগ বোঝায় না, কর্ম্মভোগও বটে। তার থেকে ছুটি নেবার অধিকার আমার হয়েছে। আমি ফাঁকি দিই নি, নানা পথ দিয়েই নিজের শক্তিকে উৎসর্গ করেছি। কর্ম্মের উদ্যোগে যেমন সার্থকতা আছে কর্ম্ম থেকে অবকাশের মধ্যে তেমনি সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতার জন্যে প্রতিদিনই আমার মন উৎসুক। তোমরা আছ যৌবনজোয়ারের উদ্দাম টানের মধ্যে, আমাদের এই ঘাটের মনোবৃত্তি ঠিকমতো বুঝতেই পারবে না। তা নাই বোঝো, আমরা ডাঙায় এসে আমাদের পণ্য বেচে-কিনে দিয়ে অনাগতের অভিমুখে তোমাদের বোঝাই করা নৌকোর ভাসান দেখচি। দেখ্‌তে আনন্দ আছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে তোমাদের চল্‌তি নৌকোয় চড়ে বসব এমন আশা কোরো না। যাক্‌।

নতুন কবিতাগুলি এণ্ড্রুজ নিয়ে গেছে। তার কাছ থেকে পাবে। আমি যেরকম ছেঁটেকেটে দিয়েছি সেইটেকে চরম বলে ধরে নিয়ো না। তোমাদের বিচারবুদ্ধিকে খাটিয়ো। যেখানে আমার সঙ্গে মতের অনৈক্য হবে সেখানে তোমাদের

মতকেই প্রাধান্য দিয়ো। আমার লেখার ভালোমন্দ সব সময়ে আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি নে। যেমন আমার "শেষের কবিতা" তেমনি "চার অধ্যায়", ওর ভাষার রসেই ওরা সজীব প্রফুল্ল। অর্থাৎ কবিতার যে মূল্য, প্রধানত ওদের সেই মূল্য। ভাষান্তরে সেটা টেঁকে না। মূল ভাষার রস বাদ দিয়ে বাকি যেটুকু থাকে সেটা সাহিত্যভাণ্ডারে রক্ষণীয় কিনা জানি নে। সেইজন্যে ইংরেজি "চার অধ্যায়" সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উৎসাহ নেই। আসল কথা খ্যাতির ওঠানামার বাজারে নতুন কারবার করতে আমার ঔৎসুক্য চলে গেছে।

আমার একটা নতুন কবিতার বই বীথিকা নাম ধরে বেরিয়েছে। এই চিঠি পাওয়ার অনতিকালের মধ্যে পাবে। কীরকম লাগ্‌বে জানি নে। এর অধিকাংশ কবিতা এক-সূত্রে গাঁথা নয়। তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। একটা থেকে আরেকটাতে যাবার সেতু না থাকাতে মনকে ফাঁক ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চল্‌তে হয়, পড়বার আরাম তাতে ঘনিয়ে উঠতে পারে না। কেবল এক একখানি কবিতা এক একদিনের মতো যদি জোগান দেওয়া যেতে পারত তা হলেই ভালো হোতো। কিন্তু এরকম ছাপানো বই হাটের মতো, সেখানে বিচিত্র অসংলগ্ন পণ্যের বাজার। তাদের আলাদা আলাদা রূপ, আলাদা আলাদা দাম। তাই আশঙ্কা হচ্চে এ বইটা সাধারণের গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু সেটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কবিতা জিনিষটা হাত পেতে সদ্য গ্রহণ করবার নয়। গ্রহণ করা ব্যাপারটার একটা পরিণতিকাল আছে—

দেওয়া এবং নেওয়া একেবারে অব্যবহিতভাবে মিলিত হয় না।

এখানে শারদোৎসবের আয়োজন চলেচে। কিন্তু বর্ষা এবার বিলম্বে এসে কিছুতে দখল ছাড়চে না— স্তূপাকার মেঘে শরৎকে অবরুদ্ধ করে রেখেচে। বস্তুত এবার আমার শারদোৎসব একটা protest meetingএর মতো হবে— যেন, জেলে রয়েছে যে বন্দী তাকেই কনগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করে তার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করা। ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

৭ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে আগেই লিখেছি চার অধ্যায়ের ইংরেজি তর্জ্জমা ছাপানো সম্বন্ধে আমার লেশমাত্র গরজ নেই। প্রথমত তর্জ্জমাটা আমার নয় দ্বিতীয়ত আমার লেখায় ভাষা প্রধান বাহন। অর্থাৎ ওর প্রধান কথাটা শব্দার্থের দ্বারাই ব্যক্ত হয় না, অনেকখানিই ভাষার ব্যঞ্জনায়। সেটা বাদ দিলে যে দীনতা ঘটে সেটা অপরিচ্ছন্ন— তাকে আমি বিদেশী সভায় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। নিজে তর্জ্জমা করতে হলে নতুন

করে লিখতে হোত। দুটো কারণে সেটা অসম্ভব— এখন দেহে মনে জোর নেই— দ্বিতীয়ত ইংরেজি লেখা খোলে ইংরেজি আবহাওয়ায়, জাহাজে চড়লে আপনিই কলমের বুলি ফিরে যায়, এখানে সে নিতান্তই বাঙালী।

এণ্ড্রুজ আমার একত্রীকৃত কাব্যগ্রন্থ বের করবার পক্ষপাতী। তাঁকে বলেছি Ernest Rhys আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাঁর সাহায্য আমি পূর্ব্বেও পেয়েছি এখনো পেতে ইচ্ছুক। আমার বিশ্বাস সাহিত্যবিচারে তাঁর সূক্ষ্ম বোধশক্তি আছে। তিনি অত্যন্ত রুক্ষ আধুনিক নন এই জন্যে আমার কবিতার সুরের সঙ্গে তাঁর সুর মিলবে। আমার এই মত ম্যাকমিলানকে জানিয়ো। তিনি যদি Edit করেন (অবশ্য মূল্য নিয়ে) আমি নিশ্চিন্ত থাকব। আমি নিজে কেটেছেঁটে যা দাঁড় করিয়েছি সেটা তাঁকে একবার দেখিয়ো। তাঁর সঙ্গে appointment করে তুমি যদি আলোচনা করতে পারো আমি খুসি হব। —একটা কথা বলা আবশ্যক— The Cycle of Springএ অনেকগুলি Lyrical কবিতা আছে— আমার মত এই যে তার মধ্যে যেগুলি চয়নযোগ্য এই বইয়ে যেন তারা স্থান পায়। Cycle of Spring অনেকে পড়বেনা— এটা পড়বে। এণ্ড্রুজ Cycle of Spring ভাঙতে চান না কিন্তু তাঁর আপত্তি স্বীকার-যোগ্য নয়। আরো দুই একটা কবিতা পাঠাই যদি চালানো মত হয় চালিয়ো, ফাল্গুনীর সম্বন্ধে Rhysএর মত নিয়ো। তুমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছ নানা কাজে, তোমার উপর আমার দায় চাপাচ্ছি, ভালো লাগচেনা, উপায় নেই।

বীথিকা এতদিনে পেয়ে থাকবে— নানা রকমের কবিতা এর মধ্যে জুটে গেছে। ইতি ৭ অক্টোবর ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভেবে দেখলুম The Cycle of Spring বাদ দেওয়াই ভালো, ওতে বিশেষ কিছুই নেই।

আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

৮৫

২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখতে পারি নি। তার কারণ নানা কর্ম্মজালে নিরন্তর এবং নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলুম তার উপরে শরীর ভেঙে পড়েছিল। কয়েকদিনমাত্র হোলো ডাক্তারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আজ ৭ই পৌষের উৎসব সমাধা করে তোমাকে এই পত্র লিখতে বসলুম। ইতিমধ্যে তোমার কাছ থেকে বই কখানা পেয়ে পড়বার খোরাক পাওয়া গেল। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বইখানি আমার খুব ভালো লাগচে। তোমাদের ওখানকার আধুনিক কালকে আমার মনে হয় ক্ষণ-কালের একটা আকস্মিক উৎক্ষেপ, চিরকালের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ— নিজের মধ্যে হঠাৎ চিরন্তনের সম্বল নিঃশেষ হয়ে

এসেচে বলেই, নিজের দৈন্যকে নিয়েই জয়পতাকা বানাবার চেষ্টা করচে। ইতিহাসে কতবার এ রকম মেকি রাজা মহা সমারোহ করে এসেছে, তাদের প্রতাপের আড়ম্বরে ভিড়ের লোক মুগ্ধ হয়েছে, তার পরে হঠাৎ দেখা যায় সেই রাজাও নেই সেই ভিড়ও গেছে সরে। আর আজকের দিনের যে আধুনিক কাল পূর্ব্বতন মানুষের আনন্দের আদর্শকে অবজ্ঞা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এরি কি নূতন ছাপমারা মূল্যের তালিকা চিরকালের বাজারে চলবে? যে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণিকায় এ'কে ঠিকমতো যাচাই করা যেতে পারত তোমরা তার বাইরে, তোমরা আজকের দিনের মুখর ভিড়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেষি করে আছ। যাক্ এ সব তর্কে কোনো ফল নেই। আমার মন আজ নিতান্ত নিরাসক্ত— মুখের কথা কেনাবেচার হাটে আমার লোভ ক্ষীণ হয়ে এসেচে, জানি সে কতই ফাঁকা। —অমলার অকস্মাৎ মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনা বোধ করেচি। তার পরে আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা গভীর ছিল। এমন মনস্বিনী এমন তেজস্বিনী সত্যপ্রতিষ্ঠ মেয়ে কম দেখেছি। তার সংসারে তার অভাব যে কত বড়ো প্রকাণ্ড অভাব তা বুঝতে পারি —কিন্তু কোনো কথা বলবার নেই।

৭ই পৌষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এণ্ড্রুজকে ও অরনেস্ট্ রীজকে যে চিঠি লিখেছি সে বোধ হয় তুমি দেখ নি। তাতে জানিয়েছি, যে এখান থেকে যে সব কবিতার তাড়া এণ্ড্রুজের সঙ্গে গিয়েছে সে আমার নির্ব্বাচিত নয়। নির্ব্বাচনের ভার তাঁরই উপরে যিনি এডিট করবেন। অপ্রকাশিত কবিতাগুলো আমি বর্জ্জন করতেই চাই। আমার প্রশ্ন চিত্রা সম্বন্ধে, সেটা কি ত্যাগ করাই স্থির করেচ। আমার তাতে লেশমাত্র আপত্তি নেই। নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমি যে কিছুতেই বেদনাবোধ করব এমন আশঙ্কা মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করে দিয়ো। আমি নিজেই যেগুলো বহিষ্কৃত করেছি তার বাইরেও যদি ত্যাজ্য কিছু থাকে তবে তা ছেঁটে দিতে দ্বিধামাত্র কোরো না। এ সম্বন্ধে এণ্ড্রুজকে আমার মত স্পষ্ট করেই জানিয়েছি তবু তুমি তাঁকে আর একবার অভয় দিয়ে আমার মতটা জানিয়ে দিয়ো। নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার মমত্বর চেয়ে নিষ্ঠুরতাই বেশি আছে এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো। ফাল্গুনীটা গদ্য নাটক, ডাকঘরেরই সমজাতীয় এই কারণে ওটা কাব্যসংগ্রহে স্থান পাবার অযোগ্য, তা ছাড়া ওর লিরিক ছন্দ ও সুরের উপরই একান্ত নির্ভর করে। বহুকাল পূর্ব্বে একজন ফরাসী সমালোচক ওর খুব প্রশংসা করে সুনিপুণ সমালোচনা করেছিলেন— আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।

কিন্তু ইংরেজি তাঁর আপন ভাষা নয় বলেই ভাষার দিকে তিনি বাধা পান নি। Darmstadtএ থাকতে একজন হাইডেল-বর্গের ছাত্র ওর মর্ম্মকথা এমন সুন্দর করে বলেছিল যে সেও আমার পক্ষে বিস্ময়কর হয়েছিল। দেখেছি গীতাঞ্জলির তর্জ্জমা ইংরেজের কাছে এত ভালো লাগে তার প্রধান কারণ ওর ভাষা। অন্য ভাষার য়ুরোপীয়দের কাছে Gardener ওর চেয়ে অনেক বেশি আদৃত— তাদের কাছে ভাবের আকর্ষণ প্রবল।

অনেক কাল পরে দুখানি ইংরেজি [বই] আমাকে গভীর-ভাবে মুগ্ধ করেছে। একখানি নেভিনসনের "Looking Backward"— নামটা ভুল হোলো, মনে নেই। আর একখানি লরেন্স বিনিয়নের Asian Minds in Art। অন্তরের মধ্যে পরমানন্দে অনুভব করলুম এ রা আধুনিক নন এঁরা সর্ব্বকালীন। এঁরা ভূমাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে শ্রদ্ধা করেন তাঁর সঙ্গে চাতুরী করেন না। বই পড়ে অনেককাল এমন পরিতৃপ্তি পাইনি। ইচ্ছা করছিল যেন না শেষ হয়ে যায়। শুনেছি নেভিন্সনের আত্মজীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে। শশধরকে বোলো আমাকে পাঠিয়ে দিতে আমি তার দাম দেব। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

৭ এপ্রিল ১৯৩৬

ওঁ　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের খবর পেয়েছ কিনা জানি নে। গল্পটাকে নাচে গানে গেঁথে নাট্যমঞ্চের উপরে প্রকাশ করা হয়েছে। এই পালাটা নিয়ে আমরা জয়যাত্রায় বেরিয়েছিলেম। কলকাতা পাটনা এলাহাবাদ দিল্লি মিরাট লাহোর এই কয় জায়গায় আসর জমিয়েছিলুম। সকল জায়গা থেকেই প্রভূত প্রশংসা পেয়ে এসেছি। যদি প্রত্যক্ষ দেখতে তাহলে বুঝতে গানে নাচে বর্ণচ্ছটার সমবায়ে সমস্তটার ভিতর দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্য্যের কী রকম উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্য দর্শকরা বারবার করে বলেছে এ জিনিষটা য়ুরোপে নিয়ে যাওয়া উচিত। লোকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে রঙ্গভূমির ভূমিকায় এই আমার শেষ প্রয়াস। কোনো একটি অনামা বন্ধু আমাদের ঋণমোচনের জন্য আমাকে এককালীন ষাট হাজার টাকা দান করে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।··· বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর করবার জন্যে দুর্ব্বল জীর্ণ শরীরকে ক্লান্তির চরম-সীমায় নিয়ে চলেছিলুম। শ্রদ্ধাবিহীনের দ্বারে ব্যর্থ ভিক্ষাপাত্র বহনের দুঃখ ও অসম্মান প্রত্যহ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন উপলব্ধি করেছি আমার দেশে আমার যথার্থ স্থান নেই, আমি একান্তই বিদেশী। এমন সময়ে অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত অনুকম্পা আমাকে বিস্মিত করেছে। এই দান ব্যক্তিগত,

এ আমার দেশের দান নয়— এমন কেউ দিয়েছেন যিনি আমার সমানধর্ম্মা। আমাকে বিশেষ করে মুগ্ধ করেছে এইজন্যে, বিশেষভাবে আমারই ভার লাঘব ও সম্মান রক্ষার জন্যেই এই দাক্ষিণ্য, কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে নৈর্ব্যক্তিক অর্ঘ্যদান নয়। আমি বেঁচে থাকি, আমি আরাম পাই এই অকৃত্রিম দরদ দেশের কোনো একটিমাত্র জায়গাতেও থাক্‌তে পারে এমন প্রত্যাশার লেশমাত্রও আমার মনে ছিল না। অথচ যাঁরা একমুহূর্তের জন্যেও আমার কর্ম্মক্ষেত্রের সুদূর প্রান্তেও পা বাড়ান নি তাঁরা নিজেদের কীর্ত্তি এবং স্বার্থের জন্যে আমার নামের সংস্রব প্রার্থনা করতে কোনো সঙ্কোচ বোধ করেন না, অর্থাৎ তাঁরা আমার ভার বাড়িয়েই থাকেন, ভার লেশমাত্র কমাবার জন্যে লেশমাত্র ইচ্ছা দেখান না। বাংলা-দেশের কাছ থেকে মিথ্যা নিন্দা ও গালি দেশের লোকের বিনা আপত্তিতে আমি যেমন সহ্য করেছি এমন আর কেউ করে নি। এ দেশে আমার শেষ বয়স পর্য্যন্ত আমি চিরনির্ব্বাসন-দশা ভোগ করেছি। আমার শক্তি আমার অর্থ আমার খ্যাতি এই প্রদেশকেই নিঃশেষে আমি সমর্পণ করে দিয়েছি। আজ গঞ্জনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে জীবনযাত্রার সুদীর্ঘ পথের শেষে আমার প্রদেশের বাইরে থেকে এই যে ভালোবাসার প্রমাণ পেয়েছি এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার আমি আর কিছু পাই নি। যে ছুটি আজ আমার অত্যন্ত আবশ্যক ছিল সেই ছুটির এতবড়ো দাম একমুহূর্ত্তে যিনি শোধ করে দিয়েছেন তাঁর উদ্দেশে রইল আমার জীবনের শেষ নমস্কার।

নেভিন্‌সনের বইখানি পেয়ে অত্যন্ত খুসি হয়েছি। এখনকার অনেক আধুনিক লেখকের মধ্যে ওঁকেই দেখেছি যিনি একান্তভাবে মডার্‌ন্‌ নন, যিনি সকল কালের। ওঁর রচনার মধ্যে লেখনীর নৈপুণ্য নয় চরিত্রের মহিমা প্রকাশ পায় তাতে ভারি আনন্দ দেয়। যে স্বচ্ছবাতাসে আলোক বাধা পায় না, আবিল হয় না, ওঁর লেখার চারদিকে সেই বায়ুমণ্ডল আছে।

একটা খবর দেবার আছে। বোধ হয় ইতিমধ্যেই পেয়ে থাকবে। কৃপালানির সঙ্গে বুড়ির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। অত্যন্ত খুসি হয়েছি। কৃপালানিকে আমি অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি, ওকে যে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সীমানার মধ্যে পেয়েছি এ আমার বিশেষ আনন্দের বিষয়। বোধ হয় দিন দশ পনেরোর মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হবে। তার পরে আমার ছুটি। কিছুদিনের জন্যে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করব। যদি যথোচিত সঙ্গতি থাকত তাহলে একবার য়ুরোপ ঘুরে আসতুম। অশুভগ্রহের যে রকম সব লক্ষণ দেখা যাচ্চে তাতে আশঙ্কা হচ্চে য়ুরোপে হয়ত বা যুগান্তর আসন্ন— পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই ক্ষত আহত দশার পূর্ব্বে একবার দেখে আসতে পারলে হ'ত ভালো। ওদের ইতিহাসের স্তরে স্তরে অনেকদিন অনেক পাপ জমে এসেছে, কোন্‌ রক্তস্নানে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে জানি নে।

আজকাল লিখতে ক্লান্তি ও অনিচ্ছা বোধ হয়। আমার ইস্কুলপালানে ছেলেবেলা আজ আবার আমার ঘাড়ে চেপেছে। সেই আমার পলাতকা মন এতদিন তোমাকে চিঠিপত্র লেখে

নি। অনেকদিন পরে আজ অপরাহ্নকালে কলম নিয়ে বসেছি। কিছুকাল থেকে লিখব লিখব করছিলুম— না লিখে ফেলতে পারলে ভিতরে ছুটি পাওয়া যায় না— তাই এই চিঠিখানা —এখন কলম বন্ধ করি। ইতি ৬।৪।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিখানি সমাধা করার পরেই মনটা আমার লজ্জাবোধ করচে। জীবনের খাতায় আদায়ের কোঠায় আমার কম জমা হয় নি, অথচ অনাদায়ের শূন্যগুলোর পরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভাগ্যের কৃপণতার পরে অভিমান করার মতো দীনতা আর-কিছু হতে পারে না। পাওনার হিসেব নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করতে থাকা আত্মাবমাননা। সম্প্রতি আমার শরীর নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েচে বলেই এই অসন্তোষ অস্বাস্থ্যে ভর দিয়ে হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে শরীর ভালো ছিল তখন জীবনের সমস্ত গ্লানির উপরে আমার মন সম্পূর্ণ জয়ী হয়ে সুগভীর শান্তিতে পূর্ণ হয়ে ছিল, তখন বাইরের সমস্ত প্রতি-কূলতা আমার কাছে অবাস্তব প্রতিপন্ন হওয়াতে আমার যাত্রাপথের শেষ অংশটা খুব স্নিগ্ধ হয়ে এসেছিল। এ কথাটা পরিষ্কার বুঝেছিলুম আয়ুর স্রোতে সত্য মিথ্যা দুইই প্রচুর পরিমাণে মিশিয়ে থাকে, কিন্তু গঙ্গার ধারা আপনার পাঁকের অংশটাকে সহজে গৌণ করতে পেরেছে বলেই সে শুচি, তেমনি যা অবাস্তব তাকে গ্রহণ করেও সর্ব্বান্তঃকরণে অস্বীকার করতে

পারাই মনের স্বাস্থ্য এবং সম্মান রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক। আজ তোমাকে চিঠি লেখার পরেই দেখতে পেলুম, মনের তলায় যে পাঁকের পলি পড়ে নাড়া খেলেই হঠাৎ সমস্ত স্রোতটাকেই সে ঘুলিয়ে ফেলে। চরিত্রের এই অসম্ভ্রমের থেকে নিষ্কৃতি চাই— নালিশের ধুলো-ওড়া বাতাসের ঊর্দ্ধে যেখানে স্তব্ধ নির্ম্মল শান্তি সেখানে ডানায় ভর করে পৌঁছতে পারলে ক্ষীণতা থেকে ইতরতা থেকে রক্ষা পাব। বাইরের আদালত থেকে আমার সব নালিশ উঠিয়ে নিলুম। উপরের আদালতে জীবনের মামলায় জিৎ হবেই এই দৃঢ় প্রত্যাশার উপরে জীবনের পরিণামে যেন অবিচলিত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমার লেখার ইংরেজি অনুবাদ প্রভৃতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলে তখন তার ধাক্কা আমার মনকে লাগে নি— আমি স্পষ্ট অনুভব করেছিলুম উপস্থিতকালের দেনাপাওনার তর্ক অশ্রদ্ধেয়— হিসাব যখন নিকাশ হবে তখন সে হবে আমার অগোচরেই, তার ফলাফল আমার অতীত— এবং উপস্থিত-কাল যে ফল নিয়ে আমার সম্মুখে ধরে তার পরিমাণ ও মূল্য নিয়ে হর্ষশোক ছেলেমানুষী। কাজের আনন্দটাই থাক্ আমার, তার বেশি আর যা কিছু দিয়ে নিজের নামটাকে ফুলিয়ে তুল্‌তে ব্যস্ত হই তার প্রতি যেন সম্পূর্ণ বিমুখ হতে পারি এই আমার কামনা। নামের মোহ জড়িয়ে আছে মনকে কুয়াষার মতো, লোকমুখের বাক্যের কুয়াষা— ছিন্ন হয়ে যাক্ সে— নির্ম্মল আলোর মধ্যে মুক্তি পাক অন্তরাত্মা। ইতি ৭।৪।৩৬

রবীন্দ্রনাথ

৮৮

১৩ জুলাই ১৯৩৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। আমিও বারবার তোমাকে চিঠি লিখি-লিখি করেছি। কিন্তু প্রাণ যখন সচল ছিল তখন সে আপনার বোঝা আপনিই বয়েছে, এখন সে স্থাবর হয়ে পড়াতে ছিয়াত্তর বছরের আয়ুর ভারে মন্থর মনটাকে কোনো কাজে চেতিয়ে তোলা বড়ো শক্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে স্থাণু হয়ে থাকা তো চলে না, সেইজন্যে আজকাল প্রকৃতির সাহচর্য্য আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে। উভয় পক্ষেই পরস্পরের কাছে কোনো দাবীদাওয়া নেই। আর একটা আনন্দ পাই বড়ো বড়ো গাছ-গুলোর মধ্যে। ওদের জীবনলীলায় বয়স যেন থেমে আছে, ওরা প্রাচীন নবীন একসঙ্গেই— বয়সের ক্লান্তি ওদের একটুও নেই। ঐ শাল গাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অম্লান ফুল ফুটিয়েছিল আজও ঠিক সেই ফুলই ফোটাচ্চে কিন্তু ক্ষণিকায় আমি ত্রিশবছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে। আমার কবিতার ভিতর দিয়েই কুষ্ঠির গণনা করা যেতে পারে, তার মধ্যেই রয়ে গেছে বয়সের হিসাব। আকাশের উপর দিয়ে যে দিনরাত্রি আসে যায় কালিদাসের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের ছায়া আলোর সম্পদ একই, অথচ ৭০ বছরের মধ্যেই তারা আমার দেহমনকে

যেন বহু জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসছে। সঞ্চয় ফেলতে ফেলতে চলেছি, পরিচয়ের বদল হচ্চেই। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই যে, আমাদের পারিপার্শ্বিক আমাদের পরিণতির নূতন পর্ব্বকে সহজে স্বীকার করতে চায় না, এক-কালের দাবী অন্যকালেও চাপাতে চায়। এইজন্যেই আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চাশের পর সমাজের রঙ্গভূমি থেকে নেপথ্যে সরে যেতে বলে। এদেশের উপদেশ অনুসারে সমাজ অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধ জীবনের মাঝখানটাতে। বাল্য-কালও দায়িত্ববিহীন, বৃদ্ধবয়সও। সামনের জীবনের জন্যে বালককে যখন প্রস্তুত হতে হয় তখন সংসার তার উপরে কর্ত্তব্যের দাবী করে না। কিন্তু মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত হওয়া উচিত। মৃত্যুকে যারা নঙর্থক ব'লেই জানে, তারা, যেন চিরদিনই বাঁচতে হবে সেই রকম ভঙ্গীতে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু ঠিকমতো ক'রে থেমে যাওয়াতেই প্রাণের পূর্ণতা প্রকাশ পায় এটা মনে রাখলে সেই থামবার জন্যেই সাধনা করা চাই। বস্তুত সকলে মিলে ঠিক সময়ে থামতে দিতে চায় না ব'লেই শেষ বয়সটা এত ক্লান্তির কারণ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর প্রবেশ-প্রাঙ্গণে যে বৃহৎ অবকাশ অপেক্ষা করে আছে তাকে যদি বাইরের সংসার এবং অন্তরের পূর্ব্বাভ্যাসে মিলে নষ্ট করতে না থাকে তাহলে সেটা খুব সুন্দর। য়ুরোপের নকল ক'রে কর্ম্মপূজাকে আমরা এত বড়ো কৃত্রিম মূল্য দিয়েছি যে জীবনটা যে একটা আর্ট, সুতরাং সমাপ্তিতে তার একটা সম্পূর্ণতা আছে বাহাদুরী ক'রে এটা আমরা

ভুলতে বসেছি। বৃদ্ধের আদর্শ যারা, অর্থাৎ যারা ঠিকমতো ক'রে বুড়ো হোতে জেনেছে একদিন আমাদের সমাজে তাদের খুব বড়ো জায়গা ছিল। আজ সে জায়গা তাদের দিতে চায় না ব'লেই তাদের তারুণ্যের ভান করতে হয়। কম্যুনাল্ এওয়ার্ড নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়, সাহিত্যের মজুরিগিরি চালাতে হয়, Foreword লেখা, নবজাত মাসিকপত্রের আশীর্ব্বাণী পাঠানো, নতুন রচনা সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া ইত্যাদি হাজার রকম উপদ্রব মেনে না নিলে কর্ত্তব্যত্রুটির অপবাদ আক্রমণ করে। আগে অরণ্য ছিল এখন তাও নেই, গিরিশিখরে সমুদ্রতীরে আধুনিক বানপ্রস্থ্যের রসদ জোগানো যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়। অতএব দেখতে পাচ্চি সুন্দর করে মরাটা অদৃষ্টে নেই, ক্লান্তিতে জীর্ণ জীবনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মাঝ রাস্তায় মুখ থুব্ড়ে প'ড়ে অজায়গায় থামতে হবে।

তোমাকে আর এক খণ্ড "পত্রপুট" দিতে বলব। আশা করি নূতন সংস্করণের গদ্য বইগুলিও তোমাকে পাঠানো হচ্চে। প্রুফ সংশোধন করতে নিয়ে দেখি সেগুলি পাঠ্য। ইতি ১৩ জুলাই ১৯৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯

২৮ জুলাই ১৯৩৬

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠি পাই নি, বোধ করি ডিগ্রি-পরীক্ষার প্রবন্ধ রচনা নিয়ে ব্যস্ত আছ। আমিও দীর্ঘকাল তোমাকে চিঠি লিখি নি। সম্প্রতি লেখবার একটা তাগিদ এল ভিতর থেকে। মনটাকে খোলসা করবার প্রয়োজনে। তুমি সমুদ্রের ওপারে আছ, বাদবিবাদের চক্রবাত্যা থেকে দূরে, সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আলাপ করা আমার পক্ষে সহজ। তুমি আমাকে ভালো ক'রে জানো সেও একটা সুবিধা।

ভারতশাসনযন্ত্রের কিছু অংশ আমাদের দান করা হোলো ব'লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দাক্ষিণ্যগৌরব অনুভব করছে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রতত্ত্ববিচারে যাঁরা অধিকারী তাঁরা বলছেন দান ক'রেও যতদূর সম্ভব দান না-করার নৈপুণ্য এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন এই পোলিটিকাল কানামামার চেয়ে নেই-মামাও ভালো ছিল। এই তর্কে এ পর্য্যন্ত আমি বেশি মন দিই নি কারণ ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে দানে পাওয়া ঘোড়ার দাঁত গুণতে নেই। যেটাতে আমার মনকে পীড়া দিয়েছে সেটা হচ্চে এই যে, এই দানের অঞ্জলিতে বাংলাদেশের ভাগ্যে যে কুপথ্য মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ক্রিয়া চলবে চিরকাল ধ'রে। রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে বাংলাদেশে দ্বন্দ্ববিরোধের এমন একটা

বাসা বানানো হোলো যাতে ক'রে এ দেশের সেই শান্তিকে নানা উপলক্ষ্যে প্রখর চঞ্চুঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে যে-শান্তি আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির মূল আশ্রয়। মুসলমানেরা ভুলেছেন রাজশক্তির পক্ষপাতে তাঁদের সৌভাগ্য সূচনা করছে না। যে মার মারা হয়েছে এটা একলা হিন্দুর নয়, সমস্ত জাতের মর্ম্মে মার, গাছের প্রাণবাহী শিকড় কেটে দেওয়ার মার। বিষয় বিভাগে পার্টিশনের মামলায় যে পক্ষেরই হার হোক্ বা জিত হোক্, দুই ভায়েরই একান্নবর্ত্তী তহবিলে সর্ব্বনাশ ঘটায়, পৌষমাস তাদেরই যারা মামলার উৎসাহদাতা। দেউলিয়া হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জেদের ঝোঁকে এ কথা বুঝতে সময় লাগে।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারসামঞ্জস্যের গুরুতর ব্যত্যয় ঘটলে সমস্ত দেশের শাসনযন্ত্র যায় বিকল হয়ে। এর ফলে যে-একটা সর্ব্বব্যাপী অপটুত্ব ঘটা অবশ্যম্ভাবী সেটা সমগ্র বাংলাদেশের পক্ষেই লজ্জা এবং দুঃখের কারণ হবে, এই সহজ কথাটাও যাতে ভুলিয়েছে কর্ত্তৃপক্ষ এমন একটা মাদকরসের পরিবেষণ করেছেন। তাই যাকে মারছেন সেও করছে জয়ধ্বনি। সংসারে ন্যায়ের প্রয়োজন কেবল ধর্ম্মরক্ষার জন্যে নয়, কর্ম্মরক্ষার জন্যেও।

মারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। "মহম্মদী"-পত্রে আমার কবিতায় পৌত্তলিকতা ও দুর্নীতির প্রভাব নির্দ্দেশ ক'রে যে নালিশ দায়ের করা হয়েছিল তারও জবাব দিতে হোলো। এত বড়ো প্রহসনের কিয়দংশ তুমি সেখান থেকেও ভোগ করেছ

ব'লে বোধ হচ্চে। যাঁদের সাধারণত আমরা এডুকেটেড ব'লে থাকি লেখক নিঃসন্দেহ সেই জাতীয়। কিন্তু একটা পরিব্যাপক প্রমত্ততায় বিভ্রম জন্মিয়েছে। আর কিছুকাল পূর্ব্বে এ রকম অদ্ভুত ঘটনা হয় নি, হোতে পারত না।

পাঠ্যনির্ব্বাচনসমিতিতে পিতৃদেবের আত্মজীবনী বিচার-কালে মুসলমান পক্ষের বিচারক মহর্ষির দিদিমার মৃত্যুকালীন ঠাকুরদেবতার নামোচ্চারণের বিবরণমাত্রকেই আপত্তিজনক ব'লে মত দিয়েছিলেন। এই সমস্ত অদ্ভুত আপত্তি কেবলমাত্র বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধেই খাটছে। এই আদর্শে বিচার করলে ইংরেজি সাহিত্যে এর সমতুল্য এবং এর চেয়ে আরো অনেক বেশি এই জাতীয় আপত্তির কারণ ছড়াছড়ি পাওয়া যাবে সেটা প্রমাণ করতে অত্যন্ত বেশি গবেষণার দরকার করে না। কিন্তু সেটা লক্ষ্য করলেও তাতে কোনো চাঞ্চল্য ঘটবার আশঙ্কা নেই। ওঁরা বাংলা বিত্তালয়ে পাঠ্য ইংরেজি সাহিত্যকে বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের রোচক ক'রে পরিবর্ত্তিত করার প্রস্তাব এখনো পর্য্যন্ত করেন নি। এ'কেই বলে কম্যুনালিজম্, এই কম্যুনালিজমের উপরেই বাংলাদেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিৎপত্তন হোলো।

এই সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা নিয়ে কয়েকদিন হোলো, কলকাতা টাউনহলে একটি সভা ডাকা হয়। আমাকে সভা-পতিত্ব নেবার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল। এই পদ আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

এ কথা শুনে তুমি হয়তো বিস্মিত হবে। তুমি জানো

পোলিটিকাল আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ। এতকাল ধরে আমি যে কর্ম্মের ভূমিকা রচনা করেছি আমাদের দেশের পোলিটিকাল আলোড়নের আঁধি তার হাওয়াকে আবিল করে দিতে পারে এই আশঙ্কা বরাবর আমার মনে ছিল। সাধারণত পলিটিক্‌সের উন্মাদনায় বহুল পরিমাণে যে মিথ্যা যে অত্যুক্তি যে দলাদলির বিদ্বেষবিষ উগ্র করে তোলে তার দূষিত সংক্রামকতা থেকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীদের মনকে সতর্কভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। তুমি তো জানো যখন কিছুকালের জন্যে আমেরিকায় বক্তৃতার নিমন্ত্রণে আশ্রম থেকে দূরে ছিলেম তখন সেই সময়কার পলিটিক্‌সের বেনোজল প্রবলবেগে আশ্রমকে আক্রমণ করেছিল, তার উচ্ছৃঙ্খলতা তার পঙ্কিলতা থেকে শান্তি-নিকেতনকে প্রকৃতিস্থ করতে দীর্ঘকাল সময় লেগেছিল। যে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আজ আমরা ঝগড়া করছি তাতে একপক্ষ আজ প্রশ্রয় পেয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষের অনেকেরই মনে তার তাপ আটানব্বই ডিগ্রির যথেষ্ট উপরে। এই বহুকালীন সাম্প্রদায়িক চিত্তবিকার যে আমাদের দেশের সার্ব্বজাতিক কল্যাণের ভিত্তিকে জর্জ্জর করে রেখেছে সে কথা উপলব্ধি করার মতো বিবেচকতা এবং স্বীকার করার মতো সাহস তাদের নেই। শান্তিনিকেতনের সাধনক্ষেত্রে এই সাম্প্র-দায়িকতার কাঁটা গাছ যাতে কোনোমতে শিকড় গাড়তে না পারে সেজন্যে আমার মনে সর্ব্বদাই উদ্বেগ আছে।

ভারতশাসনযন্ত্র ইংরেজজাতি দ্বারা চালিত। এই কারণে

এই শাসন যখন আমাদের কোথাও পীড়া দেয় তখন তার আন্দোলনে স্বভাবতই সমস্ত ইংরেজজাতির পরেই আমাদের বিরুদ্ধভাব প্রবল হয়ে ওঠে। সমস্ত জাতির পরে এই অবিচার করার মধ্যে যে অন্যায় আছে যে অসত্য আছে তা আমাদের মনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। তাতে যে প্রমাদ ঘটায় অন্যদিকে তার অনৌচিত্য বিচার না করলেও বলা যেতে পারে যে আমাদের রাষ্ট্রমঙ্গলসাধনায় সে প্রতিকূল।

তুমি আমার মত জানো এবং অন্যদেরও আমি অনেকবার বলেছি যে পরজাতির শাসনভারপ্রাপ্ত সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে ইংরেজকেই আমি সব চেয়ে শ্রদ্ধা করি। ওদের সঙ্গে আমাদের যে রকম অস্বাভাবিক সম্বন্ধ তাতে এই শ্রদ্ধার কথা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন এবং আমাদের পক্ষে শোনা শ্রুতি-সুখকর নয়। সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেশে এমন অনেক নিদারুণ ঘটনা ঘটেছে যার সঙ্গে ওদের সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়েছিল অথচ যা উচ্চারণ করবার অধিকার আমাদের নেই, যার ফলে দেশে আগুন ছড়িয়ে গেছে এবং তার শাস্তি আমাদের যুবকেরাই ভোগ করেছে। এই কারণগুলিতে বাংলাদেশের যুবকদের মনের দৃষ্টি তীব্রভাবে কলুষিত হয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও বলতে হবে ইংরেজকে বিচার করবার সময়ে এই সমস্ত অভ্যুৎপাতকেও একান্ত করে দেখলে চলবে না। য়ুরোপে আরো কয়েকটি বড়ো বড়ো মহাজাতি আছে, পরদেশীয়দের শাসন করবার ক্ষেত্র আছে তাদের অধীনে। তারা যে আমাদের শাসনকর্ত্তা নয় অন্তত এ কথাটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই স্বীকার করতে

হবে। আমি আজ যা লিখছি, এবং আমাদের রাষ্ট্রসভায় ভারতশাসননীতি সম্বন্ধে অধীন জাতির বক্তব্য যে পরিমাণ স্বাধীনতার সঙ্গে আলোচিত হয়ে থাকে, পাশ্চাত্য শাসিত অন্য কোনো দেশেই তা সম্ভবপর হোত না। এখানে সীডিশনের সীমা যেখানে আরম্ভ অন্যত্র সেটা তার অনেক পশ্চাতে সে কথা ভুলে থাকি বলে উষ্মাপ্রকাশের সময় আমাদের বিভ্রম জন্মায় যে জোরটা আমাদেরই ; জোরটা যে অপর পক্ষের ধৈর্য্য এবং পৌরুষে সেটা আমাদের মনে চাপা থাকে। আমেরিকাকে আমরা দূরের থেকে মান দিয়ে থাকি যেহেতু তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। সেখানে নিগ্রোদের প্রতি লাঞ্ছনা ও পীড়নের পাশবতা ছেড়ে দিলেও সেখানকার আদালতে যে রকম চূড়ান্ত অন্যায়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায় আমরা ভারতবাসীরা তাতে অভ্যস্ত নই। পূর্ব্ব এসিয়ায় ভ্রমণকালে পাশ্চাত্য অধিকৃত দেশে যে রকম চুপি চুপি কানে কানে বলা আতঙ্কের পরিচয় পেয়েছি ভারতবর্ষে সে রকম আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। ভারতীয় সংস্কৃতিজ্ঞ সিলভ্যাঁ লেভি একদা বলেছিলেন, ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ সুগম ক'রে ইংরেজ যে বিষম ভুল করেছেন ফরাসীরা যেন তাঁদের অধিকৃত দেশে সে রকম ভুল না করেন। মাঝে মাঝে স্পষ্ট বুঝতে পারি ভারতীয় রাজ-পুরুষেরাও এই নিয়ে মনে মনে অনুতাপ করে থাকেন, কিন্তু নিঃসঙ্কোচে গায়ের জোরে উক্ত অধ্যাপকের উপদেশ পালন করা ইংরেজের পক্ষে অসাধ্য। রাগ করলে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ নিজের জাতিধর্ম্ম যতই বিস্মৃত হোন তবু তার মধ্যে লজ্জা-

সরমের কিছু জায়গা থাকে। কেননা ওঁদের জাতের মধ্যে যাঁরা যথার্থ বড়ো এবং সেই কারণে যাঁরা তার প্রতিনিধি তাঁদের কাছে জবাবদিহি আছে। এই হেতু রাজপুরুষেরা জোর ক'রে বলতে পারে না আমাদের যা খুসি তাই করব। অনায়াসে বলতে পারত নবাবরা বাদশারা, সুযোগ পেলে আমাদের উপরাজারাও, পর্দ্দার আড়ালে অন্ধকারে বলতে চেষ্টা করেছে আমাদের অনেক জমিদারও, এবং আজ বলতে পারে য়ুরোপের অধিকাংশ কড়া কড়া জাতি। সেইজন্যে আন্দামানের স্ত্রীবিরল নারকীয়তাকে আমরা যখন দণ্ডধারীদের মুখের সামনে নিন্দা করি তখন আমাদের মতো দুর্ব্বল জাতেরও মুখের সামনে ওরা জোর গলায় বলতে পারে না যে যারা দণ্ডনীয় তাদের নরকেই পাঠাতে চাই। যথাসম্ভব সাধুতার সুরে ওদের বলতে হয় আন্দামান শান্তিধাম না হোক্ স্বর্গীয় শান্তিধাম বটেই। ইংরেজের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ আছে কার্য্যগতিকে সেই আদর্শ থেকে যারা ভ্রষ্ট হয় তারাও বাহুবলের স্পর্দ্ধায় সেই আদর্শের প্রকাশ্য অবমাননা করতে পারে না। যদি পারত তা হোলে কৌন্সিলের ক'জন স্পষ্ট বক্তা আন্দামান স্বর্গলোকের বাইরে স্থান পেত?

ইংরেজের মধ্যে যাঁরা মহৎ তাঁদের অনেককে আমি দেখেছি। তাঁরা স্বজাতিকৃত বা পরাজাতিকৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা হয়তো রাষ্ট্রনীতিক নন কিন্তু যাঁরা রাষ্ট্রনীতিক তাঁরা কী জাপানে কী য়ুরোপে সমগ্র জাতির যথার্থ প্রতিনিধি ব'লে গণ্য হোতে পারেন না। ইংলণ্ডে রাষ্ট্রচালকেরা যদি তাঁদের দেশের মহত্তর দলের বিচার-

বুদ্ধিকে নগণ্য করতে পারতেন তা হোলেই মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ আজ হয়তো তাঁদের দ্বারা ভূমিসাৎ হোতে পারত। যেমন হয়েছে জার্ম্মানিতে, ইটালিতে, যেমনটা ঘটাতে হাত নিশপিশ করেছে ইংলণ্ডের নবদন্তোদ্গত ফাসিস্টদের। বলা যায় না কালক্রমে ইংলণ্ডে যদি এই ফাসিস্টের রাস্তাই প্রশস্ত হয় তা হোলে আন্দামানে লোক-বিরলতা ঘটবে না এবং কৌন্সিলের সকল সভ্যেরই বুলি সমান নম্রমধুর হয়ে উঠবে, যেমন হয়েছে জর্ম্মনিতে, যেমন হয়েছে ইটালিতে।

দূরে যেতে হবে না, কাছেই দেখলেম এণ্ড্রুজকে। তিনি নির্ভয়ে স্বজাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই স্বজাতির সম্মান-বৃদ্ধি করেছেন, সেজন্যে তাঁর দেশের লোকের অনেকেই যতই বিরক্ত হোক, তাঁকে লিঞ্চ করেনি। জর্ম্মানিতে থাকলে তাঁর সরকারী বাসা নির্দ্ধারিত হোত কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ভাবটা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। ভারতের প্রতি তাঁর আনুকূল্যটাকে তারা আপনাদের সহজপ্রাপ্য ব'লেই অনায়াসে হাত পেতে নিয়েছে কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তিনি যে অন্যায়কারী স্বজাতির বিরুদ্ধে রায় দিতে পেরেছেন এই শিক্ষাটাই নিজেদের আচরণে তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে।

পলিটিক্সের উত্তেজনা থেকে দূরে কেন থাকি তার কারণ তোমাকে বলা বাহুল্য ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান উপলক্ষ্যে আমি আমার আচরিত রীতির ব্যতিক্রম কেন করেছি তোমার কাছে তা স্পষ্ট করার জন্যেই এতখানি বলতে হোলো।

প্রথমেই ব'লে রাখি হিন্দুর তুলনায় ভাগবাটোয়ারার হিসাবে মুসলমান কতগুলো পদ ও সুবিধা পাবে তাই গণনা ক'রে ক্ষুব্ধ হোতে লজ্জা বোধ করি। এই রকম কাড়াকাড়ি নিয়ে আমাদের মধ্যকার বিরুদ্ধতা আরো তীব্র ক'রে তোলা আমার মতে নির্ব্বুদ্ধিতা। এ সমস্তই বাহ্য এবং তুচ্ছ। কিন্তু যখন থেকে আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক বিভাগের সঙ্কল্পমাত্র হয়েছে তখন থেকে পরে পরে যে সকল বিভীষিকা প্রবলবেগে উদ্যত হোতে পারল, এবং অবশেষে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে রকম ক্রুর দৃষ্টিপাত রূঢ়ভাবে সম্ভবপর হোলো তখন ব্যাপারটাকে ভারতশাসনের দ্যূতক্রীড়ায় একটা পোলিটিকাল চালমাত্র ব'লে আমার মতো সাহিত্যিকের পক্ষেও চুপ করে থাকা নিতান্ত কষ্টকর হয়ে উঠল। নইলে আমাকে এই আলো-চনার ক্ষেত্রে কিছুতেই টানতে পারত না। রাষ্ট্রশাসনসৌকর্য্যের দিক থেকে নয়, সাধারণ মনুষ্যত্বের দিক থেকে ব্যাপারটাকে বিচার করবার সময় এল। রাষ্ট্রিক ভাগবাটোয়ারা থেকে যে সব অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্চে এ যে সকল দিকেই আমাদের সমাজকে সংস্কৃতিকে শান্তিকে আক্রমণ করবার আয়োজন করছে। এতে মুসলমানের ক্ষতি আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। মুসলমানের সম্বন্ধে দিনে দিনে আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিকে যদি চিরদিনের মতো বিষাক্ত ক'রে তোলে তার মতো সভ্যনীতি-উচ্ছেদক সর্ব্বনেশে অভিঘাত আর কী হোতে পারে? তুমি জানো আমি মুসলমান বিদ্বেষী নই। অনেক শ্রদ্ধেয় মুসলমানের সঙ্গে আমার সখ্য

সহজ ও সুন্দর হয়েছে। জনসাধারণ শ্রেণীভুক্ত বিস্তর মুসলমানের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাদের আমি আন্তরিক স্নেহ করেছি। তাদের আমি আনুকূল্য দিয়েছি এবং তাদের কাছ থেকে আনুকূল্য পেয়েছি। কখনো তারা আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি। বস্তুত সেইজন্যেই বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমি এত উদ্বিগ্ন। পোলিটিকাল পক্ষপাতে যে মনোভাবের সৃষ্টি এবং যে সকল আচরণের উদ্ভব হচ্চে সেটা অব্যাহত থাকলে যে রকম সাম্প্রদায়িক নিন্দনীয়তা ক্রমশই প্রচণ্ড হয়ে উঠবে তার মতো বর্ব্বর ও অরুচিকর আর কিছু হোতে পারে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের ব্যবহারে এমন একটা অদ্ভুত জেদ দেখতে দেখতে বেড়ে উঠছে সেটাকে ছেলেমানুষী ব'লে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতুম যদি না কথায় কথায় সেটা শোকাবহ হয়ে উঠত। একটা দৃষ্টান্ত, মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুশোভাযাত্রায় বাজনা বাজিয়ে চলা। এতদিন এ নিয়ে কথা ওঠে নি আজও না হয় না উঠত; যদি উঠেইছে তা হোলে কিছুক্ষণের জন্যে মসজিদের উপাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে বাজনা না হয় বন্ধ রাখাই হোত, এরকম রফানিষ্পত্তি অত্যন্তই সহজ। কিন্তু যে মনোভাব থাকলে সহজ ব্যাপারও অসাধ্য হয় সেইটেই সব চেয়ে বিপদের বিষয়। খুব সম্ভব হিন্দু শোভাযাত্রীদের হাতে মসজিদের সামনে এলেই ঢাকের কাঠি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে ওঠে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকদের কারো কারো কাছে শুনেছি ঠিক তাঁদের উপাসনাকালে সরস্বতী পূজোর ভাসানের বাজনা উপাসনামন্দিরের সামনে অস্বাভাবিক উদ্যমের সঙ্গে

বেড়ে ওঠে। দেবভক্তি ছাড়িয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নিজের দেবতারই অবমাননা করে। যে কোনো কিছুতে এই বিদ্বেষকে নিরন্তর ও প্রবল ক'রে তোলে বর্ব্বরতার সৃষ্টি হয় তাতেই। আমি তো ছিয়াত্তরে পা দিয়েছি। আমার এই দীর্ঘকালের কেবল শেষ কয়েক বৎসরই সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বুদ্ধির আকস্মিক উত্তেজনা অমানুষিক বীভৎসতার আকারে প্রবল হয়েছে দেখতে পাই। লজ্জা সকলেরই পক্ষে, এবং বিপদ সমস্ত দেশের। এই বিপদের মারাত্মক শিকড় নানাদিকেই প্রসারিত হবার উপক্রম করেছে। আমি সাহিত্যিক, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের কথা উল্লেখ করলেম, অন্য সকল কথা বলতে ধিক্কার বোধ হয়। তাই মনুষ্যত্বের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যেই পোলিটিকাল সভায় উপস্থিত হয়েছি। ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বেদনায় আমাকে থাকতে দেয় নি।

আমার দেশের লোক কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজজাতির প্রতি তোমার শ্রদ্ধা যদি এতই তবে ভারতে ইংরেজশাসনের চিরন্তনতা কামনা করো না কেন? আমার উত্তর এই, ইম্পীরিয়ালিজমের বিরাট জালে জড়িত বিদেশী রাজ্যশাসন ভারতের পক্ষে স্বভাবতই অশুভকর। এম্পায়ার বল্‌তে যদি এক অখণ্ড কলেবর বোঝাত তা হলে তত বেশি ভাবনার কারণ থাকত না। গোয়ালঘর গয়লার এক গৃহস্থালিতে থাকতে পারে কিন্তু গয়লার আত্মীয় পরিবারের সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না। তার মূল্য প্রধানত দুধ জোগাবার, ভার বহন করবার। অত্যন্ত পীড়াতেও তার

বাসিন্দা যদি শিঙ বাঁকায় তা হলে তার ভাঙা কপালের প্রমাণ হতে বিলম্ব হয় না। আজ শতাধিক বৎসর ইংরেজ-শাসনের পরেও গ্রামে গ্রামে যে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আরোগ্য-বিধানের অভাব, পথঘাটের দুর্গতি, শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষীণতা, যে সুগভীর নিরানন্দ, তার দুর্ব্বিষহ পরিব্যাপ্তি চোখের সামনে থেকে আমাকে হতাশ করে দিয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা এদেশে অপরাধবিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে না করেও থাকতে পারিনে। বিশাল রাজ্যের অন্নের সংস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগনিবারণ কী অসাধারণ উদ্যম নৈপুণ্য ও যত্নের সঙ্গে সেখানে নির্ব্বাহ করা হচ্চে তার বিচার করে মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈর্ষ্যা না হয়ে থাকতে পারে না। তার প্রধান কারণ সোভিয়েট রাশিয়া একটি অখণ্ড সজীব কলেবর। তার ভিন্ন অংশে বেদনার ও প্রয়োজনের তারতম্য নেই, ছিন্ন হয়ে যায় নি নাড়ী। সেখানে সোভিয়েট য়ুরোপ এবং সোভিয়েট এসিয়ার মাঝখানে কোনো অসম্মান নেই। একদা ইম্পীরিয়ল আমলে সেখানে অখৃষ্টানের প্রতি খৃষ্টানের উপদ্রবে দেশ বারম্বার রক্তে কলুষিত হয়েছে আজ তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। এই শান্তিময় সভ্যতা আনতে সেখানে দুই শতাব্দী লাগে নি, অল্প কয় বৎসর মাত্র শাসনের এই আশ্চর্য্য ফল। ধনস্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থনীতিই শাশ্বত এবং শ্রেয়, আর ধনসাম্যমূলক অর্থনীতি এতই অশ্রদ্ধেয় যে তার সম্বন্ধে চিন্তা আলোচনা বা গ্রন্থপাঠের স্বাধীনতা পুলিসের দণ্ডাভিঘাতে দমনীয়, শাসন-কর্ত্তাদের এই মনোভাব ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক থাক্।

সোভিয়েট মত প্রচার উপলক্ষ্যে উক্ত গবর্মেণ্ট জনমতের স্বাধীনতাকে যদি দণ্ডপ্রয়োগের দ্বারা দমন করে থাকে তবে সে সম্বন্ধে আমরা বিচার করতে গেলে হাস্যাস্পদ হব। আমি কেবলমাত্র তুলনা করচি সেখানকার সঙ্গে আমাদের দেশের অন্নবস্ত্র শিক্ষা ও আরোগ্যবিধানের। উভয় রাজ্যের এই বিপুল প্রভেদের মূল কারণ, এম্পায়ার নামধারী রাষ্ট্রিক জীবের মধ্যে সেই দ্বিখণ্ডতা জৃম্ভিত যার ভিতর দিয়ে সজীব দেহের স্নায়ুর যোগ নেই, যোগ আছে শাসনবন্ধনের। এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ইংরেজ কর্ত্তারা আপন মহত্ত্বকে খর্ব্ব না করে থাকতে পারে না।

হিন্দু ভারতের পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাংঘাতিকরূপে অনিবার্য্য। আমরা মার খাবার জন্যেই অতি বিশুদ্ধভাবে তৈরি করেছি নিজেকে। আমরা কিমা-করা মাংস, বাঁচবার জন্যে নই, গলাধঃকৃত হবার জন্যেই। আমাদের শতধাবিভক্ত জীর্ণ জনসমাজ কোনো আগন্তুক অকল্যাণকে এ পর্য্যন্ত ঠেকাতে পারে নি। আমরা আত্মঘাতী জাত; বাহির থেকে মারের নানা পথ নিজের হাতে সনাতনী নৈপুণ্যে পাকা করে বাঁধিয়ে রেখেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাভবে অভিভূত হতে হতেও তা নিয়েই শ্লাঘা ক'রে থাকি। মারটাই কেবল পেয়ে এসেছি তার থেকে শিক্ষা পাই নি। ইতিহাসে আমাদের চেয়ে মজবুৎ অনেক জাত মরেছে— আমরাই যে আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা ও অস্বাস্থ্যের কারণগুলোকে সযত্নে সর্ব্বদেহেমনে পোষণ ক'রেও বেঁচে থাকব, আমরা

বিধাতাপুরুষের এত বড়ো আদুরে ছেলে নই। পরের অনুকম্পার পরেই আমাদের পরিত্রাণ যদি নির্ভর করে তবে এই অনুকম্পালাভের জন্যেও শক্তির প্রয়োজন আছে। সেই শক্তির দ্বারা ভিক্ষার লাঘবতা অনেকটা দূর হয়। দুর্ব্বলের অহঙ্কার অত্যন্ত হেয়। সেই ক্লীব অহঙ্কার নিয়ে জোর গলায় আজকাল হুঙ্কার দিয়ে বলি, করব না ভিক্ষে, নিজের জোরেই দাবী সার্থক করব। ভালো কথা, কিন্তু হায় রে, জোড়ভাঙা সমাজে সেই নিজের জোরটা কোন্‌খানে? যত জোর আপনজনকে গালাগালি করতে, পরস্পরকে খর্ব্ব করতে, দলাদলির দ্বারা দলিত করতে দেশের ইষ্ট। যত জোর কেবল কি গলাতেই, যতক্ষণ না সেই গলা বাহির থেকে প্রবলমুষ্টি এসে চেপে ধরে? ইতি [২১-২৮।৭।৩৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

৮।৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগ,
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্য্যে ঘনঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,

বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে, তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল আকাশের দুর্ব্বোধ সঙ্কেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভি নিনাদে।

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এলো ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এলো মানুষধরার দল,
গর্ব্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্ব্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হোলো ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
কবির সঙ্গীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো,
অশুভধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মান-হারা মানবীর দ্বারে,
ক্ষমা ভিক্ষা করো,—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক্ তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী॥

৮৷২৷৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আফ্রিকার উপরে কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছিলে। লিখেছি। কিন্তু কিসের জন্যে বুঝতে পারি নে। আধুনিকের ভঙ্গী আমার অনভ্যস্ত। আমার নিজ দেশী ভাষায় যে রস আছে সেখানে পরদেশীর রসনা পোঁছবে না। ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার সাহসমাত্র নেই। বাংলা কবিতাকে শিক্‌লি বেঁধে পরের হাটে নিয়ে যেতে দুঃখ হয়। তা ছাড়া ধিক্কার বোধ করি খ্যাতির জন্যে হাত পাততে অনাত্মীয়ের দ্বারে। কাঙালপনার বয়স প্রায় কেটে এসেছে। বাংলাভাষার কুলুপমারা এই কবিতা নিয়ে ওদের কী কাজে লাগবে? ইতি
২৭ মাঘ ১৩৪৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১
২৯ মার্চ ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ওখানে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে শুনে খুসি হলুম। এবারে তোমার এখানকার পালা আরম্ভ হবে। কিন্তু সময় খারাপ। হাওয়া চলচে এলোমেলো ভাবে। বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য পাকা হয়েচে, খুসি হয়েছেন কর্ত্তারা,—

কিন্তু একদিন সময় আসবে যখন মোটা অঙ্কে বিল চুকোতে হবে। উপস্থিত সুবিধের খাতিরে রাষ্ট্রের ভারসামঞ্জস্য উল্‌টে দিলে সে খেলায় খেলোয়াড়কে বিপন্ন হতেই হবে। আসল কথা রাষ্ট্রনেতারা যখন সুবুদ্ধির জায়গায় রাগারাগির হাতে হাল ছেড়ে দেন তখন কেবল সওয়ারিদের নয় ভাবনার দিন আসে কর্ণধারদেরও।— প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ যদি তোমার ভাগ্যে জোটে তবে আমাদের ভাগ্যেও সেটা স্পৃহণীয় হবে।...

আফ্রিকার সেই কবিতা তর্জ্জমা করে পাঠিয়েছি। সে তর্জ্জমার উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। আমার বর্ত্তমান সেক্রেটারি সাহেবের প্রবর্ত্তনায় অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখাটা স্পেক্টেটরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমিও এক কপি এতদিনে পেয়েচ।

আমাদের একটা নৃত্যাভিনয় হয়ে গেল। ভালো হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস— কিন্তু রুচির বিচারের ধ্রুব আদর্শ নেই —অতএব যার যা খুসি বল্‌তে পারে। এ সকল ব্যাপারে চুপ করে থাকা বা গালমন্দ দেওয়ার মাঝখানে সেতু বেঁধে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। যোগ্য অযোগ্যের বাছাই করাও দুঃসাধ্য। যুদ্ধপর্ব্বের পরে শান্তিপর্ব্বে এইটেই শেষ কথা যে আমার সঙ্গে যার মতে মেলে সেই যোগ্য, যার মেলে না সেই অযোগ্য। ইতি ২৯।৩।৩৭

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

...

৯২

৩ জানুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে দুটো লেখা পাঠাই। একটা আমার কবিতার তর্জ্জমা, ম্যাঞ্চেষ্টর গার্জিয়ানে পাঠিয়েছি, আর একটা আমার জাপানকে লেখা পত্র।— এণ্ড্রুজকে যে চিঠি লিখেছ দেখলুম। পাঞ্জাব-প্রবাস তোমার কাজে লাগবে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারবে। বুদ্ধিমান বাংলার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছ— আর না হলেও চলবে।— পাকা বুদ্ধির ঠেলায় জাতটাকে ফুটির মতো ফাটিয়ে তুলেছে, এইবার পচবার সময় এলো— সেই রঙই ধরেছে। এখানে কেউ কারো চেয়ে কম নয়, অথচ নিজেদের শ্রেষ্ঠতা যথার্থভাবে প্রমাণ করতে না পেরে সংসারে কেবলি হটে যাচ্চে, তাই গাঁজিয়ে উঠচে ঝাঁজিয়ে উঠচে কুৎসা গ্লানি, প্রতিহত অহঙ্কারের তীব্র জ্বালা। নিন্দার বাজারদর অত্যন্ত চড়ে গেছে। আমার মন সরে যেতে চাচ্চে সুদূরে— সেই দূরকে নিজের ভিতরেই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করচি। একটা উপায় সায়ান্স— নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশ-কালের মধ্যে তীর্থযাত্রা করেছি। যে বিশ্বজালে অচিন্তনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোকসূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব, —আমার সমস্ত অন্তঃকরণকে ধরা দিয়েছি তার টানে, সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎপর্যের মধ্যে

রয়েছে কোনো একটা চিরন্তন অর্থ— যে অর্থ বহন করে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।

ভিড় চলেছে আশ্রমে— ছুটির জন্যে মন ব্যাকুল।

সেমন্তীকে কিছুকাল আগে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলুম। সেই চিঠিতে তার সঙ্গে ছবির পাল্লা দিয়েছি— এ প্রতিযোগিতায় আমার জিৎ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই— তবু স্পর্দ্ধা করে চেষ্টা করেছি। সেমন্তীকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো— এবং হৈমন্তীকে। ইতি ৩।১২[১]।[১৯]৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩

২১ জানুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি তো জানো আমার মনের মধ্যে একটা যেন ষড়-ঋতুর পর্যায় আছে, হাওয়া বদল হয় যখন, ফসল যায় বদ্‌লে। একটা সময় আসে যখন মনের উত্তরে হাওয়ার গতি থাকে বাইরের দিকে, সেদিকে আজ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগেছে, পাতা-ঝরেপড়া বনস্পতির শাখায় শাখায় আর্ত্তস্বর জেগে উঠল। তা হোক, সেদিকের দিগন্ত দূর-প্রসারিত, তার ভাষার মধ্যে তরঙ্গিত সমুদ্রের কলকল্লোল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই আমার তো মাঠের ধারে বাসা, তার মধ্যে দিয়ে পায়ে-হাঁটার

সরু পথ, চলেছে সেই পল্লীর দিকে, যার সুখদুঃখের সঙ্গে মিশেছে সবুজ বনের ছায়া, যার সুর গুঞ্জনধ্বনির উপরে ওঠে না। দূর সমুদ্রতীরের আহ্বানে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিতে যাই, নিজের বাণীর সূত্রে সেখানকার সঙ্গে পরিচয়ের সম্বন্ধ গাঁথতে চাই, কিন্তু দুই সূত্রে গ্রন্থি বাঁধবার নৈপুণ্য আমার নেই বলে সন্দেহ হয়। তখন বুঝতে পারি বাইরের বিশ্বে মাঝে মাঝে ভ্রমণ করা চলে কিন্তু বাস করতে হয় নিজের বাস্তুসীমানার মধ্যে। সেখানকার বাস্তুদেবতার বাণী দিয়ে যখন শিল্প সৃষ্টি করি তখন সম্পূর্ণ ভোলা ভালো বাইরের বাজারের কথা, সব দেশের সব কবিরাই তাই করে থাকে। আমাদের সঙ্গে ওদের দেশের তফাৎ এই যে ওদের পরিবেশটাই বড়ো, ওদের আত্মপরিচয়ের পরিপ্রেক্ষণিকা ওদের আপন সীমানার মধ্যেই মস্ত, তার মূল্য অনেক বেশি। মানুষের মধ্যে আপন পরিচয়ের সম্বন্ধ বড়ো করা সত্য করা, বড়ো করে বাঁচা। সেইজন্যে সেই বহুবিস্তৃত পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্যে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজকাল আমার মনে একটা বৈরাগ্য প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। আমার মনে হয় অপরিচিত থাকার গর্ব আর্টিস্টের মানসিক আভিজাত্যের লক্ষণ। অজন্তা গুহার আর্টিস্টরা কেবল যে দুর্গম নিরালোক গুহার মধ্যে আপন বহুসাধনার সৃষ্টিকে সঞ্চিত করেছে তা নয়, নিজেদের নামটা মুছে ফেলে গেছে— নিজের অন্তরাত্মার কাছ থেকে ছাড়া আর কারো কাছে তারা পুরস্কার দাবী করতে হাত বাড়ায় নি। আমার তো ঈর্ষা হয় মনে। বল্‌তে গেলে

আমাদের দেশটা অন্ধকার গুহার মতোই কঠিন সীমাবেষ্টিত—এখানে সেই আলোক নেই যাতে বাইরের দৃষ্টি সঞ্চরণ করতে পারে। কিন্তু এটা তো সত্য, সৃষ্টি তার বেষ্টনের মধ্যে থেকেও সীমাকে বহুদূরে অতিক্রম করে— যেমন করেছে গুহাচিত্রগুলি। এই অতিক্রম করার মানে এ নয় যে প্রাচীরসীমার বাইরে তারা আবিষ্কৃত হবেই, তার মানে এই যে খ্যাতিহীনতার দ্বারা তাদের লাঘব হতে পারে না— সৃষ্টিকর্ত্তারা যখনি তাদের সৃষ্টি করেছে তখনি সেই মুহূর্ত্তটুকুতে তাদের দেনাপাওনা দেশকালের অতীত হয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এ কথাটা কেন বিশেষ করে আজ আমার মনে হোলো সে কথা তোমাকে বলি। আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়। সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল ফলানো কেয়ার করে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বল্‌লেই হয়। প্রথমত বিদেশী হাটে রপ্তানি করবার মাল এ নয়, দ্বিতীয়ত দেশের মাতব্বর লোকেরা এর বিশেষ খাতির করবেন বলে আশাই করি নে, যদি করেন তবে প্রভূত মুরুব্বিয়ানা মিশিয়ে করবেন। অথচ দিন রাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন, যে সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ বলে মনে হয়। অর্থাৎ আছি আমি অজন্তাগুহায়— তার বাইরেকার সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতবি বিভাগে রয়ে গেছে, সুতরাং এখন

ইকবালের কথায় মন দিতে পারব না। এর মৌতাৎ যখন ফিকে হয়ে আসবে তখন ছবি নিয়ে পড়ব, সে আরেক জাতের নেশা, সেও খ্যাতির দাবী রাখে না, অর্থাৎ মাৎলামি করবার অবিমিশ্র স্বাধীনতা দেয়। খ্যাতি যখন না চাইতে আসে, তখন তার আয়োজনের বিশেষ খরচা বেঁচে যায়। ইতিমধ্যে তার পরিচয় পেয়েছি, বিদেশ থেকে নামজাদা অতিথি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এখানকার গীত নৃত্য দেখে বলে গেছেন এমন কিছুই তাঁরা কোথাও দেখেন নি ; সংখ্যাতত্ত্ববিৎ ফিশার বলেছেন এর পরিচয় যদি সিনেমাযোগে সমুদ্রপারে পাঠানো যায় সে একটা বহুমূল্য পদার্থ হবে। কেবল একজন বাঙালী দর্শক বলে গেলেন এরকম নৃত্যকলায় চিত্তের বলহানি করা হচ্চে। ইতি ২১।১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ

৯৪

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সেমন্তীর জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলেম। চার্লির পত্রে তার শেষ খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

জন্মমৃত্যুর মাঝখানকার এই জীবনটা ক্ষণিক জীবন তাতে তো সন্দেহ নেই, অর্থাৎ প্রজাপতির সঙ্গে আয়ুর পরিমাণ নিয়েই তার তফাৎ। মানুষ, অন্তত আমরা অনেকেই এই

ক্ষণজীবনের তরণীকে আয়ুর সীমানা পারের দিকেই লগি ঠেলে চালাচ্চি। তার মানে নিজের ভিতর থেকে সেই অভিজ্ঞতাকে রচনা করতে চাচ্চি অন্যকালে অন্যেরা যাকে আদর ক'রে আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে গেঁথে নেবে। অন্যের অনুভূতির স্রোতে নিজের অনুভূতিকে ভাসিয়ে দিয়ে তাকে দূর ভবিষ্যতের ঘাটে ঘাটে চালান করে দেওয়া, অর্থাৎ এমন ব্যবসা করা, যার পাওনা জমতে থাকে প্রেতলোকের খাতাঞ্চি-খানায়, কারো ভোগে আসে না,— হয়তো সারাজীবন লোকসান দিয়ে যখন ডিভিডেণ্ট ডিক্লেয়র্ড হয় তখন তহবিল হয় অদৃশ্য। অথচ এই পাওনার দাবী নিয়ে যে হাতাহাতি চলে, তা কোম্পানির কাগজের স্বত্বের মকদ্দমার চেয়ে কম উষ্মাজনক নয়, এমন কি এতে পিছন দিক থেকে গুপ্ত ছুরি মারামারিও চলে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন এই মরীচিকা-সম্পদের জন্যে লোভ ছিল প্রবল। সাহিত্যিক ভাষায় যাকে অমরতা বলে থাকে, যার স্বত্বসাব্যস্তের নিশ্চিত দলীল মহাকালের বড়ো আদালত থেকেও সব সময়ে পাওয়া যায় না সেটা আমার নামে রেজেষ্টরি হয়ে গেছে বলে বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে, প্রকাশ্যে না হোক্ মনে মনে তক্‌রার করেছি, এখন তা নিয়ে স্বগত উক্তিতেও সময় নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হয় না। নামের ঝুলিতে যা জমা হয় কী হবে তার দাম যাচাই করে। এতদিন ধরে যে ফসল ফলিয়েছি, যার কিছু উঠেছে মরাইয়ে কিছু ছড়িয়ে আছে ক্ষেতের মধ্যে, সে সমস্ত ভাণ্ডারে তুলে থাকে থাকে ভাগ করে গুছিয়ে রাখবার জন্যে

আমার এই শ্যামলী পাড়ায় একটা উদ্যোগ চলেছে। আমাকে তাতে মাঝে মাঝে মন দিতে হয়, এই কথা ভাবি দানের জিনিষ সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে, যা অন্যের জন্যে উৎসর্গ করা হয়েছে তাকে এলোমেলো করা চলবে না, অন্যের প্রতি সম্মান রক্ষার জন্যেই। কিন্তু কী জানি এই ভাবীকালের সমুদ্র-পারগামী জাহাজে মাল তোলার কাজে আমার মন ক্লান্ত হয়, সেই সঙ্গে বারবার মনে ইচ্ছা জাগে আমার মৃত্যুর পরে যেন স্মৃতিসভার উদ্যোগ না করা হয়। বার্ষিক অনুষ্ঠানের দ্বারা সভাধিবেশনে স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার কৃত্রিম কর্তব্যতা আমাদের দেশে কোনো কালে ছিল না,— ক্রমশ এরকম চেষ্টার মধ্যে জোরগলার ঘোষণাগুলো মিথ্যায় জড়িয়ে আসে, এই সম্ভাবনা মনে করতেও আমার মন সঙ্কুচিত হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে ভোলবার শক্তি আছে— সেই শক্তির ভিতর দিয়েই সত্যের বাছাই হয়, বাইরে থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে সেই শক্তিকে ব্যর্থ করা অন্যায়। এই ভোলার দ্বারাই মানুষ মৃতব্যক্তির অনেক লজ্জা চাপা দিয়েছে। একসময়ে যে শিরোপার জরির কাজগুলো ছিল উজ্জ্বল যদি স্বতই তার জেল্লা কমে যেতে থাকে তবে ক্ষণে ক্ষণে তার প্রদর্শনী করাকে কি সম্মান দেখানো বলে? যদি না কমে থাকে তা হলে স্বতপ্রকাশিত মহিমার উপরে বার্নিশ লাগাবার চেষ্টায় অনেক সময়ে উল্টো ফল হয়।

তোমাকে এই খবরটা দিতে বসেছিলুম, যে আমি সম্প্রতি ক্ষণিক জীবনের ছোটো আয়ুর মাপের পেয়ালায় প্রতিদিনের

রসপানে প্রবৃত্ত আছি, আমার ক্ষণিকার প্রথম কবিতায় যার কথা লিখেছিলুম। দ্বারের সমুখে পাতাঝরা শিমুল গাছ ফুলে উঠেছে ভরে। মধুর লোভে ছোটো বড়ো নানাজাতের পাখী ভিড় করেছে। কিছুদিন পরে ফুল যাবে নিকেশ হয়ে, কচিপাতার পালা আসবে, মধুলোভীদের কাকলী নীরব হবে, তখন উঠবে ওর আপন পাতারই মর্মরধ্বনি। নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবচি, দিনের পাওনা দিন আমাকে দিয়ে যাচ্চে, তার প্রয়াস নেই. তার বোঝা নেই, তার দাম নেই যেমন আমার বাগানের বাতাবীনেবুর গাছে যে রোদ ঝিলমিলিয়ে উঠচে তার কোনো দাম নেই। দাম পাওনার তাগিদে যদি পাড়ায় বেরোনো যেত, দিনের সীমা-পেরোনো সঞ্চয়ের পাকা খাতা নিয়ে পড়তে হোতো, তাহলে দিন হোতো মাটি। আজকাল গান তৈরি করচি, রিহর্সলে বসচি, এ গানের এ কাজের খুশিটুকু ক্ষণিকের মধ্যে পরিমিত, কাল কেউ এ সব মনে রাখবে না, কিন্তু আজ এর মধ্যে যে মধু আছে সে আজকের পক্ষে যথেষ্ট। ইতি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ভারতের পুরাপ্রাচীন ঐতিহাসিক ভগ্নশেষের যে বিবরণ তোমার চিঠিতে লিখেছ পড়ে ভালো লাগল। এই মনে হোলো যে, মানুষ যে একদিন বেঁচে ছিল, তার সহজ জীবন-যাত্রার প্রতিদিনের সঙ্গে আপনার চারি দিককে নানারকম করে মানিয়ে নিয়ে তাতে আপন নানারকম স্বাক্ষর দিয়েছিল এইটে যখন দূরকালের ভিতর দিয়ে অনুভব করা যায় তখন আনন্দ হয়। আমাদের চলতি কালকেই অতীতকালের মধ্যে নতুন করে আবিষ্কার করি, বেঁচে থাকার মূল্য অন্যযুগের কাছ থেকে যাচাই করে নিই। তখনকার একখানা ভাঙা কলসের মধ্যে জীবনযাত্রার সঙ্গে সেকালের ভালবাসার স্বাদ পাই। চীনে কবিদের বাণীতে মানবজীবনের এই প্রতিদিনের পথচলা রাস্তায় প্রত্যক্ষ পদবিক্ষেপ যেমন সহজভাবে দেখতে পাওয়া যায় এমন আর কোনো দেশের কবিতায় দেখি নি। কোনো একটা বড়ো উপদ্রবে মনের দর্পণ যখন বেঁকে চুরে গেছে তখন তাতে সংসারের যে প্রতিবিম্ব ত্যাড়াবাঁকা হয়ে পড়ে তাতে চিরকালের মানুষের সহজ ছবি পাইনে, সবকিছুর সঙ্গে একটা ব্যঙ্গ মিশে থাকে— সেটা হয়তো সেই সময়কার ঐতিহাসিক মেজাজের একটা তীব্র পরিচয় দেয় কিন্তু সেটা সবসময়কার নয়। যথার্থ সবসময়কার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ করতে পার।

আমার মনে হয় আছে— জগৎসংসার থেকে দীর্ঘকাল ধরে মানুষ যে রসকে আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে, বলেছে হাঁ, তাকে সে স্থায়িত্ব দেবার জন্যে এমন একটা রূপ দিতে চেয়েছে যাকে বলা যায় সুসম্পূর্ণ, পর্ফেক্ট্। ইস্ফাহানে যে মসজিদ দেখেছিলেম তাতে মানুষের যে যত্ন প্রকাশ পেয়েছে সে বীর্যবান যত্ন। সুবৃহৎ সুসম্পূর্ণতার জন্যে বিপুল অধ্যবসায়। আমি মুসলমান না হতে পারি এমন কি তার প্রতি বিদ্বেষ থাক্‌তে পারে কিন্তু সেই স্থাপত্যের পরে একটি ওঁ মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে, মানুষ বলেছে হাঁ, স্বীকার করে নিলুম, আমার অমুসলমান মনও তাকে স্বীকার করে। কিন্তু যা অস্বাস্থ্য, যা বিকার, যা মুদ্রাদোষ তা সাইকলজির বিষয়, তা কবিতার নয়। মানুষের বড়ো সাধনা সমস্ত জীবনকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছে, মর্ত্যকে বানাতে চেয়েছে স্বর্গের কল্পমূর্ত্তিতে। সাহিত্য এবং চিত্রকলা প্রথম থেকেই এই কাজে তাকে সাহায্য করতে চেয়েছে। আধুনিকতা অনেক সময়ে এই ইচ্ছাকে ছেলে-মানুষি বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে চিরকালের ছেলেমানুষ আছে, সে অনাবশ্যককে লীলাচ্ছলে বানায়। ছন্দে বন্ধে বাঁকা ভাষায় খামকা মানুষ যে কবিতা লেখে যার মধ্যে অপ্রাকৃত এবং অসংগতও অসংকোচে স্থান পায় সেই খেলাকে কী বল্‌বে? এই খেলাকে খুশির খেলা করতে চাই তার মধ্যে সুন্দরের রস দিয়ে, তাকে কারুশিল্পে মনোলোভন করে। এই হোলো যাকে বলে লিরিক। এপিক হোলো আশ্চর্য্যকে নিয়ে খেলা করা। আর নাট্য হোলো কাল্পনিক

ঘটনাবলীকে এমন করে গেঁথে তোলা যাতে সে আমাদের মনে যাথার্থিকের আবির্ভাব আনে। একেও খেলা বলচি এই জন্যে যে, বাস্তবের মধ্যে ঘটনাগুলির সুসংবদ্ধ বাছাই থাকেনা, তাতে বহু অবান্তরের মিশোল। সংহত সুসঙ্গত ঘটনাগ্রন্থনে যে নিবিড় যাথার্থ্যের রূপ জেগে ওঠে বাস্তবে তা নেই। নাটকে এই যে বাছাইকরা গাঁথুনির কাজ এও শিল্পীর কাজ। এই শিল্পজাত যাথার্থ্যের অনুভূতি যে নিছক সুন্দর হবেই তা নয়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা স্বতই আমাদের বিস্ময়ের আনন্দ দেয়। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়, যথার্থ বড়ো নাটক আর যাই হোক সবটা নিয়ে কখনো অকিঞ্চিৎকর হতে পারে না— তার নিবিড়তা তার বৃহৎ সত্যদৃষ্টি তাকে তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে। আমি যে চীনে কবিতার কথা বল্‌ছিলেম তা সামান্য কিন্তু তুচ্ছ নয়, তার যাথার্থ্য নিরাভরণ সহজরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কবিদের অনেককে দেখি তারা স্পর্দ্ধার সঙ্গে তুচ্ছকে নিয়ে যেন বাহাদুরির চেষ্টা করে— সামান্যকে সহজ আনন্দের স্পর্শমণির ছোঁওয়া দিয়ে অসামান্য করে তোলবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। তারা অলঙ্কারকে অবজ্ঞা করে কিন্তু এই অবজ্ঞাই তাদের অলঙ্কারদম্ভ। সহজজীবনকে সহজচোখে দেখার মতো সুন্দর কিছুই নেই, কিন্তু তাকে নিয়ে গায়েপড়া ওস্তাদীতে মন বিমুখ করে। মহেঞ্জোদারোর ভগ্নশেষের থেকে সব অবান্তর বাদ পড়ে গেছে, তার ইঙ্গিতগুলির মধ্যে কেবল এই সহজ কথাটুকু পাই যে, মানুষ সেদিনও বেঁচে ছিল। প্রাণের কাছে প্রাণের বাণী আশ্চর্য্য। নানাবিধ সঙ্কল্প

নানাবিধ প্রয়াস দিনের থেকে বাদ দিয়ে যখন আমি জানলায় বসে চেয়ে দেখি, বাইরের আমের গাছে বোল ধরেছে, শীত-শেষের রৌদ্রে ঝিলমিল করচে সোনাঝুরির পাতা, গাছের ছায়ায় নাচচে শালিখ, বিনা কাজে বেলা বয়ে যাচ্চে, তখন বুঝি, এই আমার চীনভাষার কবিতা, এই আমার মহেঞ্জো-দারোর হাজার বছর ডিঙিয়ে যাওয়া সহজজীবনের এমন একটি স্পষ্ট আভাস যা নূতন যুগের জীবনলীলার সঙ্গে অনায়াসে মিতালি করতে পারে। ২১।২।৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬

১৪ এপ্রিল ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রখর রৌদ্র, শরীর মন ক্লান্ত। কিছুদিন হোলো Aldous Huxleyর নতুন বইখানি পড়ে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—আধুনিক যুগের চিত্তবিকৃতির ব্যঙ্গ মানুষের পূজার ঘরে যে রকম কুৎসিত উৎসাহের সঙ্গে কালাপাহাড়ি আরম্ভ করেছিল, তাতে ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছিল, ঐ বইটিতে নিত্যকালের হাওয়ায় মানুষের শাশ্বত সাধনার বাণীর স্পর্শ পাওয়া গেল।

আমার জীবনের শেষপর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে

সংক্রামিত হয়ে চলেছে দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্দ্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখিতে পাই নে। জগৎজোড়া গৃধ্নুতার তাড়নায় এক পক্ষে অভ্রভেদী স্পর্দ্ধা অন্য পক্ষে ভূলুণ্ঠিত সেলাম— কী অসহ্য কুশ্রী। ধ্বংস মহাসাগরের মুখের এই ভাঁটার টান একদিন হয়তো থমকে যাবে একদিন হয়তো উল্টো স্রোতের জোয়ার কল্লোলিত হয়ে উঠবে— সেই শুভ লক্ষণ দেখে যেতে পারব কিনা কে জানে। আমাদের কালের প্রথম যুগে যে সমস্ত শ্রদ্ধার দান অযাচিত দাক্ষিণ্যে আমাদের দ্বারে এসেছিল, আজকের দিন অট্টহাস্যে তাদের লাথিয়ে ধূলোয় গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেচে, সেইসঙ্গে তাদের নিত্যতার সম্বন্ধে মানুষের এতকালের বিশ্বাস একটা শ্বাসরোধকর আঁধির মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে চলল। এর নিষ্ঠুর পরিণাম আজ তো দেখচ পৃথিবীর তিনমহাদেশে— এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয় ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে— এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না— মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ

৯৭

২৭ মে ১৯৩৮

মংপু, Mungpoo
দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

তুমি কি গ্রীক তর্জমার বই আমাকে পাঠিয়েছ? এখনো পাইনি, পেলে স্বাদ গ্রহণ করব। মিসেস্ সেলিগ্ম্যানের রচনাটা পড়ে ওঠা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য— কেননা সম্প্রতি আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে। সেই জন্যে নিতান্ত দায়ে না পড়লে চোখ ব্যবহার করতে সাহস হয় না। এমন কি বড়ো চিঠি অনিলকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়— বিশেষত অপরিচিত হাতের অক্ষর। চোখের কাজ অনেক হয়ে গেছে, এখন কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চাই ছবি আঁকার জন্যে। চিত্রলেখার সঙ্গে আমার মিলন হোলো গোধূলি লগ্নে। আসন্ন রাত্রির মুখে, ভেবেছিলুম যাকে বলে হানিমুন, নির্জ্জনতায় তাকে সম্ভোগ করা যাবে— তাকে আচ্ছন্ন করচে কাজে এবং জনতায়— এদিকে চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে আসচে।

ম্যাকনিকলের ঈশোপনিষদের তর্জমা আমার ভালো লাগল না। ঐ উপনিষদটি আমার সব চেয়ে প্রিয়— ওর মধ্যে তত্ত্বের গভীরতা আশ্চর্য্য গভীর। কিন্তু অনুবাদক এর অন্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি। দেখা হোলে বলব— আরো অনেক কথা বলবার আছে। আমরা নামব জুলাইয়ের আরম্ভে। যদি

তার আগেই তোমরা আস এখানে একবার আসতে পারো
ইহি ২৭।৫।৪৫ [১৯৩৮]

তোমাদের

[১৭] জুন ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ধীরেন সবে এসেছে য়ুরোপ থেকে প্রাণের হাওয়া নিয়ে। অনেক সে ঘুরেছে প্রসারিত অভিজ্ঞতাক্ষেত্রে। তার সঙ্গে কথা কয়ে খুব ভালো লাগচে— প্রধান কারণ সে আধুনিকের নেশাগ্রস্ত নয়। তার কথার ভাবে বুঝলুম তার মতে বৈদগ্ধ্যের কুণোমহলে যাকে up to date নয় বলে ভ্রূ বাঁকায় সেটাই চিরকালের মতোই out of date। অনেক কর্মী এবং ভাবুকদের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে সে এইটে বুঝেছে যে idealএর কেবল idiom বদলে দিয়ে তাকে নূতন উপলব্ধি বলে মনে করা য়ুরোপের উদারচিত্ত ত্যাগীদের কথা নয়। খুব একটা আশ্বাস মনে এসেছে। বিশেষত আজ যখন ব্যঙ্গের সুর সত্যকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করচে যার থেকে সভ্যতার চিতার আগুন জ্বলবার লক্ষণ দেখচি। আমাদের দেশে এর ছোঁয়াচ লেগেছে, বড়োর অভ্যর্থনায় ভঙ্গীবিকারকে তারা তারুণ্যের স্পর্দ্ধা বলে ঠিক করে রেখেচে। চরিত্রের

নিষ্ঠাপরায়ণ উদারতাকে উপহাসের আঘাতে হৃতমূল্য করাকেই না ঠকবার ব্যবসা বলে তারা। সেই জন্যেই Aldous Huxleyর নতুন বইখানি পড়ে আমার এত আনন্দ হোলো। তার ভাষায় তার ইঙ্গিতে কোথাও বড়োকে বিদ্রূপ করা হয় নি। এই বড়োই তো চিরকালের বড়ো, আমরা তো একেই মেনে এসেছি— মহৎকে মহৎ বলতে সুন্দরকে সুন্দর মানতে আমাদের তো আনন্দ হয়েছে— ভালোকে নিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলতে আমাদের যে লজ্জাবোধ হয়।— ধীরেন যে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্মের তেজ নিয়ে এসেছে সেই পৌরুষের উৎসাহে অনেকদিন পরে আধুনিক পরিবেষ্টনের চিত্তবিকৃতি থেকে আমাকে যেন চিরপুরাতন সঞ্জীবনী হাওয়ায় জাগিয়ে তুললে — দেহে শক্তি থাকলে দুরূহ সাধনায় বেরিয়ে পড়তুম— মন বেরিয়েছে।— বৌমার শরীরের জন্যে আমাকে তাঁর সঙ্গে আরো অনেকদিন থাকতে হবে। পুরীর পালা শেষ হলে না হয় এখানে একবার এসো। ইতি জুন ১৯৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৯

১৬ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের নিয়ে ক'টা দিন বেশ আনন্দে ছিলুম। এখানে মুখর লোক ঢের আছে কিন্তু কথা কবার লোক নেই বললেই হয়— মনটা যেন উপবাসী থাকে। দেশ জুড়ে নানা কাগজে নানা চেঁচামেচি শুনি— যেন বুড়ো বুড়ো ইস্কুলের ছেলে ছুটি পেয়েছে তারা চেঁচাতে জানে ভাবতে জানে না— এ দেশে বুদ্ধির সুর নেবে যায়। অতএব তোমার উচিত হচ্চে কোনো ছুতোয় এখানে এসে পড়া— তোমাকে পাঞ্জাবীদের কোনো দরকার নেই।

তোমার বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। ইতি ১৬।১০।[১৯]৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০

১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

'মায়ার খেলা'র নৃত্যাভিনয় হবে— তারি সুরের আবর্তে দিনরাত পাক খাচ্ছি। এ ছাড়া এ সময়টা ঘোরতর ভিড়ের

সময়— কোনোখান দিয়ে পালাবার ফাঁক পাইনে। খসড়া সম্বন্ধে লিখব ঠিক করেছিলুম— তখন একটু সময় ছিল— ভয় হোলো পাছে বাংলার আধুনিকরা মনে করে আমি তাদেরই জয়ধ্বনি করছি। এই যুগের মধ্যে যে আবর্তন যে আবিলতা এসেছে আমি জীবন আরম্ভ করেছিলুম তার থেকে দূরের হাওয়ায়— এই ক্ষুব্ধ মনোবৃত্তি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না। তাই ব'লে জানবার কৌতূহল নেই বা তাকে অশ্রদ্ধা করি তা নয় কিন্তু জানবার ভাষাতেই যদি তালা লাগানো থাকে তা হলে হতাশ হয়ে এই সাহিত্য-লীলাটাকেই দোষ দিই কিংবা নিজের অদৃষ্টকে। যা হোক ১৫ জানুয়ারির পরে ছুটি পাব তখন মনে করিয়ে দিয়ো। হৈমন্তী আমাকে পেশোয়ারে আসতে অনুরোধ করেছেন তার থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাকে তাঁর সমবয়সী ব'লে ভুল করেছেন। ইতি ১৬।১২।[১৯]৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

Whitehead পড়ছি— ভালো লাগছে। এইমাত্র তোমার বই পেলুম।

১০১

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

৭ই পৌষের পালা শেষ হোলো। স্তরে স্তরে আমার বকুনি চুকিয়ে দিয়েছি। এখন চলেছে দূরাগত জনতার জল-প্রপাত। ছুটির সুযোগে কৌতূহল মেটাতে আস্‌চে দলে দলে। আমি তাদের লক্ষ্যস্থল। এর মধ্যে আমার লেখাও চলেছে মাতৃভাষায় বিমাতৃভাষায়। দায়ে পড়ে। মায়ার খেলার রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছে— তার পুরোনো জীর্ণ অংশগুলো মেরামত করতে হোলো— প্রায় ২০টা নতুন গান লিখেছি। পুরোনো হাতের সঙ্গে নতুন হাতের বুনোনি মিলচে কি না জানি নে। এলম্‌হর্স্ট এসেছে— লাগছে ভালো— এমন বন্ধু দুর্লভ। ওর সঙ্গে দেশবিদেশে অনেক দিনরাত্রি কাটিয়েছি— মনে পড়লে মন কেমন করে— nostalgiaর বাংলা কী? একসঙ্গে ভ্রমণে বন্ধুত্বের সেতারে যেন সুর বাঁধা হয়ে যায়।— তোমার বই পেয়ে দু চার পাতা পড়বার সময় পেয়েছি— বুঝেছি রীতিমত ভালো বই হয়েছে। এলম্‌হর্স্ট পড়তে নিয়েছে তার পড়া হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছি। ২৮।১২।[১৯]৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২

৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পর্শু তোমাকে চিঠি লিখেছি। কাল তোমার আর একখানা চিঠি পেলুম। বুদ্ধদেবের সমালোচনা পূর্বেই পড়েছি—সে তোমাকে তাদের দলের বেদীতে বরণ করবার উৎসাহ প্রকাশ করছে। দরকার ছিল—কেননা সম্প্রতি সে ঘোষণা করছে আমার সময় চলে গিয়েছে। এখন ভগ্নাবশেষের উপর তাদের সৃষ্টি রচনার জন্যে রাজমিস্ত্রির কাজে তোমাকে পেয়েছে বলে তারা আশ্বস্ত। আজ আমার একমাত্র এই সান্ত্বনা, আমি যাঁদের দলে পেয়েছি—অর্থাৎ যাঁদের সময় আমার মতোই চলে গিয়েছে তাঁদের নাম মুছবে না—আর সম্প্রতি যাঁরা খালি ঘরে ঢুকে পড়েছেন, যথা—কাজ নেই কথাটা শেষ করে। পূর্বেই তোমাকে জানিয়েছি—আজকাল বিষম ব্যস্ত আছি, নানাবিধ প্রচেষ্টায় মনকে চালাতে হচ্ছে একবার এ রাস্তায় একবার ও রাস্তায়—এর থেকে বুঝতে পারবে এখনো এই জীবকে পিঁজরাপোলে চালান করতে দেরি হবে। ইতি ৩০।১২।[১৯]৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৩

১০ জানুয়ারি ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

এবার আমাকে কাজের ভূতে পেয়েছে। এক ভূতে নয়, পাঁচ ভূতে। রাজা মহারাজার আগমন একটা বড়ো ব্যাপার —চক্রবাত্যা। সৌভাগ্যক্রমে ফল খারাপ হয়নি কিন্তু শরীর পড়েছে যেন কাৎ হয়ে। ধাক্কা সামলে ওঠার পূর্ব্বেই কলকাতার বেদরদী বেরসিক অনভিজ্ঞ আত্মাভিমানীদের জন্যে তিন তিনটে নাটক চড়াতে হয়েছে রিহর্সলের কুমোরের চাকে —খ্যাতির জন্যে নয়, অর্থের জন্যে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে এই দুর্গতির অবসান হবে। তারপরে যখন হাঁফ ছাড়বার সময় আসবে তখন তোমার কবিতার সমালোচনা করব। বুদ্ধদেব ভালোই লিখেছে। তার পূর্ব্বেই আমার অভিমত বেরলে খুশি হতুম। গোলেমালে মাথার ঠিক ছিল না। আগন্তুকদের ভিড় চলেচে— আমাকে জনতাতঙ্ক ব্যাধিতে পেয়ে বসেছে। ইতি ১০।১।৩৯

১০৪

*১২ জানুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার বাংলা লেখার তুমি যে তর্জমা করেছ পড়ে খুব খুশি হলুম। মডারন রিভিয়ুতে পাঠিয়ে দেব। এলমহর্স্ট

চলে গেলেন। ভালো লাগল। বন্ধুভাবে ওঁকে খুব নিকটে পেয়েছি। অনেকদিন দেশে দেশান্তরে একসঙ্গে ঘুরেছি এইরকম উপলক্ষ্যে নানা অবকাশে পরস্পরকে বুঝতে পারা সহজ হয়। তা ছাড়া ওঁর কাছ থেকে আমরা যে রকম সাহায্য পেয়েছি এমন আর কারো কাছ থেকে নয়।— তিনটে নাটকের রিহার্সল আমার ঘাড়ে চেপেছে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই শীতের সময় তোমরা যদি আসতে পারতে তাহলে এখানে জমত ভালো।

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

১০৫

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সুরের বোঝাইভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চল্‌তি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাইনে তার মূল্যের আদর্শ। ঐতিহাসিক এক একটা অপঘাতে সাহিত্য-সেতারের কানে মোচড় লাগায়। জানিনে কোন্ নতুন সুরের প্রতি লক্ষ্য করে বেসুরের মাত্রা চড়তে থাকে, কেউবা বলে

পৌঁচেছে সুরে, কেউবা বলে পৌঁছবে। এত দিন যে ধুয়ো বেঁধে গান সাধা চলছিল তার অভ্যাস বদলে যাচ্চে। ধুয়ো সুরকে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস রক্ষা করাটাই অবজ্ঞার বিষয় হয়েছে। পৃথিবীর জমিটা স্থির আছে বলেই তার উপরে আমরা নানাপ্রকার ঘর বাড়ি বানিয়ে এসেছি। যে কারণেই হোক সেই পৃথিবীটা ভূমিকম্পের পৃথিবী হয়ে উঠেছে— মনোলোকের অবচেতন স্তরে যে আগুন চাপা ছিল সে হয়েছে চঞ্চল— আগেকার নিয়মে পাকা ইমারত বানানো চলবে না। মিস্ত্রি-মহলে এই রকমের একটা রব উঠেছে। এখন যে জিনিষটা বানানো হবে সেটা হবে টলমলে বাঁকাচোরা সুষমাহারা, পাঁকে পাথরে সব কিছু মিশিয়ে যাবে তার মধ্যে। সাজানো কিছুর উপরে শ্রদ্ধা নেই— কেননা মনের ভূগর্ভে সব স্তর ভেঙে চুরে উল্‌টে পালটে গেছে। অন্তত মানবলোকের কোনো এক জায়গায় কোনো একদল ভূতত্ত্ববিদ্ এই রকম হিসেব করেছেন। এই নাড়া-খাওয়া অব্যবস্থা এখনো তো অনুভব করচিনে— আমাদের পাড়ায় করবার কোনো সাংঘাতিক কারণ ঘটে নি। কিন্তু এ মুল্লুকে যাঁরা কাঁপন-লাগা পায়ের ছাঁদে পাঁয়তারা সুরু করেছেন— তাঁদের দেখে মনে ভাবনা লাগে— ভালো বুঝতে পারিনে। না বুঝতে পারার কারণ এই যে, অস্থির ইতিহাসের এলেকায় যে চালটার উদ্ভব হয়েছে নকল অস্থিরতার সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। তার কাছে এ নিতান্ত খেলা বলে ঠেকে। সেখানে ধ্রুবর প্রতি বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে একটা বাণীর প্রয়াস আছে—

সেটা ক্রমশ ফুটতে ফুটতে হয়ত একটা নূতন স্তরের ধ্রুবপদে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু অন্যত্র যেটা দেখি সেটার অনেকখানিই চাল, তার চলন গিয়ে ঠোকর খায় সঙ্কীর্ণ সীমায়। কান পেতে থাকি, জিজ্ঞাসা করি এরা কী শোনাতে চায়— কানে আসে গোলমাল, নতুন ফ্যাশানের কলরব। গোলমাল করার চেয়ে সহজ কিছু নেই— যদি সবটাই হয় গোল, মাল কিছুই না থাকে। কোনো এক দেশে ভাঙনের যুগের ব্যাকুলতা যে কাকুতি জাগিয়ে তোলে, তার উদ্ব্যগ্র ভাষা অনেকখানি হয়তো বোঝা কঠিন, কিন্তু বোঝবার একটা কোনো বিষয় তার ভিতরে আলোড়িত হয়, তার অন্তর থেকে বাণীর ইঙ্গিত ফেনায়িত হয়ে উঠতে থাকে— সে ইঙ্গিত আপন মত্ততায় ব্যাকরণেরও বাঁধানিয়ম ভাঙে। বস্তুত সেই ভাঙাচোরার উচ্ছৃঙ্খলতাই তার ঈডিয়ম্‌রূপে কাজ করে। যেখানে বলবার উদ্বেগেই বলবার বেড়া ভাঙতে থাকে সেখানে বেড়া ভেঙেছে বলেই হয় তো রাস্তার নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে অন্তর্গূঢ় আবেগে বলবার কোনো তাড়া নেই কেবল বেড়া ভাঙারই উৎসাহ আছে সেখানে মনে সন্দেহ জাগে।

পাশ্চাত্যজগতে যখন মানুষের মনের মধ্যে কোনো একটা চাঞ্চল্য জাগে তখন ঝড় যেমন অরণ্যের গাছপালার মধ্যে কোলাহল তোলে সেইরকম সেখানকার পুঁথিপাড়ায় জাগায় মুখরতা। অত্যন্ত ঘন সেখানকার পুঁথির ভিড়। তাই হাওয়া জোরে বইলে এক পুঁথি থেকে আর এক পুঁথিতে তোলপাড় সঞ্চারিত হতে থাকে— তৈরি হয়ে ওঠে পুঁথির কোলাহল।

সেই এক এক হাওয়ার কলগর্জন এক একটা পুঁথিগত নাম পায়— সেই নামের বন্ধনে দল বাঁধা হয়। সভ্যতা জিনিষটাই জনতা, এই জন্যে সভ্যদেশে এইরকম উপসর্গ সর্বদা দেখতে পাই।

আমি যখন জন্মেছিলুম তখন এদেশে নবসভ্যতার ভিড় জমে নি। তাই চারদিকে সারি সারি পুঁথির বেড়া ছিলনা। মানুষের বেষ্টন নিষ্ঠুর করে আমাকে ঘিরেছিল— প্রহরীরা ছিল যাকে বলে প্রিমিটিভ, আদিম জাতীয়, আমার সব নিরক্ষর শাসনকর্তা। সেই বেষ্টনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিত পুকুরের জলে বটের ছায়া, আর পাতিহাঁসের সাঁতার কাটা— দক্ষিণ পাড়িতে খাড়া ছিল সারি সারি নারকেল গাছ— নীল আকাশের নিচে কী নিবিড় সঙ্গ পেয়েছিলুম কাউকে বোঝাতে পারব না। অত্যন্ত খুশি হয়েছিলুম— কিন্তু সেই খুশি হওয়া সম্বন্ধে যুগধর্মের কোনো বিশেষ বিধান ছিলনা— হয় তো সাইকো-এনালিসিসের কোনো এক কোঠায় তার কোনো বিশেষ এক আখ্যা ছিল, সনাতন কিম্বা আধুনিক, কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে কোনো পুঁথিপ্রবীণ ছিল না আমার কানের কাছে। পুঁথির কারখানাঘরে সর্বদা যেখানে ছাঁচ তৈরি হচ্চে, ছাঁচ বদল হচ্চে, মাপকাঠি হাতে সাহিত্যিক ইন্‌স্পেক্টর নোটবই পকেটে ঘুরে বেড়াচ্চে সে দেশ ছিল বহুদূরে, দিগন্তের পরপারে। সেই জন্যে ভাষা বানিয়েছি আপন মন দিয়ে, ছন্দ বানিয়েছি যা খুশি তাই। মানুষকে ভালোবেসেছি মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে। সেই সংবেগ ঠেলা দিয়েছে পালের হাওয়ার

মতো কল্পনার তরীতে, কখনো এ বাঁকে কখনো ও বাঁকে, কিন্তু পুঁথিলোকের আইনের সীমানা থেকে দূরে। তাই নিয়ে তখনকার বিধানকর্তারা হেসেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যাও ছিল অল্প, তাদের অট্টহাস্যের জোরও ছিল কম। তখনকার সাহিত্যরাজ্যে রাজত্ব পদার্থটা ছিল খুব হাল্কা। একদল লোক পিঠ চাপ্‌ড়ে বলেছে বাহবা, সেটা আকস্মিক, সেটা মুখ্য কথা নয়। সম্পূর্ণ আমার নিজের গরজে লিখ্‌চি, এই কথাটাকে কোনো বারোয়ারি বাহবা ছাড়িয়ে ওঠবার মতো জোর পায় নি— নিন্দেও ছিল নিতান্ত ভ্যালসা। জোর ফরমাস ছিল না, লেখার আনন্দ ছিল ডুবসাঁতারের আনন্দ— ডাঙা থেকে মুরুব্বির দল ঘন ঘন সাবাস বলে ওঠে নি। তার ফল হয়েছে কী এবং তার মূল্য কতখানি হয়তো এখনো তা নিশ্চিত বলবার সময় হয় নি। যেটা আমার ভালো লেগেছে সেটা নিশ্চিত ভালোই এই বিশ্বাসে জোরে সাবল মারবার কোনো ধাক্কা তখন ছিল না— এই আত্মপ্রত্যয় ছাড়া আর কোনো ধ্রুব আদর্শ যে আছে এখনো তার প্রমাণ হয় নি। কেমন করে হবে? আজ দেখতে পাচ্চি এ বেলায় যাঁরা সমজদার সেজে আইন জারি করে বেড়াচ্চেন ও বেলায় তাঁদের তকমা কেড়ে নেওয়া হচ্চে। এটুকু বুঝেছি এই পুঁথিপাড়ার বাজারদর হিসেব করে যাঁরা নতুন খাতা খুলে কারবার ফেঁদেছেন তাঁদের অদৃষ্ট চলেছে চোখে ঠুলি দিয়ে। এই শীতের দুপুর বেলায় সামনের জানলা খুলে মুকুলে ভরা ঐ আমবাগানের দিকে চেয়ে প্রায়ই ভাবি— জন্মেছি এই পৃথিবীতে, খুব খুশি

হয়েছি— প্রকাশ করেছি নিজেকে আপনা হতে নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে, তাতে মশ্‌গুল্‌ করেছে— বাস্‌ এইখানেই থামা যাক্‌— আর তো কিছু দরকার নেই— পালা তো শেষ হবেই— তারও পরেকার পালার হিসেব কল্পনা করতে বসে ভিতরকার একটা লোভী পাগল— তার সেই হিসেবের উপরে আজ আর আস্থা নেই। এতদিন যেমন যেমন খুশি হয়েছি সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সংস্কার জন্মেছে খুশি করবার জোগান বুঝি হাতে হাতে দিয়ে গেলুম। সেটা স্থায়ী সত্য না হবারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কেই বা স্থায়ী, কীই বা স্থায়ী। অনিশ্চিত দখলের দাবী নিয়ে তবে এত তীব্র ঝগড়া কেন— রাগারাগি কী জন্যে, লোভই বা কিসের? মরীচিকার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে আদালতে নালিশ?

এই টলমলে অবস্থায় এখনো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের— গান আর ছবি। এদের উপরে বাজারের বস্তাবন্দীর ছাপ পড়েনি। যদিও আমার গান নিয়ে বচসার অন্ত নেই তবু সেটা আমার মনকে নাড়া লাগায় না। তার একটা কারণ সুরের সমগ্রতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা চলে না। মনের মধ্যে ওর প্রেরণা ব্যাখ্যার অতীত। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধিতা নিয়ে যে সব যাচনদাররা গানের আঙ্গিক বিচার করেন কোনোদিন সেই সব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমল দিই নি; এ সম্বন্ধে জাতখোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার

পাণ্ডিত্য নেই এ কথা আমার নিতান্ত জানা— তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজবোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারেনি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্দ্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে। গান বচনের অতীত বলেই ওর অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড়ো আইন।✓গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছয়।✓ এই যে জাগরণের কথা বলচি তার মানে এ নয় যে সে একটা মস্ত কোনো অপূর্ব সৃষ্টি সহযোগে। হয় তো দেখা যাবে সে একটা সামান্য কিছু— কিন্তু আমার কাছে তার সত্য তার অকৃত্রিম বেদনার বেগে। কিছুদিন পরে তার তেজ কমে যেতে পারে, কিন্তু যে সম্ভোগ করেছে তাতে তার কিছু আসে যায় না যদি না সে অন্যের কাছে বকশিশের বাঁধা বরাদ্দ দাবী করে। নতুন রচনার আনন্দ আমি পদে পদে ভুলি, গাছ যেমন ভোলে তার ফুল ফোটানো। সেই জন্যে অন্যেরা যখন ভোলে সে আমি টেরও পাই নে। যে ছন্দ উৎস বেয়ে অনাদিকাল ধরে ঝরচে রূপের ঝরনা তারই যে কোনো একটা ধারা এসে যখন চেতনায় আবর্তিত হয়ে ওঠে এমন কি ক্ষণকালের জন্যেও, তখন তার যে জাদুতে কিছু-না রূপ ধরে কিছু একটার, সেই জাদুর স্পর্শ লাগে কল্পনায়— যেন ইন্দ্রলোকের থেকে বাহবা এসে পৌঁছয় আমার মর্ত্যসীমানায়— সেই দেবতাদের উৎসাহ

যে দেবতারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁরা কড়ি মূল্য দেন, কিন্তু সে স্বর্গীয় কড়ি।

এই যা সব বকচি তা এখনকার হিসাবে শোনাচ্চে অত্যন্ত অবাস্তব— বিশেষত এর মধ্যে রূপক এবং ভাষার অলঙ্কার এসে পড়চে। ওটা আমার মজ্জাগত অভ্যাস। পারো যদি ওসব বাদ দিয়ে পোড়ো। আর একটু স্পষ্ট করে বলি। গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা, তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে, প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না। আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি, ভৈরবী রাগিণীতে :—

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
হে গরবিনী।

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারম্বার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে, এই বারম্বারের অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলঙ্কার। এই দূরবিলাসী গাইয়েটাকে অবাস্তবের নেশাখোর বলে যদি অবজ্ঞা করো, এই গরবিনীকে যদি দোক্তা খেয়ে পানের পিক ফেলতে দেখলে তবেই তাকে সাঁচ্চা বলে মেনে নিতে পারো, তবে তা নিয়ে তর্ক করব না— সৃষ্টিক্ষেত্রে তারো একটা জায়গা আছে,

কিন্তু সেই জায়গাদখলের দলিল দেখিয়ে আমার সুরলোকের গরবিনীকে উচ্ছেদ করতে এলে আমি পেয়াদাকে বলব ওকে তাড়িয়ে তো কোনো লাভ নেই। কেননা ঐ আঁচলে পানের পিকের ছোপলাগা মেয়েটা জায়গা পেতে পারে এমন কোনো ঘোর আধুনিক ভৈরবী রাগিণী হাল আমলের কোনো তানসেনের হাতে আজো তৈরি হয় নি। এই সুরে যে চিরদূরত্ব সৃষ্টি করে সে অমর্ত্যলোকের দূরত্ব, তাকে অবাস্তব বলে অবজ্ঞা করলে বাস্তবীকে আমরা তাঁদের অধিকার স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে যাব, এবং গির্জেতে গিয়ে প্রার্থনা করব ত্রাণকর্তা এদের যেন মুক্তি দেন।

গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ তার ভালোমন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু এগুলোকে পুলিস কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি— গানে তার বাধা দিয়েছে— তার চারদিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি যা কিছু অবান্তর যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত আকস্মিক। অথচ জগতে সবকিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন, আবর্জনা; তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা এমন বেআইনী বিধি মানতে মনে বাধচে। অন্তত গানে এ কথা ভাবতেই পারি নে। আজকালকার য়ুরোপে হয় তো সুরের ঘাড়ে বেসুর চড়ে বসে ভূতের নৃত্য বাধিয়ে বসেছে। আমাদের আসরে এখনো এটা পৌঁছয় নি— কেননা আমাদের পাঠশালায় য়ুরোপীয় গানের

চর্চ্চা নেই। নইলে এতদিনে বাংলায় নকল বেতালের দল কানে তালা ধরিয়ে দিতে কসুর করত না।

যাই হোক যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান। একেই বুঝি এখনকার সাইকলজি বলে এস্‌কেপিজ্‌ম্‌।

আর আছে আমার ছবি। কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল। আমার এই রেখানাট্যের নটী আর কারো চোখে ধরা দেয় কিনা তার সঠিক খবর পাইনে। ইংলণ্ড থেকে তুই একটা প্রেসনোটিস্ বেরিয়েছে—নিন্দে করে নি— তুই একটাতে আছে পেটভরা রকমের প্রশংসা। প্যারিসে একদা এর চেয়ে বেশ উঁচু গলায় বলেছিল বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এই প্রশংসা আমার মনকে আঁকড়ে ধরে নি, মুক্ত আছে মন, আমার ছবির প্রশংসা টেঁকসই কিনা সে তর্ক বাজারে ওঠে নি, আমার মনেও না। আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাহু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমার কাছে এই অদ্ভুত প্রকাশলীলার আনন্দই যথেষ্ট। ত্রিপুরার পরলোকগত রাধাকিশোর মাণিক্যকে গবর্মেণ্ট যখন প্রথম মহারাজ উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি বলেছিলেন, আমি তো আমার আপন প্রজার কাছে মহারাজাই, আমার এ পদ চিরস্থায়ী। কিন্তু সরকার বাহাদুর যে উপাধি দেবেন, সে দিতেও পারেন আবার কেড়ে নিতেও পারেন— কী বা তার দাম! আমার ছবির খ্যাতির সম্বন্ধেও সেই কথা। তার

গায়ে ছাপ লাগায় যে মানুষ ছাপ মোছেও সে। তার চেয়ে অখ্যাতির গৌরবে আছে সে ভালো— আমিই তাকে মাঝে মাঝে দিচ্চি বাহবা।

এতক্ষণ যা বল্‌লুম এ'কে সাইকলজির কোন্ ছাপে লাঞ্ছিত করবে জানিনে। হয় তো বল্‌বে ভীত অহঙ্কারের বৈরাগ্য। আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমি বলব এ জীবন আপন অভিজ্ঞতার প্রান্তসীমায় এসে আজ নতুন হতে চায়, সংশয়ের পুরাতন বলি-পড়া বাকল খসিয়ে ফেলতে তার শখ গিয়েছে— আসুক নববসন্ত, বাইরে নয়, অন্তরের গভীরে। ইতি ১৪।২।৩৯

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিষম ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কখনো শান্তিনিকেতনে কখনো কলকাতায় কখনো এ ঘরে কখনো ও ঘরে চিঠিখানা যখন তখন লিখেছি— এক নক্ষত্রের সঙ্গে আর এক নক্ষত্রের তফাতের সঙ্গেই তুলনীয়— তবুও সবটা মিলে নেব্যুলা গোছের হয়েছে। শরীর ক্লান্ত ছিল বলেই লিখেছি— ওকে একেবারে ডোণ্ট্ কেয়ার করে দিয়ে।

আজ তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। পাতিয়ালার প্রস্তাবটা চিন্তনীয়। একটা কিছু করবার সংকল্প চল্‌ছে।

ওখানে বাঙালীর সংস্রব আছে শুনে সংশয় ঠেকচে। তবু বেড়া ডিঙিয়ে যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা দেখব।

ভাষা পরিচয়টা পেয়েছ কি? এখন এখানে আছেন আওয়াগড়ের রাজা— সমস্ত মনোযোগটা আকর্ষণ করে আছেন —ইনি যেতে যেতেই বিদেশী সমাগমের সম্ভাবনা আছে— বানপ্রস্থের বয়সে এত ভিড় সয় না। ইতি ১৫।২।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তুমি জান চারিদিকের সঙ্গে আমার মনের স্পর্শের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। যাই বলি না কেন বর্তমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পথের বাঁকচুর সে ঘটিয়েছেই সব সময়ে জানতে পারি বা না পারি। আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসা বদল করিনি— বোধ হচ্চে না করবার কারণ এই যে আমার বাসায় জায়গা ছিল যথেষ্ট। জগদীশ বল্‌তেন সাহিত্যের জলচর আমি যদি না হতুম তাহলে বিজ্ঞানের ডাঙায় আমি মাথা তুলে বেড়াতুম। আমার মানসিক চালচলনে বিজ্ঞানের ঝোঁক ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠচে।

আমার হালের লেখার মধ্যে তার প্রভাব প্রবেশ করেছে বলে সন্দেহ হয়, সেই প্রভাবটা যদি ভিতরকার জিনিষ হয় তাহলেই সেটা অকৃত্রিম হতে পারে। তুমি জানো আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলুম তখন আমাদের পরিবার ছিল এদেশের সমাজ থেকে নির্বাসিত— আমরা ছিলুম দ্বীপে রবিন্‌সন ক্রুসোর মতো, হাতের কাছে তৈরি জিনিষ কিছুই পাই নি, সব আপনারা তৈরি করে নিয়েছি— সেই নিজের তৈরি আত্মরচনার মধ্যে বেড়ে উঠেছি সুদীর্ঘকাল ধরে। মনে আছে ছেলেবেলা প্রায় শুনতুম পিরিলি বাড়ির ভাবভঙ্গী ভাষা বেশভূষা আচার ব্যবহার নিয়ে পরিহাস, তারা ভাবতে পারত না এই জিনিষটাই অকৃত্রিম, আমাদের স্বভাবের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে, বাইরে থেকে সাজানো নয়। আমাদের মধ্যে এই যে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা ঘটেছে এটা কাজ করেছে আমার জীবনের সকল বিভাগেই। এমন কি যে ধর্মশিক্ষার মধ্যে জীবন আরম্ভ করেছি সেই ধর্মকেও যতক্ষণ না আপন স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি দিয়ে রূপান্তরিত করতে পারলুম ততক্ষণ তাকে গ্রহণ করতে পারিনি। প্রথম বয়সে কাব্য আরম্ভ করেছিলুম অনুকরণে, বিহারীলালকে, অক্ষয় চৌধুরীকে রেখেছিলুম সামনে, কিন্তু অল্পবয়সেই একদিন কখন বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়লুম; তেতলার ঘরে দুপুর বেলায় সেই হঠাৎ মুক্তির প্রবল আনন্দের কথা আজও মনে পড়ে— অথচ যে কবিতাটা সেদিন আমার নবীন লেখনীকে কুলত্যাগিনী করেছিল তার কাঁচা ছেলে-মানুষি আজকের দিনে কোনো শ্রেণীর কবির পক্ষেই গৌরবের

বিষয় হোতো না। আমাকে আমার স্বভাবের পথ ধরিয়ে দিয়ে নিজে সে কোথায় করেছে অন্তর্ধান। মনে আছে যে প্রবল বেদনায় সেই লেখাটা হঠাৎ উৎসারিত হয়েছিল সেটা অত্যন্ত আমার অন্তম, ভিড়ের লোকের হাতে দিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল— একলা ঘরে বসে সেটা লিখেছিলুম স্লেটে, এবং মুছে ফেলেছিলুম। তারপর থেকে আমার কাব্য-স্বরূপ আপন দেহকে প্রকাশ করেছে আপন প্রাণশক্তির প্রবর্তনায়। এর মধ্যে স্বাভাবিক পরিবর্তন চলে কিন্তু অনুকরণ চলে না। এই ডাঙার শরীর যদি কোনো খেয়ালে জলে সাঁতার দিতে চায় তবে মানুষরূপেই দেয়, রুই মাছ সেজে দেয় না। দেশবিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেচে আমার মনে এবং রচনায়, তাকে স্বীকার করে নিয়েছি, তা আমার কাব্যদেহকে হয় তো বল দিয়েছে পুষ্টি দিয়েছে কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শে তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয় নি। ভিতরের দিক থেকে ভাব গ্রহণ করবার মানসিক আধার প্রশস্ত, কিন্তু বাইরের দিকে যে দেহরূপ আছে তার স্বাভাবিক গঠন একটা চেহারার সীমায় বাঁধা, সেই সীমার মধ্যেই কিছু কিছু তার বাড়া কমা, কিছু কিছু তার অদলবদল চলতে পারে— কিন্তু আগাগোড়া রূপবদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা নয় সেটা আদর্শকে নকল করা। এই জিনিষটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। এই দেখনা কেন, যাচনদার এখনকার কোনো ছবিকে ওরিয়েণ্টাল মার্কা দিয়ে যদি হাটে চালান দেয় তা হলে বুঝব সেটা ম্যুজিয়মের

জিনিষ; কোনো একসময়কার যে প্রাচ্য আর্ট সত্য ছিল সজীব ছিল তারি ছাঁচে ঢালা নকল পদার্থকেই আজ ওরিয়েণ্টাল বলে। অবনের মধ্যে যদি প্রাচ্যশিল্পের প্রেরণা থাকে সেটা ভিতর থেকেই কাজ করবে, তাঁর চিত্র দেহের বাইরে রূপ যদি কেবলি অজন্তা কাংড়াভ্যালি আর মোগল আর্টেরই দাগা বুলানো হতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ী যাচনদারেরা তাকেই ওরিএণ্টাল আর্ট বলে খাতির করবে বটে কিন্তু তাকে স্বভাব-সিদ্ধ আর্ট বলা চলবে না। অবনের আর্টের যদি স্বাভাবিক প্রাণগত অভিব্যক্তি থাকে তবে তাকে একান্ত বিশেষ শ্রেণীগত মার্কার বেষ্টনীভুক্ত করা চলবেই না। তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলচি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়েটের বা অডিনের বা এজরাপাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না। সজীব দেহের আপন চেহারার পরিচয়েই মানুষকে সনাক্ত করা চলে, তার পরে চালচলনে তার ভাবের পরিচয় নেওয়া সম্ভব হয়। যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?

তোমাকে আমি এত কথা বললুম তার মূলে আছে আমার নিজের কাব্যরূপের অভিব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সেই অভিব্যক্তি

নানা পর্বে নানা পথে গেছে কিন্তু সব নিয়ে স্বতই তার একটা চেহারার ঐক্য রয়ে গেল। যুগধর্মের তিলকলাঞ্ছিত হবার লোভে সেটাকে বদলকরা আমার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি এখনকার ইংরেজ কবিদের যে সব নমুনা কপি করে পাঠাচ্চ পড়ে আমার খুব ভালো লাগচে,— সংশয় ছিল আমি বুঝি দূরে পড়ে গেছি, আধুনিকদের নাগাল পাব না—এই কবিতাগুলি পড়ে বুঝতে পারলুম আমার অবস্থা অত্যন্ত বেশি শোচনীয় হয় নি। তুমি যদি এই সময়ে কাছে থাকতে তোমার সাহায্যে বর্তমান সাহিত্যের তীর্থ পরিক্রমা সারতে পারতুম।

আমার পূর্ব চিঠির উত্তরে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে সেটা পড়ে খুব খুশি হয়েছি।

আমার বড়ো বড়ো বহরের চিঠি দেখে মনে কোরো না আমার অবকাশের waste land বুঝি বহুবিস্তৃত। একেবারেই তার উল্টো। আমার জীবনের এই একটা প্যারাডক্স, যখন টানাটানি হয় বেশি তখনি ছড়াছড়ি হয় বিস্তর। ২৩।২।৩৯

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮

৮ মার্চ ১৯৩৯

সকালে উঠেই দেখি
প্রজাপতি একি
আমার লেখার ঘরে
শেল্‌ফের পরে,

মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা,
রেশ্‌মি সবুজ রং, তার পরে সাদা রেখা টানা।
সন্ধে বেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারারাত
কী ভেবেছে কে জানে তা,
কোনো খানে হেথা
অরণ্যের বর্ণগন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা সমস্ত বৃথাই,
ওর সারা জীবনের দিনে রাতে
যাহা ওর অর্থ-জানা সম্পূর্ণ পৃথক তার সাথে।

আমি ভাবিতেছি বসে, এ নিখিলে
যেটুকু আমার প্রাণে কী এক বিধানে গেছে মিলে
আমার জগৎ তাই,
যাহা তার বেশি তাহা একেবারে নাই।
প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যের পরে
স্পর্শ তারে করে
চোখে দেখে তারে
তার বেশি সত্য যাহা তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়,
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর যে কী জিনিষ সে রহস্য জানে কি ও কভু?

আমি যেথা আছি
মন মোর তাহা হতে সত্য লয় বাছি,
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই তো অগম্য হয়ে নিকটেই আছে চারিধারে।
যার কাছে স্পষ্ট তাহা কোথা আছে সেই,—
হয়তো বা এখনি সে আছে এখানেই,
যে আলোকে তার ঘর,
সে আলো আমার অগোচর॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমিয়
জিনিষটা কি বেশি শুক্‌নো
এবং মেটাফিজিক্যাল হয়েছে।
যা অনুভব করি, বা অনুমান করি
তা সবটা বল্‌তে পারি নি।
এর মধ্যে একটা কথা হচ্চে জীবজগতে
এত রকম বোধ আছে যা আমার
বোধের থেকে একেবারে অন্যরকম।
আর একটা কথা, হয়তো এমন কোনো
সত্তা আছে, যা এইখানেই, অথচ
যা অদৃশ্য আলোকে অগোচর,
যার বৃহৎ চেতনায় যা প্রকাশ পাচ্চে

সে আমি ভাবতেই পারচি নে—

যে চেতনার আমি অন্তর্গত।

২৪ ফাল্গুন   রবীন্দ্রনাথ

১৩৪৫

১০৯

১০ মার্চ ১৯৩৯

শান্তিনিকেতন

সকালে উঠেই দেখি

প্রজাপতি এ কী

আমার লেখার ঘরে,

শেলফের পরে

মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা,—

রেশমি সবুজ রং তার পরে সাদা রেখা টানা।

সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ

ঘরে ঢুকে সারারাত

কী ভেবেছে কে জানে তা,

কোনোখানে হেথা

অরণ্যের বর্ণগন্ধ নাই,

তার কাছে গৃহসজ্জা সমস্ত বৃথাই।

সারা জীবনের দিনে রাতে

অর্থ-জানা যাহা ওর, সম্পূর্ণ পৃথক তার সাথে

আমি ভাবি এ নিখিলে
যা আমার প্রাণেমনে আছে মিলে
আমার জগৎ শুধু তাই,
যাহা তার বেশি তাহা একেবারে নাই।
বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি করে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্বমাঝে।

প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্য-পুঁথির পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,
তার বেশি সত্য যাহা, তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়,
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে রহস্য জানে না ও কভু।

পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ,
প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে,
কিন্তু নাহি জানে
লোভের অতীত যাহা সুন্দর যা, অনির্বচনীয়
যাহা প্রিয়,
তার বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে।

আমি যেথা আছি
মন যে আপনটানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই তো অগম্য হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারিধারে।
যার কাছে স্পষ্ট তাহা কোথা আছে সেই,
হয় তো বা এখনি সে আছে এখানেই,
আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি বহু দূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপ পুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর॥
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমিয়

এই দ্বিতীয় সংস্করণটাকে কি বাহুল্যদোষে পেয়ে বসেছে হয়তো এ সব জিনিস একটু কম বোঝানোই ভালো— কারণ এর ধর্মই হচ্ছে স্পষ্ট না বোঝানো।

রবীন্দ্র

১১০

১৭ মার্চ ১৯৩৯

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ছোটোখাটো অনাহূত কাজগুলো আলোতে বাদলা রাতের পতঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে, তারা কোনোটাই বেশি ক্ষণ থাকবার মতো নয়— কিন্তু আলোর যথার্থ উদ্দেশ্যটাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। তুচ্ছ যত দাবি আমার অবকাশের উপর চার দিক থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আমার ভাবনা যায় এলোমেলো হয়ে। নিজের সময়ের প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে কারো সামান্য দরবার ঠেকিয়ে রাখা এদেশে দুঃসাধ্য। কেননা আমাদের সমাজটা অত্যন্ত সস্তাদামী সময়ের বারোয়ারী সমাজ, সবার সময় সকলেরই। পরের অবকাশের তহবিল-ভাঙা দাবির জন্যে কোনো বিশেষ যোগ্যতার অধিকারভেদ নেই।— একই জাজিম পাতা, অনিমন্ত্রণে সকলেই যেখানে খুশি বসবার গুমর করে। অনায়াসে বলতে পারে, আমি সামান্য লোক বলেই কি

আমাকে উপেক্ষা করতে হবে। ভাবতেই পারে না যে জগতে সামান্য লোকের স্থান যদি সামান্য পরিমাণেই না হয় তাহলে অসামান্যদের দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় সদর রাস্তায়।

মাঝে মাঝে নানা খেয়াল মাথায় চাপে। প্রবন্ধ লেখবার বয়স গেছে। তা ছাড়া প্রবন্ধ আপন ভার এবং আয়তন নিয়ে অধিকাংশ রাস্তাতেই চলতে পারে না; চিঠি চলে যায় বিনা-বাঁধানো রাস্তায় বাইসিক্‌লের মতো। চিঠির সেই হালকা চাকায় আমার মন আজকাল চলতে উৎসুক। কিছু দিন থেকেই ভাবছি তোমাকে একখানি চিঠি লিখি— হয়ে উঠছে না। আমাদের দেশে গোধূলির এক রকম সিঁদুরে রঙের আলোকে বলে কনে-দেখা আলো, সেই আলোতেই কনের রূপ খোলে। সেই রকম এক জাতের অবকাশ আছে যাকে বলা যেতে পারে চিঠি-লেখা অবকাশ। সেটা ঘটে সময়ের সান্ধ্যক্ষণে, অর্থাৎ মানসিক দুপুর রোদ্দুরেও নয়, অন্ধকার রাত্রেও নয়, যে প্রদোষের আলোর উপর কাজ-কামাইয়ের ম্লান রং লাগে।

আজ সকালবেলায় জমেছে ঘন মেঘের ছায়া, গত রাত্রির বর্ষণস্মৃতিভারে বাতাস মন্থর, থেকে থেকে বিদ্যুতের ঘোষণা অনুসরণ করে ডেকে উঠছে মেঘ। এই রকম সকালবেলাকার নিবিড় বাদলা সমস্ত দিনের নিষ্কর্মতার ভূমিকা বিছিয়ে দেয়। যাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা স্বভাবতই মধুর অর্থাৎ লিরিক-জাতীয় তুমি যদি তাই হতে তাহলে আজকের এই চিঠিতে মেঘ-মল্লারের সুর লাগত। লিরিকের পর্ব শেষ হয়ে গেছে, ঠিক

মনের দিক থেকে যে তা নয়, বাইরের দিক থেকে। অর্থাৎ অবকাশের দেবতা এই অকেজো সকালে যে-সুরেই তাঁর বীণার তার বাঁধুন আমার এ চিঠি সুরালো হবে না, কেননা আধুনিকতার যুগলক্ষ্মীর সভায় মাধুরী-মদের পেয়ালায় টানাটানি। সাকীই বা কোথায়?

তাহলে লাগা যাক্ সাবধানে যথাসাধ্য ডুল্‌কি চালে "থট্"-এর চালনায়। কী বলব থট্-কে? চিন্তা? অশ্রদ্ধেয়। মনন? নৈব নৈব। বৌদ্ধ বিষয়? রাস্তা বন্ধ। সংস্কৃত ভাষায় একটা শ্লোকে বলেছে, চিতা এবং চিন্তার মধ্যে চিন্তাটাই বেশি করে জ্বালিয়ে মারে। এই অলক্ষুণে শব্দটা বাংলা ভাষায় বিনা চিন্তায় অস্থানে প্রবেশ করেছে। "মনন" শব্দটা ব্যবহার করতে বাধে, কেন না মনন মনের একটা ক্রিয়া, অর্থাৎ thinking— এই ক্রিয়ার পরিণামকেই সাধারণত thought বলে, সে-রকম শব্দ হচ্ছে "মত", কিন্তু ওটা চলেছে থিওরি এবং ওপিনিয়নের প্রতিশব্দ রূপে। মননের বিষয় বা মননের যোগ্য হিসাবে আপাতত মন্তব্য কথাটা চালানো যেতে পারে। কিন্তু thoughtful শব্দের জায়গায় মন্তব্যবান বলা চলবে না। কেননা যাদের মননের শক্তি বা অভ্যাস আছে তারাই thoughtful। সে হিসাবে সে স্থলে মননশীল বা মননশক্তিমান বলাই সংগত হবে। চৈঠিক সাহিত্যের সুবিধে এই যে ভাষান্তর সাধনার সুগম্ভীর দায়িত্ব সে না নিলেও নিতে পারে, এ ভার রইল তাঁদেরই পরে এ কাজটাকে যাঁরা বলেন "বাধ্যতামূলক"।

আমি থট্-কে আপাতত বলব মন্তব্য। যদিও মন্তব্য কথাটা অন্য অর্থে চলে গেছে। যদি বলি সুধীন্দ্রের "স্বগত" বইখানি মন্তব্যে ঠাসা, তাহলে এই বাক্যটা সুধীন্দ্রের ভাষার চেয়েও বেশি দুরূহ হবে বলে মনে করি নে। "কোনো কোনো কাব্য মন্তব্যভারাক্রান্ত, তাতে রসের অংশ কম" বললে বুঝতে বাধবে না। কিন্তু যদি বলি চিন্তাভারাক্রান্ত। তাহলে বোঝাবে দেউলে হবার পথে। মন্তব্য মন্থর ভাষা স্বভাবত আমার নয়— ফলের মধ্যে যেটুকু প্রোটীন খাদ্য থাকে, আমার ভাষায় মন্তব্য অংশ সেইটুকু, আমার ভাষা কোনো দিন প্রোটীন-ঘন পাঁঠার প্রতিযোগিতা করতে পারবে না— অন্তত নিজের বিচারে আমি এটা ঠিক করেছি।

যাক্, যে কথাটা কিছু দিন থেকে ভাবছি সেটা হচ্ছে এই :— মানুষের মনে একটা প্রবল জোয়ার ভাঁটার পর্যায় আছে। মানুষ বলছি যাকে, সে ব্যক্তিগত মানুষ নয়, নেশনগত মানুষ। প্রথম বয়সে যে নেশনের সংস্রবে আমাদের মনে প্রথম উদ্বোধন জেগেছিল, তার চিত্তসমুদ্রে তখন ভরা জোয়ার, তার উদার মনের প্রসারণ সকল দিকেই, মনুষ্যত্বের সকল প্রদেশেই। মনে স্থির করেছিলুম এই প্রসারণ কেবলি ব্যাপ্ত হোতে থাকবে, এই প্রসারণই পাশ্চাত্য সভ্যতার নিত্য স্বভাব। মনের ও হৃদয়ের সকল প্রকার রিপুগত বুদ্ধিগত সংকীর্ণতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যই তার নিরন্তর প্রয়াস। এই জন্যই তখনকার পাশ্চাত্য সাহিত্য এত সহজে আমাদের মনকে অধিকার করেছে— তার বাণী স্বতই সর্বজনের

অভিমুখী। এই প্রেরণার অনুকূলেই আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হয়েছিলুম। তখনকার তরুণের দল ধর্মমত ও সমাজনীতির বাঁধগুলি ভাঙবার জন্য চঞ্চল হোলো, সেই সঙ্গে সঙ্গেই জাগল রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার সাধনা। আমি জানি, আমার মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির যে উৎসাহ উন্মুখ হয়েছিল তাতে সেই সম্প্রসারণ যুগের চরণপাতের ছন্দ লেগেছিল। ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ববর্তী যুগশাসনের শিকল নিঃসংকোচে ছিঁড়ে ফেলবার ভরসা পেয়েছিলুম তখনকার সেই আবেগের আনন্দে।

ভাঁটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে। আমাদের এই কোণের দেশের ছোটো এলেকাতেও অকস্মাৎ তার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করলে। নবীনবয়সীরাও আচার বিচারের সনাতনত্ব নিয়ে স্পর্ধা করতে লাগল— ক্রমে ক্রমে উল্‌টে গেল হাওয়া। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, অচলায়তনের প্রাকারশ্রেণী আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল। এ'কে উত্তুরে হাওয়া বলতে পারি এইজন্যে যে ওটা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকেই। কেননা তখন উত্তর-পশ্চিমের মনোরাজ্যে শীতের সংকোচন দেখা দিতে শুরু করেছে। বুদ্ধিপ্রভাবের বিরুদ্ধে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে লেগে গেছে। তাই আমাদের দেশেও সহজ হোলো বুদ্ধিকে অমান্য করে সংস্কারকে শিরোধার্য করে নিতে, বিচারের স্বাধীনতা চার দিক হতে লাগল অবরুদ্ধ। ভালোমন্দের আদর্শের চেয়ে বড়ো হোলো চোখ বুজে মেনে চলার আদর্শ। দেখতে দেখতে চার দিকে

নানাবিধ নমুনার গুরুমূর্তির আবির্ভাব সংক্রামক হয়ে উঠল। পরলোক পথের পাথেয় মন্ত্রের জন্যে, ইহলোক পথের চালনা-বিধির জন্যে যে কোনো কর্ণধারের হাতে নিজের কান সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ছেয়ে ফেললে সমস্ত দেশকে।

এই তামসিক মনোবৃত্তিরই সাংঘাতিক চেহারা দেখা দিল য়ুরোপে। বড়ো বড়ো নেশন, বুদ্ধি বিদ্যা ও বীর্যে যারা অসামান্যতা দেখিয়েছে, যাদের জয়দৃপ্ত ইতিহাসের শিক্ষাকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও বুদ্ধি অনুশীলনে স্বাধীন কর্তৃত্বের গৌরবকে আমরা এত কাল একান্ত শ্রদ্ধায় স্বীকার করেছি তাদের অনেকেই আজ কেউ বা স্বেচ্ছায় কেউ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরি মুঠোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজেদের নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে এক একটা বড়ো বড়ো জড়পিণ্ড পাকিয়ে তুলতে লাগল। এই নিঃসাড় জড়ত্ব সজীব মাংসকে পাথর-করে-তোলা বীভৎস ব্যাধির মতো মানব-জগতের সর্বত্র সঞ্চারিত হতে চলল। দলে দলে পোলিটিকাল গুরুদের ধনুর্ধর চেলারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধিতার তপস্যায় আজ প্রবৃত্ত। সেই তপস্যায় কৃচ্ছ্রসাধনার অন্ত নেই। তাতে মস্তিষ্ককে, হৃদয়কে আত্মসম্মানকে স্বকৃত ও পরকৃত পীড়নে দ'লে দ'লে করছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অবশেষে আজ, এমন কি, কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে।···স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্যে যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফাসিস্টের সাপ

ফোঁস করে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমি এক জায়গায় লিখেছিলুম, Proud power tries to keep truth safe in its own exclusive hand with a grip that kills it। ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়। তুমি তো জানো আমাদের দেশে এক দল সন্ন্যাসী গাঁজা খেয়ে বুদ্ধিকে বিহ্বল করে, সেটা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ। বুদ্ধিকে তারা বিশ্বাস করে না। ফাসিস্ট দলপতি দলের বুদ্ধির প্রতি একটুও বিশ্বাস রাখে না। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণরা যখন শূদ্রদের একেশ্বর অধিনেতা ছিলেন তখন সর্বাগ্রে তাদের বুদ্ধিকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছিলেন— হুকুম ছিল পদধূলি পাবে, কিন্তু ছাড়া পাবে না, মেনে চলবে কিন্তু ভেবে চলবে না। পৃথিবীতে বোধ হয় সেই সব প্রথম ফাসিস্ট নীতির প্রবর্তনা। কোনো রাষ্ট্রিক শক্তির অক্ষুণ্ণতা যদি নির্ভর করে অধিকাংশের বুদ্ধি-পঙ্গুতার পৃষ্ঠে স্বল্পাংশের বুদ্ধি-স্বাধীনতার নিরাপদে অধিরোহণ তাহলে— থাক্‌গে ও সব কথা, আমরা অন্য কালের লোক।

বাঁধা পথ নেই চিঠির, ও রেলগাড়ি নয়, ও চলে খোলা মাঠের মধ্যে। একটা সাহিত্যের তর্ক তুলব তোমার সঙ্গে, এই কথা মনে করেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভূমিকাটাই চার পা তুলে বেড়া ডিঙিয়ে দৌড়ে চলেছে

আপন খেয়ালে। তার হাঁফ ধরেছে তবেই এবার আসল কথাটার সুযোগ পাওয়া গেল। তবে শোনো। ডিক্টেটরি বুদ্ধি যতই গরম হয়ে ওঠে ততই একেশ্বর নেতারা ভুলে যায় যে, বিধাতার অন্যমনস্কতায় তারা সর্বজ্ঞ হয়ে জন্মায় নি। মানুষকে চালনা করবার নেশা এমনি তাদের পেয়ে বসে যে সকল বিষয়েই মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উগ্রভাবে উদ্যত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ডিক্টেটররা কেবল রাষ্ট্রিক ব্যাপারে নয়, সামাজিক বিধানে নয়, সাহিত্যে আর্টেও আপন শাসন রুদ্ররীতিতে প্রচার করছে। মানুষের এই বিভাগটা ছিল বিশেষভাবে গুণীদের হাতেই, পালোয়ানদের হাতে নয়। আকবর বাদশাও গানের আসরে তানসেনকে মেনে চলেছেন, সেখানে যদি তিনি বাদশাহী করতেন তাহলে সে হত সাংগীতিক ভূতের কীর্তন।

তোমার মনে আছে কি না জানি নে, যখন মস্কৌতে গিয়েছিলুম তখন প্রসঙ্গক্রমে চেকভ-এর প্রতি সমাদর প্রকাশ করেছিলুম। তখনি দেখা গেল সেটা স্থানকাল-পাত্রোচিত হয়নি। চেকভ আধুনিক রুশ-বিদ্রোহ-কালের পূর্বকার লেখক। তিনি বুর্জোয়া, তাঁর রচনা প্রোলিটেরিয়েট যুগের সম্মানের পংক্তিতে বসতে পারে কি না বোধ করি এই সংশয় প্রবল ছিল। আমার আশা ছিল তাঁর চেরি অর্চর্ড নাটকখানির অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটবে। সেটা সম্ভব হোলো না। হিটলারি শাসনেও শুনতে পাই ভালো ভালো বই জাতের ছুতো তুলে তিরস্কৃত। ছবি প্রভৃতিরও সেই দশা।

হিটলারই মেলবন্ধন করেন। নাজি-নীতি অনুসারে সাহিত্যের কে কুলীন কে অন্ত্যজ, তাঁর উপরেই তার নিষ্পত্তির নির্ভর। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত হাস্যকর, সেটা চাপা পড়ে গিয়েছে এর শোচনীয়তার তলে।

সেদিন কোনো এক বাংলা কাগজে দেখা গেল, আমরা এখানকার কবিরা যদিও রাশিয়ান নই, তবুও আমাদের কবিতারও শ্রেণীবিচার হচ্ছে সোভিয়েট আদর্শে; ভাবের দিকে সে রচনা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে নয়, জাতের দিকে সে বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট এই নিয়ে। সেদিন কাগজে দেখলুম— সত্যমিথ্যা জানি নে,— কোনো বিভাগে হিন্দুর চাকরি দুর্লভ হওয়াতে কোনো হিন্দু উমেদার মুসলমান ধর্ম নিয়েছিল। আধুনিকতার বাজারে আন্তরিকতা বা ভালোমন্দ বিচার না করে রচনাকে প্রোলিটেরিয়েট সাজে সাজানো হয়তো কালক্রমে দায়ে পড়ে চলতি হতে পারে। আমাদের সন্তোষ এক কালে কতকগুলি সাঁওতালি গান সংগ্রহ করেছিল, জানি নে সে গান বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট। না জেনেও তার মধ্যে কোনো কোনো গান খুব ভালো লেগেছিল। তার থেকে প্রমাণ হবে কি যে, সেগুলি বুর্জোয়া। যখন ময়মনসিংহগীতিকা হাতে পড়ল খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। শ্রেণীওয়ালাদের মতে এসব কবিতা হয়তো বা প্রোলিটেরিয়েট, কিন্তু আমি তো জাত-বুর্জোয়া, আমার ভালো লাগতে একটুও বাধে নি। ভাঁটার দিনে যখন উপরকার প্রবাহের প্রবল ঐশ্বর্যের চেয়ে তলাকার নুড়িপাথর পাঁকের প্রাধান্য জোর

পেয়ে ওঠে তখন প্রোলিটেরিয়েট নুড়ি বালির আদর্শেই কি নদীর শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করতে হবে। মনুষ্যত্বের আদর্শের চেয়ে জন্মগত শ্রেণীগত আকস্মিকতা বেশি অভ্যর্থনা পায় সমাজের দুর্দিনে। সে দুর্দিন সকল সমাজে সকল সময়েই দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আন্তরিক শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বাহ্যিক শ্রেণীভেদের উপর-নির্ভর করে নি— এখন পাশ্চাত্য মহাদেশের কোনো কোনো প্রদেশে সামাজিক গোঁড়ামি সাহিত্য নিয়েও যদি জাত-ঠেলাঠেলি করতে থাকে তাহলে আমরা তাতে কেন যোগ দিতে যাব।

আমাদের সামাজিক বৈঠক কি এত কাল জাতযাচনদারি নিয়ে যথেষ্ট সরগরম ছিল না— শেষকালে কি জাত মানা মত্ত হস্তী সাহিত্যেরও পদ্মবনে ঢুকে পড়বে। আমি বুঝতে পারি এর আন্তরিক কারণটা। নতুন যুগে সাহিত্য আপন রচনায় আপন কালের বিশেষ সাক্ষ্য দেবে, সময়ের এই দাবিটা মনকে চঞ্চল করেছে। যুগে যুগে গুটি কেটে বেরোয় সাহিত্যের প্রজাপতি, বাণীর ডানায় নূতন রঙের ছাপ লাগিয়ে। কিন্তু সেটা লাগে সহজে প্রাণধর্মের তাগিদে। আমাদের বর্তমান সাহিত্যে তেমনি করেই কি এক দিন নব জীবনের রং লাগে নি। এমন কি অল্পকাল আগে হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন তাঁদের কাব্যে যে প্রসাধন নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন সে কি আজ সম্পূর্ণ বদলে গেল না। তা নিয়ে সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে জাতবদলের কি কোনো তর্ক উঠেছে। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বিদ্যাপতি কিছু মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন, বলেছেন,

"শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল"। এ তো মিলেই থাকে—এ নিয়ে তো সমাজে শৈশব এবং যৌবনের দুই বিরুদ্ধ দলে হাতাহাতি করে না। তার পরে স্বভাবের নিয়মে প্রৌঢ় বয়সও আসে, তখন সাজগোজ আপনি ঘুচে যায়, আগেকার মতো সংকোচ করে সামলে কথা কওয়াটার প্রয়োজন থাকে না। ভাষাটা স্পষ্ট হয়, তার মধ্যে বুদ্ধির পরিণতি দেখা দেয় —কিন্তু তাই বলে যে সেটা বেহায়াগিরি আকারে তা নয়—. তার ভাষার অকুণ্ঠিত তেজটা সহজ; সহজেই সে ভাষা অশ্লীল হয় না যদি সে ভদ্রঘরের মেয়ে হয়। সাহিত্যেও আয়ুর পর্বে পর্বে বয়ঃসন্ধি ঘটে। যদি সত্যই ঘটে তাহলে সেটাকে নিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে গলা চড়াবার দরকার হয় না— দাবি বুঝে দরজি এসে আপনিই মাপের এবং ছাঁটকাটের বদল করে থাকে।

আমাদের সাহিত্যে সেই আন্তরিক পরিণতি স্বভাবত ঘটে নি। প্রকাশে নতুনত্ব হওয়া উচিত এই ব্যগ্রতা মনকে অস্থির করেছে। নকল নতুনত্ব দেখলেই চিনতে পারি কোন্ দোকান থেকে তার আমদানি। কেননা যে সব স্বকীয় রীতি বা মুদ্রাভঙ্গী ব্যক্তিবিশেষে স্বাভাবিক তারও অনুকরণ দেখলে বোঝা যায় এটা আধুনিকতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সাজ। এক বয়সে মোলায়েম মুখে গোঁফ ওঠাবার জন্যে কিশোরদের অধৈর্য দেখা যায় এও তেমনি। এ ক্ষেত্রে এই উপদেশ মানতে হবে যে, আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে গোঁফ আপনিই উঠবে। যদি প্রকৃতির বিশেষ খেয়ালে গোঁফ

একেবারেই না ওঠে তাহলে মেয়েলি মুখের উপর বার বার ক্ষুর বোলাতে থাকো, হয়তো ফল পাবে, হয়তো পাবে না। উপায় কী।

✓ ইতিমধ্যে সাহিত্যের প্রোলিটেরিয়েট বুর্জোয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের ছাপ মারবার যে অদ্ভুত উত্তেজনা আমাদের দেশে দেখা গেল সেও ঐ একই উত্তেজনার অঙ্গীভূত। সাহিত্যে এ-রকম শ্রেণীভেদ অত্যন্ত নূতন সন্দেহ নেই, কেননা অত্যন্ত অসংগত। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে সম্প্রতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুসলমান কর্তৃত্বের উপলক্ষ্যে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক শাসনের যে নূতনত্ব রুদ্রমূর্তি ধরল তার উপরে সোভিয়েট বা নাজি শাসন চালানো যায় যদি তাহলে তো নৌকোডুবি হবে। সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না তা বলি নে কিন্তু সে যদি ফৌজদারি মামলা চালাবার মোক্তারি করতে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় তাহলে দেশ-বিদেশের সাহিত্যে মড়ক লাগবে যে। তাহলে সাম্প্রদায়িক শাসনকর্তারা এক দিন ইংরেজি সাহিত্যকেও আমাদের বিদ্যালয় থেকে নির্বাসন দেবেন— কেননা ঐ সাহিত্য খ্রীষ্টানের সাহিত্য হলেও পৌত্তলিক দেবদেবীদের নামে ও ভাবরসে সমাকীর্ণ, অভিষিক্ত। অবশেষে কোনো এক ভবিষ্যতে যদি দেশে বলশেভিক নীতি ও ব্যবস্থার প্রাধান্য ঘটে তাহলে? এখন তো কর্তাদের আমলে আমার রচনা এখানে ওখানে মুসলমানি ছুরির খোঁচা খায়, তার নাকের সামনে তর্জনীও ওঠে। তখন মার্ক্‌সিজ্‌মের কোন্‌ গোরস্থান সামনে আছে?

এখনো ঘন মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে আর বৃষ্টি হচ্ছে। ইতি ১৭।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১

১১ এপ্রিল ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে আগেই বলেছি গদ্য প্রবন্ধের ভার বইতে আমার মন চায় না। বয়স যখন অল্প ছিল তখন প্রাত্যহিক দেখাশুনোর ফসল সংগ্রহ করে চিঠিতে চালান করতে ভালোবাসতুম। তার প্রধান কারণ মনটা তখন পথে ঘাটে পলাতকা হয়ে বেড়াত, যা দেখত যা শুনত তাতেই তার ছিল ঔৎসুক্য। এই ঘোরাফেরা আর চিঠির বকুনি এক জাতের। তখন বৈঠকে-বসা মেজাজ তাকিয়া হেলান দিয়ে গোঁফে তা দেওয়া শুরু করে নি। দেহের কথা বলছি নে, মনের দিকে দেয় নি তখনো গোঁফের রেখা। সেদিন চিঠিগুলো উঠত অজস্র ফেনিয়ে বাইরের দিকের চলাচলের মন্থনবেগে। ছিন্নপত্রে তার পরিচয় পেয়েছ। বুদ্ধির দোষে ওগুলোকে আস্ত রাখি নি। তখন জানতুম না চিঠি চাষের ফসলের জন্যে নয়, ও আপনি গজিয়ে ওঠে রাস্তার ধারে, চিহ্নিত করে দেয় পথচলার ইতিহাসকে, কেবল শস্যটুকু ঝাড়াই বাছাই করে নিয়ে ডালপালা সব বাদ দিলে ওর মানে যায় চলে।

তার পরে এল প্রবন্ধের মাল বোঝাই করার পালা। প্রধানত এই পর্ব দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে। মন ভারাক্রান্ত ছিল কর্তব্যবুদ্ধিতে। সেই ভার চেপেছিল গদ্যের স্কন্ধে। ফিরে যখন তাকাই তখন কলমটাকে মনে হয় আদিম যুগের অতিকায় জন্তুর দলে। কিছু কাল তার আধিপত্য ছিল। একেবারে তার দিন যায় না, কিন্তু যে আত্মশ্লাঘার অভিব্যক্তির মুখে তার ল্যাজ প্রসারিত হয়ে চলেছিল, তার জোর কমেছে। বাহুল্যে তার আর রুচি নেই।

এখন লিখি লিখতে যদি মন যায়। লেখার পায়ে-চলার পথে চলি আলাপ জমিয়ে যাবার ঝোঁকে। তার দায়িত্ব বহু লোকের কাছে নয়। যাকে ভালো করে চিনি তার সামনে বসে বকে যাওয়া সহজ, কেননা সেও ভিতর থেকে বকিয়ে নেয়। লেখাটার পরিমাণ থাকে দুটি মনের মাপে। যুগ্ম তারা চলে পরস্পরের কাছ থেকে অলক্ষ্যটান ধার করে নিয়ে, চিঠির চাল সেই অলক্ষ্য লেনা-দেনার চাল।

আজ তোমাকে লেখবার উপলক্ষ্য হোলো সুধীন্দ্র দত্তর স্বগত বইখানি পড়ে। পড়তে কিছুকাল ইতস্তত করেছিলুম, ভয় ছিল আমার দেহের বর্তমান অবস্থায় ওটা উপযুক্ত লঘুপথ্য হবে না। কিন্তু জনশ্রুতি ক্রমশই অত্যুক্তির দিকে চলে। সুধীন্দ্রের লেখা দুরূহ এ বাণীর সুর অনবধানে চড়ে যাচ্ছে। তাহলেও সংস্কারটার একেবারেই মূল নেই এও বলতে পারি নে। হয়তো তাঁর গদ্য চলতে চলতে আপন পথ পাকা করে

নিয়েছে, গোড়ায় সে চলত বন্ধুর পথে। তা হোক কিন্তু তাঁর গদ্য কেন যে জলের মতো সহজ কখনোই হোতে পারে না তার কারণ আছে।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আগেকার চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছিলুম বাংলায় "চিন্তা" শব্দটাকে ইংরেজি "থট্" শব্দের জায়গায় বসিয়ে দিতে পারব না। সুধীন্দ্র ওকে "মনন" বলেছেন যে অর্থে ওতে ভাবনার একটা প্রক্রিয়া বোঝায়। কিন্তু যে বিষয়টাকে নিয়ে মনন করা যায় এবং যা মননের পরিণতি তাকে বাংলায় "মত" বললেই ভালো হোত, সে সুযোগ আর নেই। তাই আমি মনে করি "মন্তব্য" শব্দটাতে কাজ চল্‌তে পারবে।

সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন। সাহিত্য-রচনায় কারো বা চিত্তবৃত্তিতে কল্পনার কর্তৃত্ব কারো বা মননের। আরো একটা প্রবর্তনা আছে তাকে বলা যেতে পারে লোকহিতৈষা, তাতে শ্রেয়োবুদ্ধির ফসল চাষ হয়। আমার নিজের লেখা নিজে বিচার করতে সম্মতি যদি দাও তাহলে বলতে হয় আমার লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা। সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সেটা নেহাৎ গৌণ, এমন কি মনে হয় তার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা আছে। মননে যার প্রয়োজনাতীত আনন্দ তার কাছে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পাকা দাম নেই। তাই সুধীন্দ্র অনায়াসে

বলতে পেরেছেন এ বইয়ে তাঁর অনেক পুরোনো মতের সঙ্গে তাঁর এখনকার মত মেলে না অথচ তাই বলে তাঁর কাছে সেগুলো পরিত্যাজ্য বলে মনে হয় নি, কেন না তিনি মনন-বিলাসী। গীতার সঙ্গে এই ভাবটার সুর মেলে, যে গীতা বলেন ফলের দিকে দৃষ্টি রেখো না। যে সাধনার মূল্য সাধনাতেই প্রকাশ পায় বিশেষভাবে সিদ্ধিতে নয় তার এই দশা। কিন্তু তাঁর লেখার কোন্ এক জায়গায় মনে হয়েছিল তিনি "আর্ট ফর্ আর্ট্স্ সেক" মতটাকে বুঝি অমান্য করেছেন। যদিচ তাঁর ব্যবহারে তার প্রমাণ পাই নি। তিনি ভাবতে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসাটাই তাঁর দান। আর্টিস্ট মাত্রেরই চরম শক্তি, প্রকাশ করবার ভালোবাসায়। গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিস্ট। তার একটা পরিচয় পাই ভাষার শব্দের উপরে তাঁর একান্ত অনুরাগে। যারা যথার্থ সাহিত্যিক, শব্দে তাদের নেশা। এই নেশার মৌতাৎ দুই জাতের। রসসাহিত্যে ধ্বনি আর রূপকের ব্যঞ্জনা প্রধান উপকরণ, মনন-সাহিত্যে যাথার্থ্যের সূক্ষ্মবোধ। অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দে তার অর্থটা আভিধানিক চাপে কঠিন দানা বেঁধে গেছে, সে অর্থ ব্যবহারের দ্বারা স্বীকৃত, চেহারার দ্বারা পরিচিত নয়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে প্রয়োজন অনুসারে বিস্তর নতুন শব্দ চালিয়েছেন যাদের অর্থগুলি সজীব। তত্ত্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান আছে তবু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন, তিনি আর্টিস্ট। তাঁর মননের আনন্দ বাছাই-করা শব্দের খেয়ায় চেপে বসেছে। শব্দগুলি অপরিচিত সুতরাং সাধারণ পাঠককে

বুঝতে বাধা দেবে এ দুশ্চিন্তা তাঁকে ঠেকায় নি। তাঁর লক্ষ্য মুখ্যত রচনার প্রতি গৌণত পাঠকদের দিকে। কেননা পাঠক সম্প্রদায়টা স্থাণু নয় সে সচল— সে কোনো এক বিশেষ যুগের শিকলে বাঁধা জীব নয়— না আধুনিকের না সনাতনের। যে লোক বাঁধা যুগের বেতনে লোভ রাখে তার লেখা ঋতু পরিবর্তনের বিদায় হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো খসে পড়ে। কিন্তু জল্পনা করে লাভ নেই। কোন্ রচনা যে চলতি যুগের রথে চলেছে চিরন্তনের গম্যস্থানে তার নিশ্চিত পরিচয় পাব কার কাছ থেকে। "সময়হারা" বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম তার মূলকথাটা এই, বর্তমানে আমরা সময় হারাতে পারি কিন্তু ভবিষ্যতের সুস্বপ্নের পথ হারাই নে, হতভাগার শেষ সম্বল ঐটে, চেম্বরলেনের শান্তির আশার মতো।

ও কথা যাক। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যোগ্য লেখকের প্রধান নির্ভরদণ্ড তার সাহস। তার লক্ষ্য লেখার দিকে, পাঠকের দিকে নয়। সুধীন্দ্রের ঐ গুণটি দেখেছি, তিনি পাঠকদের কাছে পাওনা হিসাব করে দমে যান নি। তাঁর লেখা পড়ে অল্প লোক। রসসাহিত্যে লোকের ভিড় অসহ্য; কাউকে কোন টিকিট দেখাতে হয় না। এই বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার বাংলা দেশের মনকে অলস করে দিয়েছে, এখানে অযোগ্যের অহংকারে কোনো বাধা নেই। মনন-সাহিত্যে অনুশীলনের অপেক্ষা আছে, সেটা কুঁড়ে মনের কর্ম নয়। সেইজন্যে আমাদের দেশে ঐ বিভাগে বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

সুধীন্দ্রনাথের এই বইখানিতে জমেছে তাঁর মনন-সাধনার

ফসল। তাঁর এই সঞ্চয় সম্বন্ধে তিনি আমার মত জানতে চেয়েছিলেন। আমাকে ফাঁকি দিতে হবে। চিঠির কোণটুকুর মধ্যে প্রবেশ করে দায়িত্বের আয়তন খাটো করা সহজ। বিচারকের সঙ্গে লেখকের স্বাজাত্য থাকা চাই, সুধীন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রভেদ আছে অনেকখানি। যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ, কোনো এক কালে হয়তো আমি সেখানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলুম, কৌতূহল যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন সেখানে আমার চলার পথে ঘাস উঠে গেছে। অনেক দিন থেকে আমাকে অন্য রাস্তায় টেনেছে সে তুমি জানো। কর্তব্য-সাধনার কাছে আমাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে তার মধ্যে বই পড়াটাই সর্বপ্রধান। সুধীন্দ্র দেশবিদেশের নানা সাহিত্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন— মনের অভিজ্ঞতা কেবলি বাড়িয়ে চলায় তাঁর শখ— সে শখ নিছক আরামে মেটাবার নয় বলেই আমাদের দেশে মননভূমির ভবঘুরে এত অল্প। আমার জানাশোনার মধ্যে আর এক জন লোক জানি যিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি মননবিলাসী, তিনিও গ্রন্থবিহারী। তিনি অনেক ভাবেন, অনেক পড়েন, অল্প বয়সেও তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি নি। তাঁর লেখা যখন পড়ি মনকে বলি,— মন তুমি কৃষিকাজ বোঝো না— চাষ-আবাদ করা হয় নি, সোনা যদি পেয়ে থাকি সে পড়ে-পাওয়া। এই প্রসঙ্গে প্রমথর রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা আবশ্যক যে তাঁর লেখায় কেবল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নয় প্রাণের সরস প্রবাহ প্রবল।

সুধীন্দ্র নানা বিষয়েই পড়াশুনো করেছেন কিন্তু কোনো বিশেষ বিষয়ে তাঁর মন জমাট বেঁধে যায় নি। জ্ঞানের ও ভাবের রাজ্যে উনি যাযাবর। ওঁর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয় না কিন্তু একটা জায়গায় মেলে সে ওঁর পথ-চলতি মন নিয়ে। যদি উনি শঙ্করাচার্য বা ব্যর্গসঁ-র মতের দুরূহ ভিত্তিতে পাথরের স্থায়ী দেয়াল গেঁথে বসতেন, এমন কি ফ্রয়ডের মনোবিকলন-শাস্ত্রের সব কটা চারিত্রগ্রন্থির কুটিল তত্ত্ব পারিভাষিক সমেত মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক লাইসেন্স পাওয়া কুৎসাপ্রয়োগের যথেষ্ট দাবি করতে পারতেন, তাহলে মাথা হেঁট করে ওঁর পাশ কাটিয়ে চলতুম। যাঁদের বচনে ও ব্যবহারে আছে সবজানার সুগোচর বা অগোচর ঔদ্ধত্য তাঁদের পাণ্ডিত্যকে বরাবর ভয় করে এসেছি, অধিকাংশ সময় অন্ধ শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু আপন লোক বলে মেনেছি মাননিক পথের পথিকদের, দুর্গম যাত্রী হলেও। ভ্রমণের শখ ভ্রমণ-কারীর সংসর্গে অনেকখানি মেটে।

স্বগত বইখানির অনেকটা অংশের আলোচনা যথা নিয়মে করতে পারি নে। কেননা সুধীন্দ্র তাঁর লেখায় যে সব বিদেশী লেখকদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের বই আমি পড়ি নি। সেটা আমার শরীরের ক্লান্তিতে, কাজের ব্যস্ততায়। প্রথম বয়সে যখন ইংরেজি সাহিত্যের রসসত্রে প্রবেশ পেলুম তখন মেতে ছিলুম দিনরাত্রি। সেই ব্যগ্রতার চাঞ্চল্যে মনের সৃষ্টি চলেছিল এগিয়ে। বিষয়বস্তু যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে বেশি করে নাড়া দিয়েছিল চিত্তের মন্থনবেগ। ক্রমে সেটা

নিজের ভিতরকার অজানা সম্পদকে তীরে তুলে এনেছিল। বাইরের পাওয়ার আবেগেই নিজেকে পাওয়ার পালা শুরু হয়। বাইরে থেকে সঞ্চয়টা এর প্রধান জিনিষ নয়, তার চেয়ে ভিতর থেকে নিজের পরিচয়টি আরো বড়ো। সেই আত্মপরিচয়ের এলেকায় এসেছি। এখন সেই আপনাকে পাওয়ার ভূমিকাতেই সকল পাওনাকে আত্মসাৎ করবার সময়। যদি এখনকার কালে জন্মাতুম মনের কী চেহারা তৈরি হয়ে উঠত কেমন করে বলব। সভ্যতার নানা অধ্যায়েই বিচিত্রের মিশ্রণ সৃষ্টির কাজ করতে থাকে। যে সভ্যতায় মিশ্রণের বাধা ঘটে সেখানে আদিম মালমসলা একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির দৈন্য প্রকাশ করে। তাই যে সব তরুণদলের চিত্ত এখনকার যুগের প্রবর্তনায় আলোড়িত আমি তাদের নবজীবনের দৃশ্য দেখছি দূর সমুদ্রের প্রবালদ্বীপের মতো। যদি সময় থাকত তাহলে নৌকো বেয়ে সেখানে কিছুদিনের মতো সায়ের করে আসা যেত। মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাই তোমাদের মতো সিন্ধবাদ নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। সুধীন্দ্র সেই সিন্ধবাদের দলের একজন। এই "স্বগত" বইয়ে তিনি আলাপ জমিয়েছেন। কিন্তু সে আলাপ সম্পূর্ণ আমাদের মতো আনাড়িদের লক্ষ্য করে নয়। তিনি ধরে নিয়েছেন এখনকার কালের সকলেরই কামিংস এজরা পৌণ্ড ঈডিথ সিটওয়েল এলিয়ট অডেন স্পেণ্ডর সম্প্রদায়ের সভাস্থলে অবাধে যাওয়া-আসা আছে। কাজেই তাঁর এই অংশের সাহিত্যালোচনায় সমজদারদের মধ্যে মাথা নাড়ানাড়ি চলবে। আমার মতো

সেকেলে লোক ভালোমানুষের মতো শুনবে আর মেনে নেবে। আমি সম্ভোগ করতে পারি, এই বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে যে সব কথা উঠে পড়ে এমন কি তা নিয়ে তর্কও করতে পারি। একটা দৃষ্টান্ত, যেমন বিষ্ণুদের চোরাবালি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বক্তব্য। ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি। বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারি নি। কিন্তু নিজের মনের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে সুধীন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সমজদারের প্রশস্তিবাদ উড়িয়ে দিতে সাহস হয় না। মনে ভাবি তিনি এখনকার কালের যাচাইখানা থেকে যে কষ্টিপাথর পেয়েছেন সে আমার জানার মধ্যে নেই। তাঁর নির্দেশমতো বোঝবার চেষ্টা করলুম।

একটা সংশয় তাঁর আশ্বাস সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। প্রথম পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতই আমার মনে ছিল না, তাই অর্থ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়। তাতে প্রমাণ হোতে পারে আমি এখনকার দিনের নই। তা নিয়ে লজ্জা করব না কিন্তু এখনকার দিনের সম্বন্ধে লজ্জা করবার কারণ আছে দেখতে পাচ্চি। অত্যন্ত রিরংসার বাস্তব চিত্রের অভিযোগ বাঁচাবার জন্যে সুধীন্দ্র এর মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ ও ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ করেছেন। মেলাতে পারলুম না।···

গদ্যকাব্যে আমার ছন্দোমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রয়োজন ছিল। অনেকের কাছে ভর্ৎসনা পেয়েছি। আমার কৈফিয়ৎ এই, গদ্যকাব্যে যে বিশেষ জাতীয় রসরচনার অবকাশ পাওয়া যায় তার থেকে সাহিত্যকে বঞ্চিত করা অন্যায়।

আমাদের দেশে যোগী সন্ন্যাসী যাঁরা, বিশেষ সাজ ও বিশেষ আচরণের দ্বারা সাধারণের থেকে তাঁরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র, তাই ভেকধারণের সাহায্যে তাঁদের চেনা সহজ। কিন্তু যে যোগী সংসারের মধ্যেই আছেন তিনি যথার্থ মুক্ত, সাজের দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রমের আচারের দ্বারা বদ্ধ নন। প্রথাগত দৃষ্টিতেই যারা দেখতে অভ্যস্ত তিনি তাদের চোখে পড়েন না। অথচ তাঁর মধ্যে সাধনার যে সত্য আছে সেটা প্রচলিত পরিচয় ও পদ্ধতির বাইরে ব'লেই তার মধ্যে থেকে একটা গভীর নিজকীয়তা জেগে ওঠে, সেটা মূল্যবান,— সংসারের সঙ্গে সংসারাতীতের সামঞ্জস্য ঘটিয়েই সেই মূল্য প্রকাশ পায়। গদ্যকাব্য ভেকধারী নয়, তাই তার মধ্যে সাহিত্যের হরিজন ও জাতকুলীন সহজে মিলে গিয়ে কবিত্বের সম্মান পেতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমার মতের সমর্থন এহ বাহ্য, কোনো বিশেষ পরিবেশ থেকে আন্তরিক স্বভাবের প্রেরণায় কাব্য দেখা দিল কি না-দিল সেটা সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। সলোমনের গীতিকে রসিকেরা জাতে ঠেলেন না সে প্রচলিত ছন্দের সাজে সভাস্থলে আসে নি বলেই। মনে পড়ছে যেন কোনো চীন জ্ঞানী বলেছেন যে, যে রাজ্যে রাজত্বকে

অতিশয় দেখা যায় না শ্রেষ্ঠতা সেই রাজ্যেরই। ছন্দ সম্বন্ধে অত বড়ো কথা বলতে মুখে বাধে, কেননা তার সঙ্গে আমার মনের মেলামেশা বাল্যকাল থেকেই, কিন্তু একথা জোর করে বলতে পারি যে, যে-ছন্দ বাইরে থেকে অতিপ্রত্যক্ষ নয়, আসন যার কাব্যের গূঢ় অন্তরে, শাসন তার নেই বলেই তার গৌরব। যে হারুন-অল্‌-রসীদ, আমির-ওমরাওদের মধ্যে সিংহাসনে বসেন তাঁকে তো সেলাম দিয়েই থাকি, রাজদণ্ড ফেলে দিয়ে অগোচরে যিনি সাধারণ প্রজাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান মনে মনে তাঁকে যদি মান দিতে না পারি তবে সেটাতে আপনাকেই খর্ব করি বাদশাকে নয়।

চিঠি লিখে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্বভার হালকা করলুম তার একটা কারণের আভাস দিয়েছি পূর্বেই, অর্থাৎ এই বইখানি সম্বন্ধে সব কথা বলবার মতো আয়োজন আমার ভাণ্ডারে নেই, আর একটা কারণ এই যে, আমার বর্তমান অবস্থায় আপন লোকের পাশাপাশি পায়চারি করতে করতে আলাপ করা আমার পক্ষে সহজ, দশ জনের কাছে জবাবদিহির সতর্কতাটা সর্বদা মনে রাখতে হয় না। ইতি ১১।৪।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১২

[৬ মে ১৯৩৯]

কল্যাণীয়েষু

পুরীতে এসেছি, সে খবর পূর্বেই পেয়েছ। উড়িষ্যায় যাঁরা নতুন রাষ্ট্রনায়ক আমি তাঁদের নিমন্ত্রিত অতিথি। ব্যাপারটার মধ্যে নূতনত্ব আছে।

সেকালে যাঁরা রাজা বা রাষ্ট্রাধ্যক্ষ ছিলেন গুণীদের সমাদরের দ্বারা তাঁরা নিজের দেশকে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমাদৃত করতেন, এই দাক্ষিণ্যে সমস্ত মানবসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা যোগ রক্ষা করতেন, স্বীকার করতেন মানব-চিত্তোৎকর্ষে সর্বজনীন উত্তরাধিকার।

আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়েছি আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবহার। এই ব্যবহারের মধ্যে গুণীদের কোনো স্থান নেই। অর্থনীতি দণ্ডনীতির পরিধিতে যে শক্তির প্রতিষ্ঠা শক্তির সেই বাহ্যরূপটাকেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা চালনা করে থাকেন, তার গভীরে আছে যে চিৎশক্তি তাকে চালনা করবার অধিকার রাষ্ট্রকর্তাদের থাকতে পারে না কিন্তু তাকে স্বীকার ক'রে সম্মান ক'রে রাষ্ট্রমঞ্চকে মহৎ পরিবেষ্টনী দিতে পারে। এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক কিন্তু এইটেই লক্ষ্যের বিষয় যে প্রাচ্য রাষ্ট্রব্যবহারে নম্রভাবে আপন গুণজ্ঞতার গৌরব প্রকাশ উপেক্ষিত হয় নি।

পারস্যে তুমি আমার ভ্রমণসঙ্গী ছিলে। সেখানকার রাজা বহুব্যয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি আতিথ্য পেয়েছিলুম সমস্ত পারস্যদেশের। সে কথা তুমি

জানো। কেবল রাজা নন রাষ্ট্রপারিষদেরাও সকলেই অভ্যর্থনার কাজে নিয়ত মনোযোগী ছিলেন। আমি ছিলেম বিদেশী, আমার রচনার সঙ্গে পারস্যের পরিচয় নিতান্ত অসম্পূর্ণ; আমার খ্যাতিকে পারসিকেরা কেবল বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন মাত্র। সেই বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করে তাঁরা আমাকে যে সম্মান দিয়েছিলেন, সে সম্মান সেই মানবচিত্তের উদ্দেশে যে চিত্ত দেশকালের আশু প্রয়োজনীয় সীমা অতিক্রম করে বিরাট ইতিহাসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি প্রথম যখন ইজিপ্টে গিয়ে পৌঁছলুম তখন কায়রোতে পার্লামেণ্ট অধিবেশনের কাজ চলছিল। সেই কাজের মাঝখানে অবকাশ দিয়ে সেখানকার সদস্যেরা এসেছিলেন আমার প্রত্যুদ্‌গমনে। জাপান য়ুরোপের একনিষ্ঠ চেলা। সেখানে যখন গিয়েছিলেম জনসাধারণ প্রভূত উৎসাহে আমাকে সম্মান দেখিয়েছিল। কিন্তু মিকাডোর তো কথাই নেই একজনো রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে আমার একদিনেরও সংস্রব ঘটে নি। বোধ করি আমি তাঁদের সন্দেহদৃষ্টিতে ছিলুম। আমি যে তাঁদের সন্দেহের যোগ্য সে কথা স্বীকার করি।

পাশ্চাত্যরাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তির একান্ত অহমিকার পরিচয় পাওয়া যায় লীগ্‌ অফ্‌ নেশন্‌সের প্রতিষ্ঠায়। সে বৈঠকে নেশনদের একমাত্র প্রতিনিধি তাঁরাই যাঁরা রাষ্ট্রচালক। শুনেছি পিতৃদেব যখন বোলপুরে প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তার অনতিকাল পূর্বে সেখানে ডাকাতের উৎপাত ছিল। তিনি একজন দস্যু-পতিকেই আশ্রম রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। এই রক্ষাকার্যে

তার সতর্কতা অবিচলিত ছিল কিন্তু শোনা যায় তার ডাকাতি মন নিরুদ্ধ থাকতে পারে নি। প্রভুর অগোচরে তার দস্যুবৃত্তির চাঞ্চল্য দূরে দূরে উপদ্রব করে বেড়িয়েছে। নেশনের স্বার্থরক্ষার প্রতিনিধিরা একত্র জোট বাঁধলেই যে স্বার্থসমষ্টির রং বদলিয়ে সেটা পরার্থবুদ্ধির শুভ্রতা লাভ করবে তা আশা করা যায় না। এ তো সূর্যের আলো নয় যে তার সাতরশ্মি একদল হলেই শুভ্র হয়ে উঠবে। স্বার্থের মিলন ভিতরে ভিতরে ভাঙনের বুদ্ধি সঙ্গে করেই আনে। লীগ্ অফ্ নেশন্‌সে তাই বাঁধন ছেঁড়ার ইতিহাস অধ্যায়ে অধ্যায়ে বেড়েই চলেছে। তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষের ইতিহাসে ক্ষমতালোলুপ নেশনরা দেখতে দেখতে যেরকম দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে এমন আর কোনোদিন হয় নি অথচ লীগ্ তাদের ঠেকাতে পারে নি। কেমন করে ঠেকাবে? আমাদের দেশে একটা কথা আছে, যে-শর্ষে দিয়ে ভূত ঝাড়াবে সেই শর্ষেকেই পেয়েছে ভূতে। স্বার্থের চেয়ে কল্যাণকে বড়ো করে মানবার যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা রাষ্ট্রপতিরা সেই মনীষীদের উপেক্ষা করে নি প্রাচীন ভারতে প্রাচীন চীনে। সেইজন্যে যুদ্ধনীতিতেও মনুষ্যত্বকে স্বীকার করেছিল ভারতবর্ষ আর চীনে সামরিক মনোবৃত্তি অত্যুচ্চ সম্মান পায় নি।

ও কথা থাক্। এখন নিজের কথা বলি। আমার কোনো কর্ম নেই, এখানে আমাকে কারো কোনোই প্রয়োজন নেই, যাঁরা আমাকে যত্ন করে রেখেছেন তাঁরা আমার কাছ থেকে কোনো ব্যাবসায়িক পরামর্শ দাবী করেন নি। আমার শরীর

মনে সমুদ্রের হাওয়া যে শুশ্রূষা শীতল হাত বুলিয়ে দিচ্চে সেটা নূতন দায়িত্বপ্রাপ্ত উড়িষ্যাপ্রদেশের আতিথ্যের প্রতীক। রাষ্ট্রিক কর্মবিধির মধ্যে এ কোনো বাধা পায় নি, একে সঙ্কুচিত করে নি বাজেটসভার কৃপণতা। সার্কিটহৌসের দোতলায় অসঙ্কোচে বসে অবিমিশ্র অকর্মণ্যতায় আত্মসমর্পণ করে দিয়েছি; এখানকার সচিবেরা আমার ক্লান্ত স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করে প্রত্যহ এসে আমার এই অনাবশ্যক দিনযাপনকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্চেন। কঠোর কর্তব্যক্ষেত্রের মাঝখানেও মানবসম্বন্ধের আত্মীয়তা স্বীকার করবার যে মনোবৃত্তি আমাদের দেশের নাড়ীর মধ্যে রয়ে গেছে, সেই কথাটা এখানে এসে বিশেষ করে অনুভব করেছি।

উড়িষ্যার বর্তমান রাষ্ট্রশাসনের ভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রজাবাৎসল্য এবং বিচক্ষণতা দূরের থেকে অনুমান করেছিলুম, এখন নিকটের থেকে অনুভব করচি। এই সঙ্গে মনে একটা আশঙ্কা জাগে যখন দেখি উড়িষ্যার এই সৌভাগ্যের গৌরব সকল দলকে অন্তরে অন্তরে একত্র করতে পারেনি। যখন দূরের থেকে আমরা রাষ্ট্রিক মুক্তির কামনা করেছিলুম তখন স্বপ্নাবেশে তার মহার্ঘ্যতা দীর্ঘকাল কল্পনা করেছি। কিন্তু শুভাদৃষ্টের দান যখন হাতে এল তখন তার মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবার যোগ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্চি নে। তাই দেখা গেল এখানকার একদল ছাত্র আপন নবলব্ধ রাষ্ট্রসম্পদের মর্যাদা নষ্ট করে তাকে সর্বজনের কাছে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে সংকোচ করলে না। তুমি তো য়ুরোপের

বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যায়তনের সঙ্গে সুপরিচিত, তার কর্মধারাকে অবরুদ্ধ করবার জন্য এরকম হাস্যকর বাল্যলীলা কখনো দেখেছ কি? এরকম উপদ্রব এ দেশে আজকাল দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়চে, বিদ্যাসাধনার শান্তি ও গাম্ভীর্য নষ্ট করে দিচ্চে। এই কৌতুকাবহ শোচনীয় কাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল যখন আমাদের পোলিটিশানেরা আপন দলাদলির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তরুণের জয়ধ্বনিতে ছাত্রদের বুদ্ধিস্থৈর্য ও আত্মসংযম রক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে শেখালেন, এমন কি তাদের অন্যায় আবদারকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। সেদিন আমি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করেছিলুম, এবং বুঝেছিলুম এতে করে রাষ্ট্রতপস্যার মূলে লাগিয়ে দেবে দুর্বলতার বিনাশ শক্তি। ছেলেমেয়েদের আবেগ-প্রবণ মনে আত্মশ্লাঘার বেগে তাদের শ্রদ্ধাভক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে গোড়া থেকে শিথিল করে দিয়ে আমাদের কর্মক্ষেত্রের যে হাওয়া দূষিয়ে দেওয়া হয়েছে তার থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাব না।

রাষ্ট্রসম্পদ যাদের অনেককালের সাধনার জিনিষ এবং যাদের কাছে পরমমূল্যবান্ তারা দলগত পরস্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্মান বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত লাগায় বাইরের দিকে, গোড়ার দিকে নয়। আজকের দিনে চেম্বরলনি সঙ্কটে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চেম্বরলেন গায়ে পড়ে ছাতাহাতে ফ্যাসিষ্টব্যূহের মধ্যে মাথা হেঁট করে ঢুকে পড়লেন, যুদ্ধবিভীষিকায় আতঙ্কিত য়ুরোপে আশু শান্তির আশ্বাস সগর্বে ঘোষণা করে দিলেন, পরক্ষণেই

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মাভৈঃ বাণীতে আশ্বস্ত চেকোশ্লোভাকিয়াকে নাজি নখদন্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে দেখেও অনায়াসে লজ্জা সম্বরণ করলেন। তবু তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে যে ইংলণ্ড পূর্বে ও পশ্চিমে অপমানিত, সে তো তাঁকে ও তাঁর দলবলকে সমূলে উৎখাত করবার চেষ্টায় ক্ষেপে ওঠে নি। আত্মসংবরণ করে সকল মতের সকল দলের লোক আজ আশু বিপত্তির সদ্য প্রতিকারের চেষ্টায় সংহত করচে দেশের সমস্ত শক্তি। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রিক দায়িত্ব সাধনের শিক্ষায় যাদের চরিত্র বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি তারা এই ক্ষুব্ধ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি তীব্র স্বরে দোষারোপ করে কলহ করতে করতে দেশের কর্তব্য-বুদ্ধিকে ভেঙেচুরে বিক্ষিপ্ত করে দিত। ওরা কাজকে সফল করবার জন্যে ভুলতে জানে, রফা নিষ্পত্তি করতে পারে, তর্ক বিতর্ক থামিয়ে দিয়ে কোমর বাঁধতে একমুহূর্তে প্রস্তুত হয়। আজ আমরা স্বারাজ্যের আংশিক অধিকার পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত করে পরিপূর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু সে জন্যে আবশ্যক সৃষ্টি করবার শক্তিচালনা। যে শক্তিতে আছে ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য, এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ। মূল্যবান সম্পদকে সৃষ্টি করে তোলার একান্ত উদ্যমে যারা অভ্যস্ত নয় দেশের শুভগ্রহের সেই সকল ত্যাজ্যপুত্রেরা গোড়া থেকেই ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই আপন শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে। বাল্যোচিত আবদারগ্রস্ত তাদের মনোবৃত্তি, অতি

তুচ্ছ বিষয়েও অদ্ভুত জেদের সঙ্গে তারা আপোষ করতে নারাজ। এরাই তেরো কাঠা বালুজমির জন্যে তেরো হাজার টাকার মামলা চালায়।

যারা স্বভাবত অকর্মণ্য তারা অসহিষ্ণু। এই অসহিষ্ণুতাকে ভয় করি। যারা এক লাফে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে সদ্যফল পেতে চায়, তারা ভুলে যায় প্রতিকূলতার মাঝখানে আড্ডা করে বারে বারে প্রতিহত হয়েও অক্ষুণ্ণ ধীর বুদ্ধি দিয়ে ভিতর থেকে বাধাকে আক্রমণ করতে থাকাই বীরোচিত।

অকস্মাৎ আমার চিঠিতে এই যে প্রসঙ্গ উঠে পড়ল তার কারণ আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা কথা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠচে যে যতদিন কন্‌গ্রেস পরিণতি···

[অসম্পূর্ণ]

১১৩

৮ মে ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আজ তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু সেটা চিঠি হয়ে উঠল না। বাংলায় আর একটা শব্দ আছে চিঠা— সেটা দলিলপত্রে ব্যবহার হয়। কিন্তু সাহিত্যের দফতরে সেটাকে টেনে নিতে পারলে কাজে লাগত।

বর্তমান পলিটিক্‌সের চালচলন দেখে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল তাই সেই প্রসঙ্গটার কক্ষপথে পৌঁছবামাত্র

আমার চিঠি তার ভারাকর্ষণে চ্যাপটা হয়ে পলিটিক্‌সের শনিগ্রহের চারদিকে ঘুর খেতে লাগল। দৌড় দিয়েছে লম্বা চালে কিন্তু রস পেলুম না। মাথার মধ্যে মেঘ ঘনিয়েছিল, ভেবেছিলুম হবে একচোট ধারাবর্ষণ কিন্তু হোলো কিনা শিল-বৃষ্টি। তার কারণ কড়া হাওয়া দিয়েছিল মনের আবহমণ্ডলে।

ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগৎ জুড়ে, লুটোপুটি করচে ওষধি বনস্পতি, দোহাই পাড়চে শাখা প্রশাখারা বধির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের ভাঙবেই যাদের মজ্জা দুর্বল, কাঁচা ফল অনেক যাবে পড়ে পাক ধরবার পূর্বেই। একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যারা টিঁকে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে, যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলেঠুলে ঢুঁ মারবে ভিতর থেকে। আমরা সেই অনিবার্যতার সঙ্গে জড়িত তাও জানি, আমাদের জোর লাগাতে হবে তার দক্ষিণে নয় বাঁয়ে দাঁড়িয়ে, তাকে চরমে নিয়ে যাব সবাই মিলে সত্যমিথ্যার ঠেলাঠেলিতে। তবু গীতার শাসন মানতে হবে— ইতিহাসবিধাতার সৃষ্টিকার্যে খাটুনি খাটতেই হবে কিন্তু মনকে রাখতে হবে নিরাসক্ত। বিভ্রান্ত হয়ে চেঁচামেচি করি কেন, হিস্টিরিয়ার হাত পা খেঁচুনি কেন লাগে কথায় কথায়। বাংলাদেশের মনে অল্প একটুতেই ধূলো-ওড়ানো আঁধি লাগে, ঊনপঞ্চাশ পবনের মধ্যে সেইটেই সবচেয়ে দুর্বল হাওয়া। দেখতে সে পালোয়ান, কিন্তু যারা সৃষ্টিকার্যের পক্ষভুক্ত তারা এর হাঁসফাসানিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। যারা অব্যবস্থিত চিত্ত

তাদেরকে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে মহৎকাজে চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি— শান্তোদান্ত-উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।

তোমার চিঠিখানা প্রবাসী সম্পাদকি কারখানায় চালান হয়ে গেছে, কেননা সময় নেই। জ্যৈষ্ঠমাসের ছাপার অক্ষরে দেখতে পাবে।

Family Reunion বইখানি গভীরভাবে ভালো লেগেছে। যদি মন স্থির করতে পারি পরে তোমাকে কিছু লিখব।

আগামীকাল ২৫ বৈশাখ। এখানে আয়োজন চলেচে। ভালো লাগচেনা।

২৪ বৈশাখ ১৩৩৯ [১৯৩৯]

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৪
২৩।২৪ এপ্রিল ১৯৩৯

পুরী

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, নতুন কবিতা লিখতে ফরমাস করেছ কিন্তু ক্লান্ত শরীর মনে নতুনের স্ফূর্তি হয় না— শুকনো ডালের মজ্জা থেকে ফুল রস পাবে কোথা থেকে। অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি কলকাতা থেকে; সার্কিট হাউসের দোতালায় সমুদ্রের সামনে বসে আছি একটা কেদারায়। এ সমুদ্রের প্রাণটা যেন পাণ্ডুবর্ণ,

নীলিমার নিবিড়তা নেই এর জলে, ঢেউগুলো কি আমারি বুকের রক্তদোলনের মতো হাঁফধরা, শ্রান্ত এর একঘেয়ে শব্দ, আর ঐ সারবাঁধা ফেনার পদবন্ধ, নির্জীব পয়ারের চোদ্দ অক্ষর বাঁধা লাইনের মতো তটের উপর গড়িয়ে পড়ছে পুনঃ পুনঃ— ঐ বারবার অনুচ্চ ভাষায় ফিরে ফিরে আসাতে জোর দেয় না— জোরকে নিঃশেষ করে দেয়। বাতাসটা অত্যন্ত ঘুম-পাড়ানে। তন্দ্রাবিষ্ট দিনের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি ঐ সাদা ফেনমালার নিরর্থক গতায়াতের মতো। ভেবেছিলুম এখানে এসে কিছু লিখব, কিছুতেই মন লাগল না লিখতে। এমন সময় তোমার অনুরোধ এল— কেদারায় পড়ে পড়েই লিখলুম। কলমটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হোলো। মনে পড়ছে এইখানেই এই বাড়িতেই লিখেছিলুম— হে আদি জননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার। সমুদ্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল— তার সঙ্গে ছন্দের পাল্লা দেবার স্পর্ধাতেই আমার সেই লেখা। এখনকার লেখায় সেদিনকার মতো উদ্বেল প্রাণের অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতেই পারে না, আছে হয়তো আত্ম-সমাহিত মনের ফলফলানোর নিগূঢ় আবেগ। যদি মনকে কর্মবিতৃষ্ণা থেকে টেনে তুলতে পারি তাহলে তোমাকে আর একটা চিঠি লিখব। ইতি ২৩।৪।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫

২০ মে ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

কিছু কাল আগেই দেশের মন ছিল মরুময়। দিগন্তব্যাপী অনুর্বরতা তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের সম্বন্ধ অবরুদ্ধ করে বহু যুগকে দরিদ্র করে রেখেছিল।

এমন সময় আশ্চর্য অল্পকালেই বৃহৎ শূন্যতার মাঝখানে কন্‌গ্রেস মাথা তুলে উঠল দূর ভবিষ্যতের অভিমুখে, মুক্তির প্রত্যাশা বহন করে, বহুশাখায়িত বিপুল বনস্পতির মতো। বিরাট্ জনসাধারণের মন আশ্চর্য দ্রুতবেগে বদলে গেল; সেই মন আশা করতে শিখল, ভয় করতে ভুলে গেল, বন্ধন-মোচনের সঙ্কল্প করতে তার সঙ্কোচ আর রইল না।

কিছু দিন আগেই দেশ যা অসাধ্য বলেই হাল ছেড়ে বসে ছিল এখন তা আর অসম্ভব বলে মনে হল না। ইচ্ছা করবার দৈন্য আজ ঘুচেছে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশের এত বড়ো পরিবর্তন ঘটতে পেরেছে কেবল এক জন মাত্র মানুষের অবিচলিত ভরসার জোরে, সেই ইতিহাসের বিস্ময়করতা হয়ত ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে অস্বীকৃত হতেও পারবে এমনতরো অকৃতজ্ঞতার আশঙ্কা মনে জাগছে।

সফল ভবিতব্যতার আশ্বাস নিয়ে আজ যে কন্‌গ্রেস

অসামান্য ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিভার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালে কালে তার সংস্কারসাধনের তার সীমাপরিবর্ধনের প্রয়োজন নিশ্চয় ঘটবে তা জানি। কিন্তু চঞ্চল হয়ে বর্তমানের সঙ্গে হঠাৎ তার সামঞ্জস্যে আঘাত করে একটা নাড়াচাড়া ঘটাতে গেলে মন্দিরের ভিৎ হবে বিদীর্ণ। প্রাণবান সৃষ্টির ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেও বড়ো রকম বিপর্যয় সাধন করবার যোগ্য অসামান্য চারিত্রশক্তি এ দেশে সম্প্রতি কোথাও দেখা যাচ্ছে না সে কথা স্বীকার করতেই হবে। দেশের যে একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহাত্মাজীর শক্তিতে গড়ে উঠেছে এখনো সেটাকে তাঁরি সহযোগিতায় রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তুমি জানো আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়—অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীত কালে আড়ষ্ট ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরন্তন করতে পারবে এ কথা আমি মানি নে। বর্তমান কন্‌গ্রেস যত বড়ো মহৎ অনুষ্ঠানই হোক না কেন তার সমস্ত মত ও লক্ষ্য যে একেবারে দৃঢ়নির্দিষ্ট ভাবে নির্বিকার নিশ্চল হয়ে গেছে তাও সত্য হতেই পারে না। কোনো দিনই তা না হোক এই আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু এই কন্‌গ্রেসের পরম মূল্য যখন উপলব্ধি করি এবং এ কথাও যখন জানি এই কন্‌গ্রেস একটি মহৎ ব্যক্তিস্বরূপের সৃষ্টি, তখন হঠাৎ এ'কে সজোরে নাড়া দেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না। তখন এই কথাই মনে হয় এর পরিণতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এর ভিতর

থেকেই সঞ্চারিত করতে হবে। বাইরে থেকে কাটাছেঁড়া করে নয়।

ইতিপূর্বে কন্‌গ্রেসনামধারী যে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আন্দোলন জাগিয়েছিল তার কথা তো জানা আছে। তার আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি, স্বদেশের পরিত্রাণের জন্যে সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল বাইরেকার উপর-ওয়ালার দিকে। পরবশতার ধাত্রীক্রোড়েই তার স্বাধীনতা আশ্রয় নিয়ে আছে এই স্বপ্ন তার কিছুতে ভাঙতে চায় নি। সেদিনকার হাতজোড়-করা দোহাই-পাড়া মুক্তি-ফৌজের চিত্তদৈন্যকে বার বার ধিক্কার দিয়েছি সে তুমি জানো। হঠাৎ সেই তামসিকতার মধ্যে দেশের সুপ্ত প্রাণে কে ছুঁইয়ে দিলে সোনার কাঠি, জাগিয়ে দিলে একমাত্র আত্মশক্তির প্রতি ভরসাকে, প্রচার করলে অহিংস্র সাধনাকেই নির্ভীক বীরের সাধনারূপে। নব জীবনের তপস্যার সেই প্রথম পর্ব আজো সম্পূর্ণ হয় নি, আজো এ রয়েছে তাঁরি হাতে যিনি একে প্রবর্তিত করেছেন। শিবের তপোভূমিতে নন্দী দাঁড়িয়েছিলেন ওষ্ঠাধরে তর্জনী তুলে, কেননা তপস্যা তখনো শেষ হয় নি, বাইরের অভিঘাতে তাকে ভাঙতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল।

এই তো গেল এক পক্ষের কথা, অপর পক্ষের সম্বন্ধেও ভাবনার কারণ প্রবল হয়ে উঠেছে। কন্‌গ্রেস যতদিন আপন পরিণতির আরম্ভ-যুগে ছিল, তত দিন ভিতরের দিক থেকে তার আশঙ্কার বিষয় অল্পই ছিল। এখন সে প্রভূত

শক্তি ও খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে সমস্ত পৃথিবী। সে কালের কন্‌গ্রেস যে রাজদরবারের রুদ্ধ দ্বারে বৃথা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরত আজ সেই দরবারে তার সম্মান অবারিত, এমন কি সেই দরবার কন্‌গ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু মনু বলেছেন সম্মানকে বিষের মতো জানবে। পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম বলো ফাসিজ্‌ম বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কন্‌গ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্ট ভাবে অধিকার করে আছেন, সঙ্কটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থ ভাবে কন্‌গ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হোত তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে; এই ব্যবহার-বিকৃতির মূলে আছে শক্তিস্পর্দ্ধার প্রভাব। খৃষ্টান-শাস্ত্রে বলে স্ফীতকায়া সম্পদের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যের প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ। কেননা ধনাভিমানী ক্ষমতা আনে তামসিকতা। কন্‌গ্রেস আজ বিপুল সম্মানের ধনে ধনী, এতে তার স্বর্গরাজ্যের পথ করছে বন্ধুর। মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক, এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র

হয়েছেন তাঁদের মন কি উদার ভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারে নেই যে-উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত। ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিট্‌লারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন। সত্যের যজ্ঞে যে-কন্‌গ্রেসকে গড়ে তুলেছেন তপস্বী, তার বিশুদ্ধতা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন শক্তিপূজায় নরবলিসংগ্রহের কাপালিক মুসোলীনি ও হিট্‌লার যাঁদের আদর্শ। আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহারলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি কন্‌গ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি। এত দিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমি পোলিটিশিয়ান নই এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলা দরকার। গত কন্‌গ্রেস অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙালী জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে এই অভিযোগ বাংলা দেশে ব্যাপ্ত। এই নালিশটাকে বিশ্বাস করে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা আছে। চার দিকে সকলেই বিরুদ্ধ চক্রান্ত করছে, সর্বদা মনের মধ্যে এই

রকম সংশয়কে আলোড়িত হতে দেওয়া মনোবিকারের লক্ষণ। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে মিলনকেন্দ্ররূপে কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সে কথা বলা বাহুল্য। যে বিচ্ছেদের বাহন স্বয়ং ধর্মমত তার মতো দুর্লঙ্ঘ্য আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের যে আত্মীয়বুদ্ধির ক্ষীণতা তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের অভাব ও আচারের পার্থক্য। এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক সিংহাসনের সরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল করে রেখেছে। যে-দেশের আচার অন্ধ জিদ্‌ওয়ালা নয়, যে-দেশের ধর্মভেদ সামাজিক জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে নি সেই দেশে রাষ্ট্রিক ঐক্য স্বতই সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের দেশে কন্‌গ্রেস সেই সাধারণ সামাজিক ঐক্যের ভিতর থেকে আপনি সজীব ভাবে বেড়ে ওঠে নি। তাকে স্থাপন করা হয়েছে এমন একটা সামাজিক অনৈক্যের উপরে, যে অনৈক্য প্রত্যেক পাঁচদশ ক্রোশ অন্তর অতলস্পর্শ গর্ত খুঁড়ে রেখেছে এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষক দল।

কারণ যাই হোক প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি। মনে পড়ছে আমার কোন এক লেখায় ছিল, যে-জীর্ণ গাড়ির চাকাগুলো বিশ্লিষ্ট, মড়্‌মড়্‌ ঢলঢল করে যার কোচবাক্স,

জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যতক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে-সেঁধে আস্তাবলে রাখা হয় ততক্ষণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা করে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাস্তায় বের করা হয় অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের মুক্তিযাত্রাপথের রথখানাকে আজ কন্‌গ্রেস টেনে রাস্তায় বের করেছে। পলিটিক্সের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় চলতে যখন সুরু করলে তখন বারে বারে দেখা গেল তার এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের আত্মীয়তার মিল নেই। অবস্থাটা যখন এমন তখন কংগ্রেসকর্তৃপক্ষদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা কর্তব্য। কেননা সন্দিগ্ধ মন সকল প্রকার আঘাত ও অবৈধতাকে অতিমাত্র করে তোলে। তাই ঘটেছে আজ। সমস্ত বাংলা দেশের সঙ্গে কন্‌গ্রেসের বন্ধনে টান পড়েছে ছেঁড়বার মুখে। এর অত্যাবশ্যকতা ছিল না। সমগ্র একটা বড়ো প্রদেশের এ রকম মনশ্চাঞ্চল্যের অবস্থায় বাংলা দেশের নেতাদের ঠিক পথে চলা দুঃসাধ্য হবে।

বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্যদানের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজীর মনে একটা বিশেষ সংকল্প বাঁধা রয়েছে। মনে মনে তার পথের একটা ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে কোনো বিপরীত মতবাদের অভিঘাতে তাঁর সংকল্পকে ক্ষুণ্ণ করে এ আশঙ্কা তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক। তিনিই দেশকে এতদিন এত দূর পর্যন্ত নানা প্রমাদের মধ্য দিয়েও চালনা করে এনেছেন; সেই চালনার ব্যবস্থাকে শিথিল হতে দিতে যদি

তিনি শঙ্কিত হন তাহলে বলব না যে সেই শঙ্কা একাধিপত্য-প্রিয়তার লোভে। প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষমাত্রেরই নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় না থাকলে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। এই বিশ্বাসকে তাঁরা ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ধ্রুব করে রাখেন। মহাত্মাজীর সেই বিশ্বাস যে সার্থক মোটের উপর তার প্রমাণ পেয়েছেন গুরুতর ভুলচুক সত্ত্বেও। এবং তাঁর মনে যে পরিকল্পনা আছে সেটাকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করতে তিনি ছাড়া আর কেউ পারবে না—সেও তিনি বিশ্বাস করেন। সকল প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরই এই রকম বিশ্বাসে অধিকার আছে। বিশেষত যখন তাঁর কৃত অসমাপ্ত সৃষ্টি গড়ে উঠবার মুখে। হয়ত মহাত্মাজীর সৃজন-শালায় আরো অনেক মূল্যবান নূতন উপকরণ যোগ করবার প্রয়োজন আছে। এই যোগ করা যদি ধৈর্যের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতায় না ঘটে তাহলে সমগ্রেরই হবে ক্ষতি। এ অবস্থায় মূল সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর রাখতেই হবে। আমি নিজের সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করব যে মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চারিত্রপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হতেম তাহলে অন্য রকম প্রণালীতে কাজ করতুম। কী সে প্রণালী আমার অনেক পুরাতন লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি। আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আমার প্রভাব নেই। এই প্রভাব আছে জগতে অল্পলোকেরই। দেশের সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ যদি সে রকম শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয় তবে তাঁকে তাঁর পথ

ছেড়ে দিতেই হবে, তাঁর কর্মধারাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারব না। সময় আসবে যখন ক্রমে অভাবক্রটির মোচন হবে এবং সেই অভাব মোচনে আমরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছাকে আপন যোগ্যতা অনুসারে প্রবৃত্ত করতে পারব। সামনের যে ঘাট লক্ষ্য ক'রে আজ কর্ণধার নৌকো চালিয়েছেন সেদিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের মত বলব না তার উর্ধ্বে আর ঘাট নেই। আরো আছে এবং তার জন্যে আরো মাঝির দরকার হবে।

আমার মনে যে পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল তার কথা পূর্বেই বলেছি। আমি জানি রাষ্ট্রব্যাপার সমাজের অন্তর্গত ; কোনো দেশেরই ইতিহাসে তার অন্যথা হয় নি। সামাজিক ভিত্তির কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমারতের কল্পনায় মুগ্ধ হয়ে কোনো লাভ নেই। সমুদ্রের ওপারে দেখা যাচ্ছে নানা আকারের নানা আয়তনের জয়তোরণের চূড়া কিন্তু তাদের কোনোটারই ভিৎ গাড়া হয় নি বালির উপরে। যখন লুব্ধ মনে তাদের উপরতলার অনুকরণে প্ল্যান আঁকব তখন দেশের সামাজিক চিত্তের মধ্যে নিহিত ভিত্তির রহস্যটা যেন বিচার করি।

কিছু দিন হোলো একটি বিরল-বসতি পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আছি সদ্য উন্মথিত রাষ্ট্রিক উত্তেজনা থেকে দূরে। অনেক দিন পরে ভারতবর্ষকে এবং আপনাকে শান্ত মনে দেখবার অবকাশ পাওয়া গেল। দেখছি চিন্তা করে মানবজগতে দুই প্রবল শক্তি নিয়ে পলিটিক্সের ব্যবহার।

একটার প্রয়োগ বাহিরের দিকে সেটা যন্ত্রশক্তি, আর একটার কাজ মানুষের মন নিয়ে সেটাকে বলতে পারি মন্ত্রশক্তি। আজ য়ুরোপের সঙ্কটের দিনে এই দুই শক্তির হিসাব গণনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে পদচারণা করছে।

বাহির থেকে একটা কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই শক্তির কোনোটাই সহজসাধ্য নয়, অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগশিক্ষাচর্চা। বহুকাল ধরে আমরা পরের অধীনে আছি, যন্ত্রশক্তির আঘাত কী রকম তা জানি কিন্তু তার আয়ত্তের উপায় আমাদের স্বপ্নের অগোচর। অত্যাবশ্যক বোধ করলে বাহিরের কোনো পালোয়ান জাতির সঙ্গে দেনা করবার কারবার ফেঁদে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে। সেটা দেউলে হবার রাস্তা। সে রকম মহাজনরা আজও এই গরিব জাতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ইতিহাসে দেখা গেছে প্রবলের সঙ্গে অসমকক্ষের মিতালি খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। তাতে কুমীরের পেট ভরে অবিবেচক খাল-কাটিয়ের খরচায়। তা ছাড়া অমঙ্গল প্রতিরোধের যোগ্য জনমনঃশক্তি বহুকালের অব্যবহারে গিয়েছে মরচে পড়ে। ভরসা হারিয়েছি। কোনো একটা নেশার ঝোঁকে মরিয়া হয়ে যদি ভরসা বাঁধি বুকে, তবে সে গিয়ে দাঁড়াবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়। এক দিন ছিল যখন সাহস ও বাহুবলের যোগে চলত লড়াই। এখন এসেছে সায়ান্স, শিক্ষিত বুদ্ধির ’পরে ভর করে। শুধু বুদ্ধি নয় তার প্রধান সহায় প্রভূত অর্থবল। অথচ আমাদের লড়তে হবে

শূন্য তহবিল এবং এমন জনসংঘ নিয়ে যাদের মন কর্মবিধানে দৃঢ় নয়, যারা অশাসিত। যাদের শক্তি হয় অচেতন হয়ে থাকে নয় অন্ধ হয়ে ছোটে। দেশের পলিটিক্সের আরম্ভ হয়েছিল এই দুরূহ সমস্যা নিয়ে। সেই জন্যে প্রথম যুগের নেতারা অগত্যা নৌকো বানিয়েছিলেন দরখাস্তের পার্চমেণ্ট দিয়ে। সেটা দাঁড়িয়েছিল খেলায়। এই রিক্ততার সমস্যা নিয়েই এক দিন মহাত্মা এসে দাঁড়ালেন বিপুল শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে, দুঃখ সয়েছিলেন, মাথা হেঁট করেন নি। বিনা যন্ত্রশক্তিতে লড়াই যে চলতে পারে এইটে প্রমাণ করতে তাঁর আসা। একটা একটা উপলক্ষ্য নিয়ে তিনি লড়াই শুরু করে দিলেন, কোনোটাতে যে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন তা বলতে পারি নে। কিন্তু পরাভবের মধ্যে দিয়ে জেতবার ভূমিকা সৃষ্টি করছেন। ক্রমে ক্রমে সেই মন তৈরি করছেন যে-মন তাঁর সংকল্পিত অস্ত্র যথাযোগ্য সংযম ও সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে। এই অস্ত্র ছাড়া কেবল যে আমাদেরই উপায়ান্তর নেই তা নয়, সমস্ত পৃথিবীরই এই দশা। হিংস্র যুদ্ধ নিরন্ত; সে একই কেন্দ্রের চারি দিকে ধ্বংস-সাধনের ঘুরপাক খাওয়ায়; তার সমাপ্তি সর্বনাশে।

হিংস্র যুদ্ধের ফৌজ তৈরি করা সহজ, বছরখানেকের কুচকাওয়াজে তাদের চালিয়ে দেওয়া যায় রণক্ষেত্রে। কিন্তু অহিংস্র যুদ্ধে মনকে পাকা করে তুলতে সময় লাগে। অশিক্ষিত লোক নিয়ে ভিড় জমানো অনেক দেখা গেল, তাদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ভাঙা চলে, এমন সিদ্ধিলাভ চলে না যা মূল্যবান,

এমন কি পাশব শক্তির রীতিমতো ধাক্কা খেলে তারা আপনাকে সামলাতে পারে না, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পৃথিবীতে আজ যে-সব জাতি যে কোনো রকম লড়াই চালাচ্ছে তাদের সকলেরই জোর সর্বজনীন জনশিক্ষায়। বর্তমান যুগ শিক্ষিত বুদ্ধির যুগ, স্পর্ধিত মাংসপেশীর যুগ নয়। জাপানের তো কথাই নেই— বড়ো বড়ো অন্য সকল প্রাচ্য জাতিই সর্বত্র জনশিক্ষাসত্র খুলেছেন। আজকের দিনে আমরা দেশের বহু কোটি চোখ-বাঁধা মোহের বাহন নিয়ে এগোতে পারব না। মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে জনশিক্ষায় মন দিয়েছেন। বোধ করি প্রমাণ পেয়েছেন ভিড় জমিয়ে অসহযোগ দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে কোন্ জননায়ক পলিটিক্‌স্‌কে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। মনে নানা সংশয় জাগে, স্পষ্ট বুঝতে পারি নে এ সকল পথযাত্রার পরিণাম। কিন্তু নিশ্চিত বিচার করা আমার পক্ষে কঠিন; আমি পলিটিক্‌সে প্রবীণ নই। এ কথা জানি যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাজীই তার প্রমাণ। তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তাহলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। সে জন্য হয়ত অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে

সময় লাগবে। কন্‌গ্রেসের অভিমুখে যদি কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি— কিন্তু দূরের থেকে। কেননা দেশের জননায়কতার দায়িত্ব অত্যন্ত বৃহৎ, তার ভালমন্দ ফলাফল বহুদূরব্যাপী, অনেক সময়েই তা অভাবনীয়। নিজের উপরে যাঁর স্থির বিশ্বাস আছে তিনিই তা বহন করতে পারেন, কিন্তু এ সকল পোলিটিকাল প্রয়াস আমার পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমি অনুভব করি নে। পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার নিজের এত দিনের অভ্যস্ত পথেই আমি সান্ত্বনা পাই। গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে। স্বদেশসেবায় সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে নির্মলকে আবাহন করে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায় আত্মকল্যাণসাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে সকলে সম্মিলিত হতে পারে। আমার সামান্য শক্তিতে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই কাজে মন দিয়েছি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে। মহাত্মাজী যখন স্বদেশকে জাগাবার ভার নিয়েছিলেন তখন একান্তমনে কামনা করে-ছিলুম তিনি জনগণের বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্র পথে উদ্বোধিত করবেন। কেননা আমি জানি দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।

আজ আমি জানি বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে, আমি পূর্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ি। সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে— সেই ধূলিচক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে— আমার দেখার শক্তি নেই। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়-সঙ্কল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলা দেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালী প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।

মংপু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০।৫।৩৯

অপ্রাসঙ্গিক হলেও পুনশ্চ বক্তব্যে একটা কথা জানিয়ে রাখি। হিন্দু মুসলমানের চাকরির হার বাঁটোয়ারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সেই পত্রে নামস্বাক্ষর করতে আমার

যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। দীর্ঘকাল চাকরির অন্নে বাঙালীর নাড়ী দুর্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের দ্বারগুলো যদি বন্ধ হয় তো হোক্,— তাহলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে শক্তি খাটাতে হবে আত্মনির্ভরের বড়ো রাস্তা খুঁজে বের করতে। এই দুঃখের ধাক্কাতেই আনবে যুগান্তর। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি। তার একটি মাত্র কারণ আছে। স্বজাতির দুই শ্রেণীর মধ্যে পক্ষপাতের অন্যায় বিচার দেখলে শাসনকর্তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, তার ফলাফল তাঁরাই বিচার করবেন। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে দুই অসমান বাটখারায় অন্নবিভাগের শোচনীয় পরিণাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে নানা দৃষ্টান্তে কথায় কথায় তীব্র করে তোলা। তাকে শান্ত করবার অবকাশ থাকবে না। পৃথিবীতে হিট্লার-মুসোলীনির দল অন্যায় করবার অপ্রতিহত সুযোগ পেয়েছেন নিজের প্রবল শক্তির থেকে। তারও একটা ভীষণ মহিমা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে নীচের তলার শাসনকর্তারা সুযোগ পেয়েছেন, উপরতলার প্রশ্রয় থেকে— এই অবিমিশ্র অন্যায়ে পৌরুষ নেই। তাই যারা অবিচার সহ্য করতে বাধ্য হয় তাদের মনে সম্ভ্রম জাগে না, অশ্রদ্ধা জাগে। দেশশাসনের ইতিহাসে এই স্মৃতিটা হেয়। কিন্তু আমাদের সমস্যা এই শাসনকর্তাদের নিয়ে নয়। কেননা শাসনকর্তাদের হাতবদল হবেই, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই, তারা ভারতভাগ্যের শরিক, অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সম্বন্ধের

মধ্যে যদি গভীর করে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয় তবে তার রক্তস্রাবী ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হবে না। তাই আজ যে ব্যবস্থায় মুসলমানের জমার ঘরে ভুক্ত করছে সুবিধা, দীর্ঘকালের হিসাবে সেটা রয়ে যাবে নিয়ত ক্ষতির ছিদ্ররূপে। তা বলে এই চিন্তায় হিন্দুদের সান্ত্বনার কথা নেই, কেননা আমাদের ইতিহাসের তহবিল সাধারণ তহবিল।

১১৬

১৬ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ শ্রীনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

মনটা কি রকম বিমুখ হয়েছে। বুঝতে পারচিনে মানেটা কী। ঠিক যেন খাপ খাচ্চে না। সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়া কি ভিতরে ভিতরে হাঁফ ধরিয়ে দিয়েছে? যখন বড়ো ইতিহাসের কল বিগড়িয়ে যায় তখন ঘরের ভিতরকার ছোট ছোট ধাক্কাতেও যেন বেসুর বাজাতে থাকে। এই সময়ে কারো যদি অসুখ বিসুখ করে কিম্বা সংসারে কোনো চিন্তার কারণ ঘটে তার ছায়া খুব দীর্ঘ হয়ে দেখা দেয়।

ঠিক এই সময়টাতে বিশ্বভারতীর প্রকাশক সংঘ আমার সমগ্র একটা গ্রন্থাবলী বের করতে উদ্যত হয়েছেন। আমার কাছে আমার রচনার যে অংশ বেঁচে আছে, যার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেনি তাকেই আমি চিনি। যারা আছে কবরস্থানের মধ্যে তাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে মৃত্যুর নৈরাশ্য

চেপে ধরে মনকে, সাহিত্যিক জীবনের ধ্বংসাবশেষে ব্যর্থতার স্তূপগুলো মরুপ্রদেশের চেহারা দেখিয়ে দেয়। সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গানকে নতুন সংস্করণের ওঝা ভূত নামিয়ে দেখাচ্চেন— তাদের সত্যতা চলে গেছে অথচ তারা বেঁচে থাকার ভান করচে। আমার লেখার যে অংশে ভুতুড়ে বাড়ি সেইখানে আমি আছি সম্প্রতি। এখানে পরাভবের ইতিহাস আমার মনে একটা অবসাদ ঘনিয়ে রেখেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিস্তর লিখেছি, অগত্যা তার মধ্যে বিস্তর আছে যা ভালো নয়। যেমন জীবনটা তেমনি তার সাহিত্য-রচনা ভালোমন্দ জড়িয়েই। সে তো অন্যায় নয়।— অতি বিশুদ্ধ বাছাইয়ে বাস্তবতার ক্ষতি হয়। আমার আপত্তি হচ্চে সেই অংশে যেখানে একহাঁটু কাদা ভেঙে এসেছি, ঘাটে এসে পৌঁছইনি। নিষ্কৃতি নেই। ত্যাজ্য যারা কেবলমাত্র জন্মস্বত্বের দোহাই দিয়ে মিতাক্ষরার আইন অনুসারে তারা উত্তরাধিকারের দলিল বার করে। শাস্ত্রে আছে মৃত্যুতেই ভবযন্ত্রণার অবসান নেই, আবার জন্ম আছে। আমাদের যে লেখা ছাপাখানার প্রসূতিঘরে একবার জন্মেছে তাদের অন্ত্যেষ্টি সৎকার করলেও তারা আবার দেখা দেবে। অতএব সেই অনিবার্য জন্ম-প্রবাহের আবর্তন অনুসরণ করে প্রকাশকেরা যদি বর্জনীয়কে আসন দেন সেটাকে দুষ্কর্ম বলা চলবে না।

সে এক সময় গেছে যখন সমস্ত দেশেরই মন আর তার ভাষা ছিল কাঁচা, তার মনের জমি ছিল নিচু। তখনকার উপাদানে কমদামী করে দিত উৎপন্ন জিনিষকে। আমরাই

নিজের সাধনায় স্তরে স্তরে জমি উঁচু করেছি, আর আঁট করেছি তার মাটি। এখন একটা সাধারণ উৎকর্ষ সহজ হয়েছে সমস্ত সাহিত্য জুড়ে। তাই তখনকার লেখার সঙ্গে এখনকার লেখার জাত গেছে বদল হয়ে। আমার তো মনে হয় আমার রচনার তুইবয়সের মধ্যে ঐক্যই নেই, কী ভাবের দিক থেকে কী ভাষার দিক থেকে। আমাদের চিত্তের জন্মান্তর হয়ে গেছে। তাই আমার এই গ্রন্থাবলীর গোড়ায় রয়েছে চৌরঙ্গীর মিউজিয়ম আর তার সঙ্গে জোড়া হচ্চে আলিপুরের পশুশালা।

স্পেণ্ডর ও ফস্টরের তুটি চটি বই পড়লুম। আমার নিজের মত এই যে আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে যে দলেরই লোক হই আমাদের সেই দলাদলি যে সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁদে গড়ে তুলবেই এমন কোনো কথা নেই। রসের দিক থেকে মানুষের ভালোমন্দ লাগা কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয়। আমার মনটা হয়তো সোশিয়লিস্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্কসিজ্‌মের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত রেখে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়? কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পার রান্নাঘরে, তবে সায়ান্সের জয়জয়কার করব কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হোলেই হোলো।

মাঝে মাঝে তোমাকে কিছু কিছু লেখবার জন্যে মন উৎসুক হয়েছে, ঘটে ওঠেনি। মনের দিবালোকের উপরে একটা কুয়াশা নেমেছে, সে একটা বিস্মরণের আচ্ছাদন। মৃত্যুর প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় মৃত্যুর অনেক পূর্ব থেকে, এই প্রক্রিয়াটা হচ্চে জীবনে অস্পষ্টতার বিস্তার; অর্থাৎ রাত্রির ভূমিকা গোধূলিতে। এই অনিবার্যকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। মৃত্যুতে যেমন সঙ্কোচ নেই এতেও তেমনি সঙ্কোচের কারণ থাকা অসঙ্গত। সঙ্কোচ স্বভাবতই থাকত না মৃত্যুকে যদি শূন্যাত্মক পদার্থ বলে মনে না করতুম, যদি তার সম্বন্ধেও দায়িত্ব আছে মনে করে তার জন্যে প্রস্তুত হবার একটা পালা থাকৃত জীবনযাত্রার শেষ পর্বাধ্যায়ে। মৃত্যুটাকে যদি পথের বিপরীত দিক থেকে একটা কলিশনের মতো আসতে দিই তাহলেই সেটা ঘটে দুর্ঘটনার মতো। বাঁশিতে টর্মিনসের ইস্টেশনে আসবার ঘোষণ জানিয়ে এঞ্জিনের দম কমিয়ে দিয়ে লক্ষ্যটাকে যদি স্বীকার করে নিই তাহলে সেটা যথোচিত হয়। কিন্তু পুরোদমে চলবার দাবী এখনো আমার উপরে সম্পূর্ণ রয়েছে। দরকারী কাজের ভিড় বেড়ে উঠেছে বই কমে নি। যাকে আমরা “দরকার” আখ্যা দিয়েছি সেটা হচ্চে জীবনযাত্রার অধিকারে, তাকেই একান্ত বলে মানার মধ্যে আছে জীবনকেই একান্ত বলে স্বীকার করা। সেটা যে ভুল, দিনাবসানের বেলায় তার প্রমাণ আসে পদে পদে, তখন পুরাতনের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে সহজ মনে অদরকারের চর্চাটাই শোভন। কেননা মৃত্যুর পরে সত্তার যদি নূতন চাষের

পালা থাকে তাহলে প্রস্তুত হবার জন্যে আগেকার ঋতুর শিকড় সমস্ত উপড়ে ফেলা চাই, ক্ষেতটাকে দরকারশূন্য করতে পারলেই সেটা যথোচিত হবে। পূরো কাজের মাঝখানে হঠাৎ থেমে যাওয়াই ট্র্যাজিক। কিন্তু মৃত্যুকে কেন বলব ট্র্যাজেডি ; কেন বলব শেষ, কেন বলব না নূতন আরম্ভ ? নূতন আরম্ভের সূচনাস্বরূপেই আসে পুরাতনের শেষ। সেই শেষই হচ্চে কাটাশস্যের শূন্য ক্ষেত, পাগলাহাতির পায়ে দলা ফসল ক্ষেত নয়। কাটা শস্যের ক্ষেতেই সফলতার আশা বিরাজ করে, হঠাৎ দলাশস্যের ক্ষেতেই হাহুতাশ। তর্ক ওঠে মৃত্যু যে শেষ নয় তার কোনো প্রমাণ নেই। আমি যে রবিঠাকুর তার লেশমাত্র প্রমাণ ছিল না রবিঠাকুর আসবার আগে, কেননা রবিঠাকুর তখন একেবারেই ছিল না। যা হয় তা আপনার প্রমাণ আপনি নিয়ে আসে হওয়ার দ্বারাই। তর্ক করে কোনো লাভ নেই— মনের মধ্যে একটা প্রেরণা এই আসে যে, আলো যখন কমে আসচে তখন আপিসের বাইরেকার ডাক শুনে খাতাপত্র বন্ধ করাই ভালো, আলো কমার অর্থটাকে ছুটির পরবর্তী কোনো একটা পূর্ণতার দিকেই স্বীকার করে নেওয়া যাক শূন্যতার দিকে নয়। যাই হোক্ কাজের ভিড় জোর করে ঠেলে নিয়ে চলাটাই আজকাল আমার নিরর্থক বলে মনে হয়— দেহমন তার প্রতিবাদ করচে। কর্তব্যের পূর্বাভ্যাস এখনো ক্ষীণহাতে লগি ঠেলচে— মন বলচে লগি ফেলে দিয়ে স্রোতে ভাসান দেওয়াই তীর্থযাত্রার শেষ পথ। কিন্তু বর্তমান যুগটা কর্মের যুগ, এ যুগ মৃত্যুকে শূন্য বলে জানে,

সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তাই বোধ হচ্চে জীবনের গোলামি করতে হবে শেষ পর্যন্ত, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এর চেয়ে নিজের প্রতি বিদ্রূপ আর কিছু হতে পারে না।

আজ এই পর্যন্ত। ইতি ১৬।৭।৩৯

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। যখন কন্‌গ্রেস সম্বন্ধে তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম বর্তমান সংকট তখনো উপস্থিত হয় নি। সেই জন্যে তখন যা বলেছি তার চেয়ে বেশি কিছু বলবার ছিল না। শরীর মন যদি অনুকূল হয় তবে উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে সংবাদপত্রে সর্বজনগোচর করে লিখব।

যে বয়স আশি বছরের কাছাকাছি পৌঁচেছে সে বোধহয় তোমাদের কাছে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের দুর্গম চূড়ায়।— তার উপরকার হিমশীতল স্তব্ধতা তোমাদের উষ্ণরক্তে ঠিক অনুভব করতে পারবে না। তোমাদের উপরোধে আমার মন গলতে চায়না। কোনো ডাকে সাড়া না দেবার সময় কাছে আসচে বলে অনুভব করছি।

১১৭

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, মানুষের জগৎ দেখতে দেখতে উলট পালট হয়ে যাচ্চে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে— ভুলে গিয়েছিলুম সভ্যতার অর্থ ক্রমশই দাঁড়িয়েছে বস্তুব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তার পিছনে অনেকদিন ধরে যে মারাত্মক রিপু বীভৎস হয়ে উঠছিল তার সম্বন্ধে লজ্জাভয় হয়েছে অনভ্যস্ত। এই রক্তপিপাসু বসে আছে পুলপিটের পিছনেই, কলেজ ক্লাসের আঙিনায়; ধর্মতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনৈতিক তত্ত্ব এর চারদিকেই বিচিত্র বাক্যপ্রবাহ বইয়ে দিয়ে চলেছে কিন্তু একে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারচে না, এ বসে বসে ভিৎ খুঁড়ে চলেছে— আজ Babelএর স্তম্ভ পড়চে ভেঙে চুরে। এর কোনো প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাইনে— মারের পর মার আবর্তিত হচ্ছে, থামবে কোথায়? এরা আমাকে দিয়ে কিছু বলাতে চায়, নিজের মনের মতো কিছু— আমার দ্বারা সে কখনোই ঘটে না। কিছু বলব বলে ভেবেছিলুম। এবার আমার শরীর অত্যন্ত অপটু— বোমা-লাগা ভাঙা সহরের মতো— কলম চলে নেহাৎ খুঁড়িয়ে। মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে মনে করি ব্যক্তিগত জীবনের যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তারি চার দিকে কাব্যের প্যাটারন গেঁথে একাধিপত্য করি নিজের মনোজগতে—

সাহায্য করবে চারদিকের গাছপালা, ঋতুপর্যায়। একে কি বলবে আত্মকৈন্দ্রিক জীবন— ঠিক তা নয়, এর কেন্দ্র সেই বিরাটের মধ্যে, যা সমস্ত মলিনতা, জটিলতা, আবিলতার মধ্যে থেকে তাকে অতিক্রম করে বিরাজ করে— একে বলবে মিস্টিক। যদি বলো এই হচ্চে এস্‌কেপিজ্‌ম্‌— প্রতিবাদ করব না— যে অঘাসুরকে আমি ঠেকাতে পারি নে এমন কি স্বয়ং চেম্বরলেনের ছাতাও পারে না, কী করব তার মার খেয়ে, ধিক্কার দিতে পারি— বিষবর্ষী শতঘ্নীর প্রচণ্ড গর্জনের কাছে সেটা শোনাবে অত্যন্ত হাস্যকর। কবির আল্‌টিমেটম দেওয়া হয়ে গেছে— তার মেয়াদের শেষ তারিখ হয়তো বা তিনচার শতাব্দী পরে। আমার যা বলবার, তার শেষ কথা বলে নিয়েছি— পড়ে দেখো বলাকার ৯৩ পৃষ্ঠায়—

ওরে ভাই কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত,—
এ আমার, এ তোমার পাপ—
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

আমার যদি কণ্ঠ থাকত তাহলে এই কবিতার সমস্তটা আমি মানববিশ্বের কাছে পড়ে শোনাতুম। এর উপরে একটা কথাও আমার বলবার নেই। মীটিং করে কী হবে,— মীটিঙের কতটুকু পরিধি, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু কণ্ঠস্বর। কবি কি খবরের কাগজের প্রতীক? আমার এই কবিতা তোমরা হয়তো ভুলে গেছ— যদি না ভুলতে তাহলে বলতে আমার যা কাজ আমি শেষ করে দিয়েছি— আবার তাতে জল মিশিয়ে তাকে নতুন করে পরিবেষণ করা সাহিত্যিক দুর্নীতি।

আজ বাংলা দেশে যে আস্ফালন আলোড়ন চলচে তার মধ্যে এত নকল গর্জ্জন আছে যে তাতে আমি লজ্জিত। এই ব্যর্থ শক্তির চোখরাঙানি-রঙ্গভূমি থেকে দূরে থাকতে চাই।

যে কবিতার কথা বলচি তার একটা অত্যন্ত দুর্বল তর্জমা করেছিলুম— বোধ হয় আছে Fugitiveএ— কিন্তু তাতে আমার কণ্ঠস্বর পাবেনা। ওটা একবার তর্জমা করে দেখতে পারো— আমার শক্তি আর নেই, এখন আমার পল্‌তের শেষভাগটা জ্বলচে— ধোঁয়ার সঙ্গে আলোর দ্বন্দ্ব চলচে। ইতি ১৮।৯।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখচি তুমি কলকাতায়— বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লেগেছ কি? যদি বেকার থাক তাহলে কিছুদিনের মতো নগাধিরাজের এই নিভৃত কোণটার পরিচয় নিয়ে যেতে পারো। গৃহকর্ত্তা

গৃহস্বামিনী উৎসুক আছেন— তোমার সহচারিণী দুটিকে আনলেও অসুবিধে হবেনা

১১৮

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

এ যেন বিশ্বজুড়ে একটা দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে মানুষের ভদ্রনীতির মূল কাঠামোটা দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত-রকমে তেড়ে বেঁকে যাচ্চে। আর কিছুকাল আগে এই চেহারার বীভৎস ব্যঙ্গ বিকৃতি ভাবতেই পারতুম না। কখন ভিতরে ভিতরে সভ্যতার মূল্য বদল হয়েছে, সেটা প্রধানত দাঁড়িয়ে গিয়েছে জীবনযাত্রায় বস্তু-ব্যবহারের যান্ত্রিক নৈপুণ্যে। বহু বস্তু প্রসূতি যন্ত্রশালার মালখানায় বসে মারাত্মক লোভরিপুর লোলরসনা অহরহ লালায়িত হয়ে উঠছিল। তার সম্বন্ধে শক্তিলুব্ধ গৃধ্রজাতিদের লজ্জাসংকোচ ক্রমশই আসছিল ক্ষীণ হয়ে। এই রক্তপিপাসু বসে থাকে পুলপিটের পিছনেই, কলেজক্লাসের আঙিনায়। এর চারদিকে বুদ্ধির উৎস থেকে ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতিতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্বের বাক্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে, সে রয়েছে অস্নাত, তাকে ধৌত করতে পারচে না। সে কেবল অন্ধ উৎসাহে ভিৎ খুঁড়ে চলচে রাজ্যসাম্রাজ্যের নিচের তলায় বসে, জয়স্তম্ভগুলো টলমল করচে, সেই সঙ্গে ভেঙে পড়চে মনুষ্যত্বের বাঁধনগুলো। এর কোনো প্রতিকার

আছে বলে ভেবে পাইনে। ঢালু গর্তের দিকে সেই রিপুর চলেছে ধাক্কা যে রিপু বহুযুগ ধরে এসিয়া ও আফ্রিকার দুই দুর্বল মহাদেশ থেকে আপন অশুচি খাদ্য জুগিয়ে নিরাপদে পরিপুষ্ট হয়েছে; তার মুরুব্বিরা ভাবতে পারে নি একদিন এর শোধ তুলবে তাদের সুযোগবঞ্চিত স্বগোত্রীয়রাই। মারের ঘূর্ণিপাক চলেছে, অস্ত্রের পিছনে অস্ত্র, চলেছে অন্তহীন গণিতের পথে— এ থামবে কোথায়? তাদের ভোজের উচ্ছিষ্টের পিচ্ছিলপথে চলচে হানাহানি, দেখতে হয়েছে কুৎসিত। সঙ্কটের দিনে এরা শান্তি চায় কিন্তু ক্ষেত্র পরিষ্কার করতে চায় না।

আমাকে তোমরা বলচ কিছু লিখতে, কোন্ পক্ষের মনের মতো কথা বলি ভেবে পাইনে। এদিকে আমার শরীর অপটু, কলম চলচে খুঁড়িয়ে। মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে মনে ভাবচি ব্যক্তিগত জীবনের যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে তারি চারিদিকে কাব্যের প্যাটার্‌ন্ গেঁথে নিভৃতে একাধিপত্য করব নিজের মনোজগতে, তার সাহায্য করবে চারিদিকের গাছপালা, ঋতু-পর্যায়। এ'কে কি বল্‌বে আত্মকেন্দ্রিক জীবন? ঠিক তা নয়। এর কেন্দ্র আছে সেই বিরাটের মধ্যে যা সমস্ত মলিনতা, জটিলতা, আবিলতার মধ্যে থেকেও তাকে অতিক্রম করে বিরাজ করচে। হাজার বছর কেটে গেছে কিন্তু পৈশাচিক ইতিহাসে মানুষের দুঃখ আজকের দিনের চেয়ে কম ছিল না, যখন মধ্যএসিয়ার তুরাণী লুঠকারীর দল অগণিত নরকঙ্কাল বিছিয়ে চলেছিল দুর্দান্ত দস্যুবৃত্তির পথে, যখন এসীরিয়ার নিষ্ঠুরতা মানবপীড়নের কোনো সীমা মানে নি,

যখন খৃষ্টীয় ধর্মাধ্যক্ষেরা ধর্মের নামে মানুষকে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছিঁড়ে কেটে পুণ্য উপার্জন করছিল— তখন এই বিরাট ছিলেন অবিচলিত, কিন্তু নিঃশব্দে তাঁর হিসাব নিকাশ চলছিল— কেউবা গেল লুপ্ত হয়ে কেউবা রইল সুপ্ত হয়ে, নতুন নতুন চেনা অচেনার ঠাঁই বদল চলল, আরম্ভ হোলো মনুষ্যত্বের নতুন নতুন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় নাম লেখাব যে সে রাস্তা বন্ধ।— ভাগ্য অনুকূল হলে ইতিহাসের চতুরঙ্গে আমরা হতে পারতুম খেলোয়াড় কিন্তু হয়েছি ব'ড়ে। স্বাতন্ত্র্য খুইয়েছি শনৈঃ শনৈঃ, আজ ধর্মের নামেই হোক অধর্মের নামেই হোক, বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে যাব এ কোন্ পঙ্গুতা নিয়ে? অঘাসুরকে ঠেকাবার ভঙ্গী করতে পারি যেমন ভঙ্গী করেছিল বকাসুরকে মারবার জন্যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের শিশুপুত্রটি ভাঙা কাঠি হাতে নিয়ে, তার চেয়ে তোমরা যাকে বলো এস্‌কেপিজম্, আমার সেই কবিত্বই ভালো। দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্য-শক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্যসাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটে নি। দেখলুম ঐ স্পর্দ্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকারচিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মনীর বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে; দেখলুম নন্-ইণ্টরভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপবলিককে দেউলে

করে দিতে— দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলরের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনফা তো কিছুই হোলো না— পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হোলো দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজ্‌মের নাৎসিজ্‌মের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না। কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্যে, কেননা সাম্রাজ্যিকদের অফুরন্ত অর্থ আছে সামর্থ্য আছে আর সহায়শূন্য চীন লড়চে প্রায় শূন্য হাতে, কেবল তার নির্ভীকবীর্যে ভর করে।

কিন্তু ভেবে দেখো ঐতিহাসিক বিপ্লবে কবির আল্‌টিমেটম্ আমি ইতিপূর্বেই দিয়ে দিয়েছি— সদ্য তার সাড়া পাওয়া যাবে না— তার মেয়াদের শেষ তারিখ হয়তো বহুশতাব্দী পরে। কবি ঘোষণা করেছে :—

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে,— বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্যবলি না করি বিচার
জঠরে পূরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
তখন গর্জিয়া নামে রুদ্র, তব বাজ।

কবি একদা বলেছে :—

ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত,—

এ আমার, এ তোমার পাপ,
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলেস্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

আমার যা বলবার আমি শেষ করে বলে দিয়েছি। এরা বলে মীটিং করতে। মীটিঙের কতটুকু পরিধি, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু কণ্ঠস্বর? কবি কি খবরের কাগজের প্রতীক। বলাকা আর একবার পড়ে দেখো, আমার এই কবিতা হয়তো ভুলে গেছো। যদি না ভুলতে তাহলে বলতে আমি শেষবারের মত যা বলেছি তাতে জল মিশিয়ে নূতন করে পরিবেষণ করা সাহিত্যিক দুর্নীতি। ইতি ২০।৯।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৯

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে প্রথমে যে চিঠি লিখেছিলুম সেইটেকেই ফলিয়ে আর একটা চিঠি লিখেছি। এতদিনে পেয়ে থাকবে। এই দ্বিতীয় চিঠি কাগজে ছাপবার দিকে লক্ষ্য করে রচনা। সেই জন্যে তার সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আছে। তোমার কি মনে হয় জানিয়ো। অবশ্য মনের মধ্যে খুব একটা প্রবল উত্তেজনা চলচে— প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে উঠেই সেটা মুহূর্তে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, দ্বিতীয় চিঠিটাও তারি চাঞ্চল্যের ধাক্কায় লেখা। এই দুটোর মধ্যে যেটা তুমি প্রকাশযোগ্য মনে করো প্রকাশ করব।

এখানে এসে কিছু একটা লিখব মনে ছিল— কিন্তু একদিকে শরীরের অবসাদ আর একদিকে আকাশে মেঘলা-দিনের আবিলতা আমাকে বাধা দিচ্চে— তবু একটা ছোটো গল্প লিখ্‌তে শুরু করেছি— কল্পনা এখনো তার অন্তরের মধ্যে রাস্তা খুঁড়ে বের করে নি।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বাবার ব্যামোর কথা শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। তাঁর যে হার্টের দুর্বলতা আছে তা কল্পনাও করি নি। তাঁর সুস্থ সবল চেহারায় অতবড়ো রোগ কল্পনা করা যায় না।

তিনি কেমন আছেন জানিয়ো আর তাঁকে আমার নমস্কার দিয়ো।

১২০

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে গেল চিঠি লেখার পরে আজ Time and Tide কাগজে সার নর্মান এঞ্জেলের লেখা প্রবন্ধ থেকে দুই এক জায়গা তর্জমা করে দিই।

গত সপ্তাহে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বলেছেন, যে সকল দেশ উপলব্ধি করেছে যে তাদের রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য আশু বিপদগ্রস্ত তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা যে প্রস্তুত এ আমরা কাজে ও কথায় সুস্পষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমরা পোলাণ্ডের পক্ষ নিতে প্রতিশ্রুত। অন্যের স্বাধীনতা রক্ষার সমর্থন যদি না করি তাহলে মূলেই স্বাতন্ত্র্যনীতিকে বঞ্চনা করা হয় এবং সেই সঙ্গেই বঞ্চিত হয় নিজেদের স্বাধীনতা।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের এই উক্তিকে সাধুবাদ দিয়ে সার নর্মান বলচেন, এই স্বাতন্ত্র্যনীতি যেমন আক্রান্ত হয়েছে পোলাণ্ডে তেমনি হয়েছিল ম্যাঞ্চুরিয়া, এবিসীনিয়া, চীন, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়ায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ব্রিটেন অত্যাচারিতকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাজে ও কথায় অস্বীকার করেছে।

সার নর্মানের সমস্ত আলোচনাটা পড়ে দেখো। এর থেকে দেখা যাবে ইংরেজের বড়ো এবং ছোটোর মধ্যে উঁচু নিচুতে কত তফাৎ। এই ছোটো যখন বড়ো আসনে বসে দেশকে চালিত করে তখন শুধু যে দেশের গৌরব নষ্ট হয় তা নয়, দেশের প্রকৃত স্বার্থেও আঘাত লাগে।

সার নর্মানের লেখার একটা জায়গা পড়ে শঙ্কিত হলুম। তিনি বলচেন এমন কথা এদিকে ওদিকে একটু আধটু শোনা যাচ্চে যে, যেহেতু জাপান জর্মনি সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়েছে— আমাদের উচিত এখনি জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে চীনকে ঠেলে দেওয়া। যদি এমন কাজ করি তা হলে তো আমরা মরেচি। তিনি বলচেন, Now to sacrifice China to Japan would be to revert to appeasement in its most evil form. And we are in danger of doing it from sheer moral obtuseness.

আমরা এই কথা বলি, জাপান সম্বন্ধে নিরাপদ মৈত্রী স্থাপনার ইচ্ছা যদি ইংলণ্ডের কোনো সম্প্রদায়ের মনে আজ জাগে তাহলে বুঝব দুর্বল হয়ে গেছে ইংলণ্ডের আত্ম-সম্মানবোধ।— ইতি ২৮।৯।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২১

৬ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

অমিয়

তোমার ঘুম কবিতাটি খুব ভালো লাগল। কেবল প্রশ্ন মনে জাগে যখন অনাদি সৃষ্টির ঘোলা ঘুম ভাঙবে তখন থাকবে কী— প্রলয় কি শুভ্রশূন্যতা— ভালোমন্দহারা নিঃশব্দ, একটা অনন্ত না, যার কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই। সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্নের নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন নিয়ে মহানিদ্রা— তারা আশা দেখায়, ভয় দেখায়, কিন্তু কতক্ষণের জন্যে? যুগে যুগে নিঃশেষে পালা শেষ করে মিলিয়ে যাচ্ছে চিরসত্যের মুখোষপরা ক্ষণিকের নাট্যলীলা— কত গেল তলিয়ে এই ঘুমের তলায়, তাদের নাম জানি নে ধাম জানি নে— অথচ অমরতার ফাঁকি উপাধি ছড়াছড়ি যাচ্চে লোকালয়ে লোকালয়ে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যে পাতা কীটে কাটচে নিমেষে নিমেষে, কেউবা মানুষ খুন করা অমর, কেউ বা ছড়া বানানো অমর— কোনো রূপসী মুগ্ধ মনের বিহ্বলতায় অমরী, অকূল ঘুমের তরঙ্গদোলায় দুলতে দুলতে হাসচেন মহাকাল ভাসমান ফেনাগুলোর দিকে তাকিয়ে।

তোমাকে বর্তমানের নিষ্ঠুর অট্টহাস্য নিয়ে আরো কিছু লেখবার ইচ্ছে ছিল। হয়তো লিখব— আমার গল্পটা নিয়ে ব্যস্ত আছি। ইতি ৬।১০।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১২২

১৫ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, কিছুদিন তোমার কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি। তোমার বাবা কেমন থাকেন জানিয়ো। এবারে কি শান্তিনিকেতনে ফিরবে না। যদি ইচ্ছে কর শ্যামলীটা সম্পূর্ণ ভোগ করতে পার।…

আমি বোধ করি ১৫।২০ নবেম্বরে স্বস্থানে ফিরব। ইতিমধ্যে তোমাকে যদি এখানে পাওয়া যেত খুব খুসি হতুম। ১৫।১০।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৩

২২ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার "চেতনস্যাকরা" আগেই পড়েছিলুম। পড়ে রীতিমতো ভালো লেগেছিল। কিছুদিন থেকে তোমাকে লিখব লিখব করছি সময় পেয়ে উঠি নি। তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে।

কবিতা রচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের দ্বারা যাকে সহজ দেখায়, সে আবর্জ্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য— তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার এই কবিতায় আধুনিকের স্বরূপ আমি দেখতে পেলুম। নিজের চিরাভ্যস্ত রচনাধারার সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমার পক্ষে বোঝা সহজ। পাহাড়ে আছি তাই একটা পার্বত্য তুলনা মাথায় আসচে। দূরে পাহাড়ের শিখরের নীলিমার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে নির্ঝরের যাত্রা— সে স্বচ্ছ, সে নির্মল, সূক্ষ্ম আলোয় ছায়ায় রচিত তার উত্তরীয়। তার কলধ্বনিও লাগে ভালো, দৃষ্টির উপরেও তার প্রভাব আছে। সেই ঝরনা যখন নেমে এল নিম্নভূমিতে তখন সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়ে সে বিচিত্র, কত ভাঙা চোরা কত খসে পড়া জিনিষকে সে টেনে নিয়ে চলেছে, কত আওয়াজ মিলচে তার কলস্বরে যার সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই, কোথাও ফেনা উঠচে ফেনিয়ে, কোথাও বালি কোথাও কাদা ঘুলিয়ে উঠচে তার আবর্ত্তে— এই সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে অতিক্রম করে তার ধারা, তার চলমান রূপ, কিছুই তাকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করচে না, তার সমগ্রতাকে রক্ষা করচে, তার সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দিচ্চে তুচ্ছতা, সেই তুচ্ছতাকে উপহাস করবার উপলক্ষ্য দেবার জন্যেই। মনে মনে ভেবে দেখলুম সৃষ্টির এই সর্বগ্রাহী লীলা আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়, আমি এখানে নামতে পারিনি। কিন্তু তুমি যে ভূতলচারিণী স্রোতস্বিনীর পরিচয় দিয়েছো, তার সঙ্গে আমার দূরবিহারী নির্ঝরের কোথাও না কোথাও মিল

আছে, মিল নেই পাঁকে বোজা ডোবার সঙ্গে। এরা কিন্তু ডোবাকেই আধুনিক বলে। যদি তাকে আধুনিক বলতে হয় তাহলে শ্রাবণ মাসের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, বর্ষার জল কল কল করে বয়ে যাক, পাঁক গুলে নিয়ে, চিংড়িমাছের বাসাগুলোর বিপ্লব ঘটিয়ে, তীরে তীরে এঁটো বাসন মাজার ঝঙ্কার তুলে, উছলে পড়ে গোয়ালঘরের গোবরগাদা লেহন করে, পরস্পরের পিঠে মাথারাখা ঘোলাজলে নিমগ্ন মোষ-গুলোকে পঙ্কশয্যার আরাম দিয়ে। এ সমস্তর সঙ্গেই মিল করে ব্যাপ্ত হয়ে থাকবে, শ্রাবণের আকাশ, মেঘের ডাক, আর রিমঝিম বৃষ্টি। কিন্তু গায়ের জোরে বাহাদুরি করলে চলবে না। এই পেঁকোজলে কবির ছন্দ যেন উলঙ্গ শিশুর মতো অনায়াসে নৃত্য করে, বুড়োবয়সের স্পর্দ্ধিত নগ্নতা যদি "আমি আধুনিক" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পঙ্কসভায় নাচতে আসে তাহলে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া কর্তব্য হবে। ইতি বিজয়া। ১৩৪৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক "পরিস্থিতি" সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে সময় পেলে পরে বলব।

৩০ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে মাঝে মাঝে অনুরোধ আসছে আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে। অর্থাৎ একটা পথ দেখাতে হবে অসাধ্য জটিলতার মধ্য দিয়ে। আমি তো কিছুই ভেবে পাই নে।

আমাদের অবস্থাটা এই :— শাসনশক্তি একদিকে মারণ-উচাটনের সমস্ত তোড়জোড় নিয়ে কড়া আইন আর লাল পাগড়ির বেড়া তুলে কেল্লা ফেঁদে বসে আছে। দেশকে বশীকরণের এই একমাত্র উপায়ের প্রতিই তার চরম বিশ্বাস। আর এক দিকে আছে রিক্ত হাতে নিঃস্ব পকেটে নিঃসহায়ের দল। তারা অহিংস্র শক্তিকেই পরম পরিত্রাণ ব'লে আশ্রয় করবার উপদেশ পায় কিন্তু তার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছে না। কেননা এই বিশ্বাসমতে সমস্ত জগতে কাজ কিম্বা অকাজ কিছুই চলছে না। হিংস্রতার জোরেই মানুষের মতো পরমহিংস্র জীবের হাত থেকে মানুষকে বাঁচতে হবে এই শিক্ষার উদ্যোগ বিচিত্র উপকরণ সমেত প্রবলভাবে চার দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সকল শিক্ষা হ'তেই যারা বঞ্চিত এ শিক্ষার আয়োজনও তাদের ঘরে নেই। তারা শ্বাপদ মানুষের শিকারের দলে চিরকালের মতো গণ্য। হরিণের মতো

পালাবার অধিকারও তাদের নেই, চারদিকে বেড়া দেওয়া। তারা মৃগয়াজীবী রাজন্যের রিজার্ভ ফরেস্টে বাস করে।

মনে পড়ছে একটা গল্প শুনেছিলুম কোনো একজন বিশ্বাস-পরায়ণা ভল্‌টেয়রকে জিজ্ঞাসা করেছিল, পালকে পাল ভেড়ার দলকে মন্ত্র পড়ে কি মারা যায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, মাডাম, নিশ্চয়ই যায়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিক চাই। এই আর্সেনিক প্রয়োগের মারাত্মক আয়োজন আজ বিশ্ব জুড়ে এমন পরিব্যাপ্ত যে, যারা মরছে আর যারা মারছে এই দুই পক্ষের কারো চোখে আর কোনো রাস্তাই পড়ছে না।

বলিদানের রক্তে দেবতাকে তৃপ্ত করবার হিংস্র পূজাবিধি মানুষের বর্বর অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো উপদেষ্টা বলেছেন: একমাত্র প্রেমের দ্বারাই এই পূজা সার্থক হতে পারে। শুনে মানুষের মনে হয়েছে কথাটা পারমার্থিক ভাবে সত্য, ব্যাবহারিক ভাবে নয়। অর্থাৎ জীবনের যে বিভাগে আশু ফললাভকে উপেক্ষা করা যেতে পারে সেই বিভাগেই তার মূল্য আছে কিন্তু ফললাভ যেখানে লক্ষ্য সেখানে দেবতার প্রসন্নতা পাবার জন্য চাই বলির রক্ত। এর মূল মনস্তত্ত্ব হচ্ছে এই যে তীব্র কটুস্বাদ ওষুধের পরেই রোগীর বিশ্বাস সম্পূর্ণ নির্ভর করবার জোর পায়, সন্দেহ থাকে না এটা ওষুধের মতো ওষুধ বটে। তাই আজ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় দাওয়াইখানায় ঝাঁঝালো ওষুধের আমদানি বেড়েই চলেছে। শক্তিলাভের টনিক রক্তবর্ণ শক্তির উৎকট রঞ্জনে প্রকটিত। কথায় বলে সহস্রমারী চিকিৎসকঃ, বিস্তর মরতে

মরতে তবে চিকিৎসাবিধিতে বিশ্বাসের বদল হয়। সেই মরণের শিক্ষালয় খুলে গেছে সর্বত্র। এই মরণ শিক্ষালয়ে কোটি কোটি ছাত্রদের মারতে মারতে শিক্ষার শেষ পরিণামে মানুষ কবে ও কোথায় পৌঁছবে বলতে পারি নে। দেখতে পাই ক্লাস চলেইছে কিন্তু শিক্ষার শেষে গিয়ে ঠেকচে না। পুনরাবর্তনই হচ্ছে উত্তরোত্তর বেশি জোরে। এই অবস্থায় আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন্ পথে চলব, কোনো উত্তর ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকি।

আমরা যে সনাতন বড়ো রাস্তার ধারে জীর্ণ আগল দেওয়া ঘরে বাস করি সেখানে শত শত শতাব্দী ধরে বাইরে থেকে এসেছে সৈনিক, এসেছে বণিক, পড়েছে আমাদের পিঠের উপরে, ঢুকেছে আমাদের ভাঁড়ারে, অবশেষে আমাদের মেরুদণ্ড পড়েছে বেঁকে, ভাঁড়ারে বাকি আছে খুদকুঁড়ো। অতএব সনাতন শিক্ষাবিধির সাহায্যে ঐতিহাসিক পরীক্ষায় আমরা যে পাস করেছি সম্মানের সঙ্গে, এ কথা বলবার মুখ নেই আমাদের। কেউ কেউ গর্ব করে বলেন আজও তো আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু এমন বাঁচা আছে যা বিলম্বায়মান মৃত্যু। এই তো আমাদের দশা। এখন যাঁরা হিংস্র শক্তির প্রধান চেলা অথবা অধ্যাপক তাঁদের কাছে আমার বলবার কথা এই যে, অনেক কাল দেখলুম তাঁদের সিদ্ধিলাভের চেহারা, তার ভার অনেকটা আমরাই বহন করে এসেছি কিন্তু আজ কি তাঁরা জয়লাভের সীমানায় এসে পৌঁছলেন? পাস করলেন কি মনুষ্যত্বের পরীক্ষায়। মেতেছেন যাঁরা প্রতিযোগিতায় তাঁরা

জয়ের আশা করছেন কার? হিংস্র শক্তির। এ শক্তি সর্বনাশ সাধনের পূর্বে কোনো কালেই তো শান্তিতে পৌঁছতে পারে না। এ যে শুধু মানুষের জীবিকা ধ্বংস করছে তা নয় তার চিত্ত-শক্তিতে দিচ্ছে বিষ মিশিয়ে— যা কিছু তার শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় বোমা ফেলে দিচ্ছে তাকে ধূলোয় গুঁড়িয়ে। আমাদের লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে কিন্তু আজ এই যে দুর্গতির নাগরদোলায় নিরন্তর ঘুরপাক দেখতে পাচ্ছি এই লজ্জা কার?

হিংস্র শক্তির পাদপীঠ মানুষের দৌর্বল্যে, আর মাটি চৌচীর করে তার চাষ লাগাবার ক্ষেত্র দুর্বলের অসহায়তায়। এই নিয়েই তার ব্যবসায়। অনেক দিন থেকে এই ব্যবসায়েই পৃথুল হয়েছে শক্তিমানের কলেবর— তার প্রতাপের পরিধি। বহুকাল থেকে বহুসংখ্যক মানুষকে সে অতলে নামিয়ে এসেছে, দাবিয়ে রেখেছে ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে আমরা তা জানি। তার প্রভাবের সীমানার মধ্যে পাছে কারো বললাভের সূচনা হয় এজন্য তার সুদূর প্রসারিত সতর্কতা। নরহত্যার বিপুল আয়োজনে ও ব্যয়ভারে ক্লান্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্যে যেই ভার-লাঘবের চেষ্টা করে অমনি চম্‌কে উঠে দেখে ভুল হয়েছে। চৈতন্য হয়েছে আপন মহিমার পরে বিশ্বাস রাখবার জন্যে তার দরকার অপরিমিত সংখ্যক খাঁড়া ও খর্পর। হিংস্র শক্তির যে নিদারুণ জাগরূকতা আজ জল স্থল শূন্যে মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্তার করে রেখেছে এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখা যায় না। মানব-হননের অসংখ্য তোরণ নির্মাণ করতে করতে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিজয়-অভিযান কুচকাওয়াজ করে

চলেছে। কেউ কোথাও থামতে পারছে না পাছে আর কেউ এগিয়ে যায়।

১৯৩০ খৃষ্টশতকে গিয়েছিলুম জর্মনিতে। জেতা যে নিশ্চিত জিতেছে এই কথাটাকে সে নানারকমে দেগে দিচ্ছিল বিজিতের মনে। চিরস্থায়ী কালো কালিতে অপমানকে এঁকে দিচ্ছিল ঐতিহাসিক স্মৃতিপটে। বিজিত দেশগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন করে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করছিল যাতে তাদের পঙ্গুতা অবিস্মরণীয় হয়। রাষ্ট্রস্বার্থবুদ্ধির পক্ষে এমন মূঢ়তা আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু হিংস্র শক্তির এইটে প্রকৃতিসিদ্ধ; অহংকারকে সে সম্ভোগ করতে চায়। ক্ষমাহীন প্রতিহিংসুক নীতি তার সুবিচার এবং শ্রেয়োবুদ্ধিকে অন্ধ ক'রে দেয়। দেখা গেল জয়ের দ্বারা হিংস্রতার উষ্মা শান্ত হয় না, উত্তরোত্তর তার উদগ্রতা বাড়িয়ে উঠতে থাকে। তখন জর্মনির তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আমার সমস্ত মন আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের দিকে। তারা তখন স্বজাতির ভবিষ্যৎকে একটা মহৎ সফলতার দিকে নিয়ে যাবে সংকল্প করেছিল। তার মধ্যে ক্রোধ ছিল না, দ্বেষ ছিল না, ছিল নূতন সৃষ্টির আবেগ। বর্বরতার উপরে সভ্যতার জয়লাভ নির্ভর করে এই সফলতার পরে। কিন্তু হিংস্র শক্তিই বর্বর। সার্থকতার পথ থেকে মানুষকে সে করে ভ্রষ্ট, মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমানিত করায় তার আনন্দ। সেই তো খোঁচা দিয়ে দিয়ে তরুণ জর্মনিকে অবশেষে হিংস্র ক'রে তুললে, তাকে বর্বরতার পথে টেনে নিলে। য়ুরোপের মাঝখানে হিংস্র শক্তির প্রকাণ্ড

একটা অনাসৃষ্টি দেখা দিল। যে নির্মম শাসনশক্তি আমাদের দেশে ব্যেপে দিয়েছে নির্জীব তামসিকতা, সেই শক্তিই য়ুরোপে জাগিয়ে তুলেছে উগ্র কঠোর তামসিকতা। আমাদের ক্ষীণ রেখার ছবি কারো চোখে পড়বেনা, কিন্তু য়ুরোপে হিংস্র শক্তির অফুরান লীলা আজ উৎকটভাবে দেখা গেল। দেখলুম একবারকার যুদ্ধের ফসল যখন সে ঘরে তোলে তখন আর-একবারকার যুদ্ধের বীজ বপন করতে সে ভোলে না।

এবার যুদ্ধের বান ডেকে এসেছে, প্রলয়ের ঝোড়ো হাওয়া লেগেছে হিংস্র শক্তির হাজার হাজার পালের উপর। যে পক্ষই হোক উপস্থিতমতো একটা ফল পাবে যাকে সে বলে জিত। তারপর চলবে সেই কাঁটাগাছের চাষ যা মনুষ্যত্বকে বিক্ষত করবার জন্যে। সেই জন্যেই বলি, এ-পক্ষেরই হোক আর ও-পক্ষেরই হোক জয়কামনা করব কার। জয় যে হিংস্র শক্তির।

আমি পোলিটিশান নই। যাঁরা আমাদের দেশের রাষ্ট্র-নেতা তাঁরা কল্পনা করছেন যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়তা করি তাহলে বরলাভ করব। এই যে সহায়তার সম্বন্ধ এটা দরকষাকষির হাটে। এটা আন্তরিক মৈত্রীর নয়, দীর্ঘকাল হয়ে গেল সেই সম্বন্ধ-সাধনার অবকাশ এ-দেশে আজ পর্যন্ত ঘটে নি। আমাদের পক্ষে শাসনকর্তাদের বিশ্বাসপরতা অনুভব করি নি, অনুভব করেছি সন্দিগ্ধ শক্তির কটাক্ষপাত। যুদ্ধের যখন অবসান হবে তখন শক্তির জয় হবে মৈত্রীর নয়। শক্তির পক্ষে কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, তাকে স্বীকার করার দ্বারা

যে নম্রতা এবং দায়িত্ববোধ আনে সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পীড়াজনক। গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে। ঠিক যে সময়টাতে হিসাবনিকাশের অবকাশ এসেছিল ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভূত পরিমাণে ঘনিয়ে এল বেত চাবুক জেল জরিমানা গোরাগুর্খা ও প্যুনিটিভ পুলিস।

শক্তির পরে যে দেশের শাসনভার, স্বতই সে দেশের চেহারা কী রকম দাঁড়ায় তা আমাদের সামনে শোচনীয়ভাবে স্পষ্ট। নিঃসন্দেহ সেটা তাঁদেরও সুস্পষ্ট গোচর যাঁদের রাজছত্র সমস্ত দেশের দিকে দিকে ছায়া বিস্তার করেছে। সেখানে কোটি কোটি লোক অর্ধাসনে ক্লিষ্ট, অশিক্ষিত, আরোগ্যবিধানহারা, তাদের পানীয় জল কোথাও শুষ্ক কোথাও দূষিত, তাদের রাস্তাঘাটের অভাব চলাচলের প্রয়োজনের মাঝখানে, এ সমস্ত যদি উচ্চাসনবাসীর চোখে প'ড়েও না পড়ে হয় তাহলে বুঝব এইটেই শক্তির শাসনের লক্ষণ। দেশে কী নেই তা বললুম, কিন্তু যা আছে, সর্বত্রই, সে হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিচ্ছেদ। দুর্বলতা থেকেই এর উদ্ভব, দুর্বলতাকেই এ পোষণ করে রাখে। নিজের দায়িত্ব যাদের হাত থেকে নিঃসহায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরই ঘটে এই দুর্বলতা। শক্তি-শাসনের এই বাহনটা দানাপানি খেতে রইল রাজার আস্তাবলে, আমাদের অন্নবস্ত্র অনেক কিছুর ক্ষয় হবে কিন্তু এর বিনাশ হবে না।

মৈত্রীর দ্বারা শাসিত যাদের নিজের দেশ একবার তাদের সঙ্গে আমাদের দশার তুলনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

সেখানে বহুদিন ধরে বহুসংখ্যক বেকারদের অন্নপথ্য চলছে রাষ্ট্রভাণ্ডার থেকে, কেননা মানুষের উপবাসজনিত দুর্বলতা সইবে না যেখানে রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা শাসনে নয় মিলনে। দেহে মনে জ্ঞানে কর্মে আনন্দসম্ভোগে সেখানে সকল প্রকার আনুকূল্যই প্রচুর পরিমাণে। স্বল্প অভাবও সেখানে দৃষ্টিতে পড়ে। স্বভাবের কার্পণ্যবশত মৈত্রী যেখানে তিরস্কৃত সেখানে সমস্ত অধ্যবসায় রাষ্ট্রপ্রতাপকে অপ্রতিহত ক'রে তোলবার দিকে। কিন্তু ক্ষমতার অন্ধ ঔদ্ধত্য বুঝতে পারে না মানুষে মানুষে নির্মমতার নীরস ও অসম্মানজনক সম্বন্ধ কখনই টেঁকে না চিরকাল, সময় আসে যখন ভিতরের তাপ দুঃসহ হয়ে ওঠে এবং বাইরের বন্ধনজাল বিদীর্ণ হয়ে যায়। শক্তির থেকে মৈত্রীর রাস্তাবদল কোন্ সত্যের আঘাতে ঘটবে তা বলবার ক্ষমতা আমার নেই কেবল এইটুকু অনুমান করতে পারি যে, শক্তির হাত থেকে আমাদের বরলাভ আরো দুঃসম্ভব হবে যখন সেই শক্তি জয়লাভে দৃপ্ত হয়ে কর্তৃত্বের অধিকারে নিজেকে ধ্রুব-প্রতিষ্ঠ কল্পনা ক'রে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হবে।

আর্ল বল্ড্উইন সম্প্রতি আমেরিকায় একটি বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ যেটা ইংরেজের, সেটা সমষ্টিতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ যেটা জর্মনির, তার চেয়ে আইডিয়ালে অধিকতর উচ্চ-দরের। তিনি বলেন গণতন্ত্র এবং সমষ্টিতন্ত্রের মধ্যে মূলগত প্রভেদ এই যে, গণতন্ত্র স্বীকার করে মানুষের সেই মর্যাদা এবং সেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যা সে দাবী করতে পারে ঈশ্বরের আপন

সন্তান ব'লেই। তাঁর মতে গণতন্ত্রের মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানের যে একটি ঐক্যনীতি আছে সংকটের দিনে সকলপ্রকার বাহ্য তাড়নার চেয়ে সেইটেই আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

রাষ্ট্রঘটিত আলোচনার সঙ্গে রাষ্ট্রনেতারা ঐশ্বরিক বিধানের একত্রে উল্লেখ প্রায় করেন না। কেননা ঐশ্বরিক বিধানকে যদি মানতে হয় তাহলে দেশে কালে তাকে বিশ্বভূমিকার উপরে স্থাপিত করা চাই। ব্রিটনের রাষ্ট্রনীতি যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছানুকূল ধর্মনীতির অন্তর্গত হয় তা হলে সেই নীতির মধ্যে কেবল ইংরেজের নয় আমাদেরও সমান স্থান আছে। আমরাও মানুষ, আমরাও ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং আমাদেরও মানবমর্যাদা, আমাদেরও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ধর্মনীতির ক্ষেত্রে সম্মানের যোগ্য। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারে তাকে যদি অস্বীকার করা হয় তা হলে সমষ্টিতন্ত্রীয় রাষ্ট্রনীতিকে অন্তত ঈশ্বরের নাম ধরে নিন্দা করা উচিত হয় না। রাষ্ট্রিক ইচ্ছার প্রভাবকে স্বরাষ্ট্রের সীমায় সংকীর্ণ করে দেখবার প্রথা চলে আসছে কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রভাবকে সেই সীমার মধ্যেই একান্ত ক'রে দেখা তো চলে না। আর্ল বল্‌ড্‌উইন তাঁদের আইডিয়াল সম্বন্ধে বলেছেন "These ideals require men of their own free will to co-operate with God himself in the raising of mankind". যে স্বাজাতিক অধিকারের মধ্যে মৈত্রীর প্রাধান্যই প্রবল সেখানে মানুষের উৎকর্ষ-সাধনের জন্যে ঈশ্বরের সহযোগিতার কথা স্বভাবতই মনে আসে কিন্তু পরজাতীয় অধিকারে যেখানে শক্তির শাসনতন্ত্রই

প্রবল সেখানে মানুষকে উপরে তোলবার জন্যে ঈশ্বরের সঙ্গে হাত মেলানোর কথা মনে আনা কখনই সহজ হ'তে পারে না। বস্তুত আমরা তার উল্‌টো পরিচয়ই পেয়েছি। অতএব আমাদের শাসনকর্তারা স্বগোত্রীয় মণ্ডলীর মধ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির উচ্চ আদর্শের অনুগত এ কথা শুনে আমাদের উৎসাহের কোনো কারণ ঘটে না, কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের নাম নিলে সেটা আমাদের কানে দুঃখ দেয়।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন রয়ে গেল আমাদের গতি কী। যে পথে বড়ো বড়ো দেশ আজ উন্মত্তের মতো ধাবমান সে পথ আমাদের অবরুদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই। সে পথে শক্তিশালীরাও যে কোথায় পৌঁছবেন সেটা সন্দেহজনক। এইটুকুই বলতে পারি ইতিহাসের গতি রহস্যময়। দুর্বলের দুঃখও প্রবলের জাহাজে ছিদ্র ক'রে দিয়েছে তার প্রমাণ আছে। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহই একমাত্র সুযোগ নয়, বঞ্চিতের নৈরাশ্যও কোথা থেকে সুযোগ আকর্ষণ করে আনে এখনি তা বলতে পারি নে। বলতে পারি নে ব'লেই তার আকস্মিক আবির্ভাব বলশালীকে একদিন অভিভূত করবে। যে অভাগাদের পক্ষে মৈত্রীর পথেও কাঁটা, যুদ্ধের পথেও বাধা তারাই একান্ত আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের অভাবনীয় বিধানের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষেত্রে যারা পরজাতীয় মানুষকে চিরকালের মতো নাবিয়ে রাখে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ-মারা কলের সংখ্যা বাড়িয়ে চলে তাদের মুখে হরিনামের দোহাই শুনলে মন আশ্বস্ত হয় না। ঈশ্বরের নাম নিয়েই বলব

বাইরের থেকে আমাদেরকে দেখায় নিঃসহায় তবে আমরা নিঃসহায় নই। আমরা বাস করি যে মানবমণ্ডলীর মধ্যে, তারা সকলেই সাম্রাজ্যলুব্ধ নয়, আমাদেরও আপন বলে গণ্য করবে এমন নিস্পৃহ মনুষ্যত্ব কোনো একটা জায়গা থেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। নইলে ঈশ্বরের বিধানের অর্থ কী।

৫।১১।৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৫

২৭ নভেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার নতুন কবিতার বইখানি আমাকে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। সকল সৃষ্টিতেই চেতন অবচেতনের মিলিত লীলা। আমার ছবি রচনায় দেখি অচিন্তার অতল থেকে হঠাৎ ভেসে ওঠে রেখার রূপ— সচিন্তমন তার পরে তাকে দখল করে বসে। আধুনিক মনোলোকে কাব্যের প্রকাশ রহস্য আমি বোঝবার চেষ্টা করচি— যেখানে তার আবির্ভাব কৃত্রিম নয় সেখানে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে— অভ্যাসের বাধাকে একান্ত বলে মান্‌লে ভুল হবে। তোমার ঘুমের কবিতাকে লক্ষ্য করে যে চিঠি লিখেছিলুম তার একটা কপি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভার জন্যে লিখ্‌তে বসেছি। আজকাল

কলম সহজে সরে না। পলিটিকসের আলোচনা এর পরে অবকাশ পেলে করব। কিন্তু এদিকে পুপুর বিয়ে এসে পড়ল। ২৭।১১।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১২৬

৩১ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন থেকে তোমার প্রতীক্ষা করে আসচি। মাঝে মাঝে জনরব শুনি আজ আসচ কাল আসচ হপ্তাখানেকের মধ্যে আসচ। অসম্ভব ভিড়ের আক্রমণ নিরবচ্ছিন্ন চলেছে—বোধ হয় স্থানাভাবের আশঙ্কায় আসনি। এলে কোনোমতে জায়গা করে দিতুম। আমার মুস্কিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন, কেননা মন স্থাণু হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ—তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়— তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোকে বুঝতেই পারে না।

দুই রাজার অভ্যুদয় হয়েছে। এক রাজা কাল ভোরে চলে যাবেন। আওয়াগড় হয়তো আরো কয়েকদিন থাকবেন—উনি অত্যন্ত সাদা মানুষ— ওঁর থাকার মধ্যে কোনো ভার নেই।

যাই হোক তুমি যদি আসতে পার, খুশি হব। আমাকে তৈরি

হতে হবে, পয়লা বৈশাখের জন্যে— কিন্তু মন তৈরি হবার সময় পাচ্চে না। এই রকম অবস্থায় সুদূরে কোথাও দৌড় মারতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই সুদূরও হয়তো তাড়া করবে। Yeatsএর সেই দ্বীপটা কোথায় জানো? স্বয়ং কবিও তার সন্ধান পাননি। আকাশপ্রদীপ আকাশকুসুমবনের ইশারা করে কিন্তু পথ দেখায় না। আসল পথটা সেইখানেই যেখানে আজ শালের মঞ্জুরী ধরেছে আর অজয় নদীর ধারে নাগকেশরের বনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ইতি ৩১।৩।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১২৭

২৫ মে ১৯৪০

ওঁ

গৌরীপুর ভবন

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

তুমি চলে যাওয়ার পর আমাদের এখানকার আসর মুষড়ে পড়েছে। তার পরে আবার আকাশ অত্যন্ত ভ্রূকুটিল ভঙ্গী ধারণ করেছিল। কী করা যায়, আমি খুচ্‌রো কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করে দিলুম। তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দিনের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব— সে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরি নয়। লক্ষ্মীর

চেলারা দুঃসময়ের কাছে ভেবড়ে যায় কিন্তু সরস্বতীর চেলা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিম্বা তার ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্বিগ্ন হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে। আজ এই খানিকক্ষণ হোলো সূর্যের আলো পরিণত শিমুলের তুলোর মতো ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে আকাশে একটা দুশ্চিন্তার কালিমা লেপে গিয়েছিল সেটাকে মুছতে আরম্ভ করেছে। মনে আশা হচ্চে কাছে হোক দূরে হোক একটা সহজ পরিণাম আছেই যার মধ্যে ভাগ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ পাবে। মানুষের মন হিসেবী, তাই সে ভীরু, তাই সে আশঙ্কার কারণ খতিয়ে খতিয়ে মাথা ধরিয়ে তোলে, মানুষের আত্মা বীর্যবান, সে নৈরাশ্যবাদী নয়, কেননা তার মাপকাঠি বহুদূরকে নিয়ে। তার মাপকাঠি রাজ্যসাম্রাজ্য পেরিয়ে যাবে, পৌঁছবে সেইখানে যেখানে সর্বমানবের চরম জয়পতাকা অভ্রভেদ করে আছে। সেই পতাকার বাহন কারা সে তকরার করে লাভ নেই, নিশ্চয়ই খুঁৎখুঁতে ঝগড়াটে পরশ্রীকাতর বাঙালী নয়। তবু বাঙালীও হয়তো সেখানকার তীর্থযাত্রীদের জন্যে কিছু একটা পাথেয়ের জোগান দেবে। কিন্তু হায়রে, জগজ্জয়ী বীরের অন্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব কীট লাগিয়ে দিয়ে বাঙালী প্রতিদিন তাতে বিকার ঘটিয়ে দিচ্চে। ওর মনের মধ্যে উয়ের বাসা, তৈরি জিনিষকে নষ্ট করতেই আছে। ওর কণ্ঠে সব চেয়ে যে সুর অকৃত্রিম সে হচ্চে দুয়ো দেবার সুর।

✓ তোমার প্রেরিত মৃচ্ছকটিকম এইমাত্র পেলুম। এই নাটকে বাস্তবতা আছে কিন্তু বিশ্বাসজনক নাট্যিক অভিব্যক্তি এবং

বাঁধন নেই। লেখনী চাষ করচে না আঁচড় কাটচে। যা হোক ভালো করে পড়ে দেখব। এই নাটক অনেক দিন আগে পড়ে দেখেছিলুম, ভালো লেগেছিল কিন্তু মনে হয়েছিল তখনকার পাঠকদের দাবী করবার স্বভাব পাকা নয়, বিষয়-বস্তুকে যেমন তেমন করে আলগা করে গড়ে তুললেও লোকের অবকাশরঞ্জন হোত ।৮

চেষ্টা করে দেখচি য়ুরোপের ইতিহাসে পরে পরে দুটো দারুণ যুদ্ধের তাৎপর্য বুঝে দেখতে। এই নিয়ে যারা উত্তেজিত উৎসাহ প্রকাশ করচে তারা কাপুরুষ। তারা নিজেরা অক্ষম বলেই সক্ষমদের সংকটে উল্লাস বোধ করচে। এটা হচ্চে দূর থেকে নিরাপদে ছুয়ো দেবার প্রবৃত্তি।

যখন গরমবোধ করবে এখানে এসে ঠাণ্ডা হয়ে নিয়ো। ইতি— ২৪।৫।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১২৮

৩১ মে ১৯৪০

নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী

দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এলো
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
স্বরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়,
কেন এ অন্যায়।

অন্যায়ের এই সম্মার্জনী
উঠেছে আজ ঝেঁকে,
এ যে কঠিন পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা,
অনেক কালের লুব্ধ হালের চাষের মাটির থেকে
লুপ্ত করে নিষ্ফলা চেহারা।
জমে ওঠা মৃত বালির স্তর
ভাসিয়ে নিয়ে ভর্তি করে লুপ্তির গহ্বর;
পলিমাটির ঘটায় অবকাশ,
মরুকে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস।

তুব্‌লা ক্ষেতের পুরোনো সব পুনরুক্তি যত
অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।

অন্তরেতে মৃত
বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে সঞ্চিত,
ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়
ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়।
বিত্ত ওদের করেছে বঞ্চনা,
ধরিত্রীকে অসম্মানে মাড়ায় অন্যমনা।
অপঘাতের ধাক্কা এসে পড়ে ওদের ঘাড়ে
জাগায় হাড়ে হাড়ে।
হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন ক্ষেতে।

শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে,
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে কী রইবে।
পালিস-করা জীর্ণতাকে চিন্‌তে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি ॥

৩১।৫।৪০

১২৯

২০ জুন ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু অমিয়,

কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদাগরী শাবক প্রসব করতে সুরু করেছিল। তারা খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এসিয়া আফ্রিকার পাড়ায়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ গিলেছিল মোটা মোটা পিণ্ড চর্ব্যচোষ্য লেহ্য নানাবিধ আকারে। এই ভোজের লোভনীয় মাংসগন্ধ পৌঁছচ্ছিল য়ুরোপীয় নাসারন্ধ্রে। যে সব বঞ্চিত শাবকদের জিভে জল আসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের জঠরানল ঠাণ্ডা ছিলনা। অবশেষে ভুক্ত অভুক্ত দুইপক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়াকামড়ি। একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার সুরু হোলো শিকারী এবং শিকারীর পালা। য়ুরোপ-জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ। আজ সে কাতর কণ্ঠে বলচে শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি তো বাইরে থেকে আসে না ভিতরে তার উৎস। লুব্ধ অভ্যাসবশত অন্যদের না খেয়ে যাদের চলে না সেই মাংসাশীদের মধ্যে হনননীতি কিছুতেই থামতে পারে না। বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে কারো বা কসের দিকে গোপনে দাঁতগুলো কী অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলছিল আজকের দিনে বড় করে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণভাবে সেটা প্রকাশ পেল। এটা যে না হলে নয়। শিকারকে চিবোতে যদি দাঁতের দরকার

হয় তাহলে পাশের শিকারীকেও দাঁত খিঁচোবার জন্যে দাঁতের দরকার হবেই। আজকের হানাহানিতে যে জিতল কালকের আশঙ্কা নিবারণের জন্যে তাকে উঠে পড়ে বৈজ্ঞানিক ডেন্টিস্ট্রির চর্চ্চা করতেই হবে। শ্বাপদ সভ্যতার শিক্ষামন্দিরে এই আত্মঘাত চর্চাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠতে বাধ্য। এই কামড়ের ঘূর্ণাচক্র অন্তহীন বেগে বাড়তেই থাকবে। আজ যারা কামড়ায় নি কামড় খেয়েছে তারা দায়ে পড়ে কালই কামড়বিদ্যার পাঠশালা খুলবে। য়ুরোপের উত্তর অংশে অনেকদিন অহিংস্র শান্তিকে আশ্রয় করে যথার্থ সভ্যতার মহৎরূপ বিরাজ করছিল আজ তারা ক্ষ্যাপাজন্তুর কামড় খেয়েছে, কাল তাদের ঠাণ্ডা রাখবে কীসে? তাহলে এই বিরাট পশুশালার মধ্যে মান্‌ষের সন্ধান পাব কোথায়। ডারুয়িন বলেছেন বানরের অভিব্যক্তি মানুষে কিন্তু মান্‌ষের অভিব্যক্তি এ কোন্ জানোয়ারে। প্রাণীজগতের আদি যুগে বর্মে চর্মে ভারাক্রান্ত বিকট জন্তুরা আস্ফালন করে পৃথিবীকে দলিত করেছিল তারা তো প্রাণলোকের অসহ্য হয়ে উঠল, টিঁকতে পারল না— সৃষ্টিবিভাগে সেই ব্যর্থ পরীক্ষার স্মৃতি এখনি কি লুপ্ত হয়েছে। আবার সেই বর্মের বোঝা বেড়ে উঠে মানবধর্মকে অন্তরে অন্তরে ফেলচে পিষে। মানবসৃষ্টির জন্যে যিনি দায়ী তিনি বলচেন, লজ্জা দিলে, এ চলবে না, এদের পিঠের থেকে বর্ম নামিয়ে নেওয়া গেল মনের মধ্যে সেটা ঢুকে সর্বনেশে হয়ে উঠল, এ তো বাঁচবার লক্ষণ নয়। প্রাচীন ডাইনোসরদের সঞ্চরণক্ষেত্র আজকের দিনের যুদ্ধক্ষেত্রে,

সেখানে তার প্রেত উঠেছে জেগে, যে রাস্তা দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হয়েছে সেই রাস্তা দিচ্চে দেখিয়ে।

তবু সেই বর্মমন্থর জন্তুরাই যে মানুষের ভবিষ্যৎবর্ত্মের পথপ্রদর্শক এ কথা মন মানতে চায় না। কেননা সমস্ত বিরোধের মধ্যে মানুষকে দেখেছি। মাথাগুণতিতে তারা অল্প, কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" আজ যে বৈশ্যয়ুরোপ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র, শূদ্রের দাস্য নিজের শক্তিক্ষেত্রে অপহরণ করে অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে এই তো দেখচি বিনাশের ঢালুতটে তার পা পড়ল। টিঁকে থাকবার শক্তি তার নয়, সে শক্তি তাদেরই যারা অলুব্ধ, যারা নম্র, যারা শান্ত, যারা বিশ্বাসপরায়ণ, যারা প্রমাণ করতে এসেছে মনুষ্যত্ব পরস্পরকে গিলে গিলে নয়, পরস্পরে মিলে মিলে। তারা কোনো একটা বিশেষ জাতি নয় তারা সকল জাতির মধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে অখ্যাত হয়ে আছে। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার যাত্রা, এই কথা সে প্রমাণ করবে যে, সে মৃত্যুঞ্জয়। ইতি ২০।৬।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৩০

২০ জুন ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার দ্বিতীয় চিঠি পেলেম। তোমাকে একটা চিঠি আজ সকালেই লিখেছি, কিন্তু তোমার চিঠির ঠিক উত্তর দেওয়া হয় নি। যেমন সমস্ত জীবাণুকোষ মিলে একদেহ, তেমনি প্রত্যেক মানুষকে মিলিয়ে এক মহামানব এ বিশ্বাস আমি পূর্বেই জানিয়েছি। দেহকোষের এক অংশে আঘাত লাগলে সব দেহই পীড়িত হয়। ঐক্যের অনিবার্য ধর্মই তাই। ঐক্যের বেদনা যাঁরা নিজেরই মধ্যে উপলব্ধি করেন তাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি। আমাদের ধারণার অতীত যে বিরাট মহাপুরুষে এই বোধ সম্পূর্ণ হয়ে আছে উপনিষদে তাঁকে বলেন সর্বানুভূঃ, তিনি সমস্তই অনুভব করেন। প্রত্যেকে তাঁর মধ্যে, অথচ তিনি প্রত্যেকের অতীত। এইজন্যে তিনি নির্মমভাবে প্রত্যেককে বিচার করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন সমগ্রের মধ্যে ভুল ঢুকেছে অতএব তাকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি বলতে পারেন নতুন করে আরেক সমগ্র রচনা করা চাই। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতার একটা আদর্শ আছে— স্পষ্ট বুঝতে পারি প্রথম যুগের উদ্ভিদ পশুপক্ষী কী কুশ্রী ছিল, অভিব্যক্তির তপস্যায় সমস্তই একটা সুশ্রীতায় পৌঁচচ্ছে। এই অভিব্যক্তি তাঁরই আত্মোপলব্ধির সোপান-পরম্পরা। দেখচি এতে স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না ওজনের

ভুল হয়, বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেইজন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী করে। আমাদের সেই চেষ্টাই নৈতিক চেষ্টা যে চেষ্টায় কাটাকুটির কারণের শোধন হয়, জগদ্‌গুরুরা তারি ধ্যান করেছেন। এই ধ্যানে তাঁরা পেয়েছেন মূলগত শোধনের উপায় প্রেম ও ত্যাগ— তাই তাঁরা প্রচার করেছেন। বলেছেন, মা গৃধঃ, বলেছেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। তাঁদের এই বাণী বিরাট মহাপুরুষের বাণীর অন্তর্গত। আমাদের আশার কথা এই বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সুতরাং ক্রমশ যুগ যুগ ধরে এ বীজের মতো কাজ করবে নইলে এমন সব আশ্চর্য কথা ভাষা পেতই না— এ কথার মতো অদ্ভুত কথা নেই যে আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। বহু শতাব্দী ধরে এই নীতির ব্যতিক্রম হয়ে চলেছে— কিন্তু ব্যতিক্রমের ভিতর দিয়েই গড়া চলে, যেমন করে আমরা কবিতা লিখি। এই ব্যতিক্রম টেনে আনে মূর্তি গড়ায় হাতুড়ি পেটানো, তাতেও যখন বিরাটের মনের মতো হয় না তখন নতুন সৃষ্টির সংকল্প আসে— পশুসৃষ্টিতে এই রকম প্রলয়ের কাজ যুগযুগান্তর দেখেছি, মানুষ সৃষ্টিতেও রক্তের অক্ষরে কতবার পালটিয়ে লেখা দেখেছি। একদিন যদি চরম ফেলকরার কাটাদাগ সেই ইতিহাসের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত চিহ্নিত হয় তবে পাতার কিছু অংশ বাকি থাকবে তাই নিয়ে পরের অধ্যায়ের পত্তন হবে— আজ যাঁরা সেই বাকির দলে, খবরের কাগজের মোটা শীর্ষ লাইনে তাঁদের নাম ওঠে না, কাটা পড়ার দলই

চলেছে ডঙ্কা বাজিয়ে, যে পর্যন্ত তারা না পৌঁছয় মহতী বিনষ্টিতে। উপনিষদে আছে স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যা করেছেন। স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ— তপস্যায় উত্তপ্ত হয়ে তিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন— এ তো সর্বশক্তিমানের পরিচয় নয়— এর মধ্যে বিপুল প্রয়াস সুতরাং বিপুল দুঃখের উদ্দীপনা আছে এবং এই তপস্যার কেন্দ্রস্থলে আছে পরিপূর্ণ কল্যাণের আদর্শ। তা যদি না হোতো তবে যাঁরা সত্যের জন্যে মঙ্গলের জন্য martyr হয়েছেন তাঁদের পাগল বল্‌তুম। উলটে এই কি প্রমাণ হচ্চে না যে যারা তাঁদের বিদ্ধ করেছে দগ্ধ করেছে তারাই মত্ত তারাই অন্ধ। তোমার কবিতা খুবই ভালো লাগল, আমি যা বলতে চাই তোমার স্বকীয় ভাষায় চমৎকার করে বলেছ। হোমানলের দারুণ উত্তাপের মধ্যে তপস্বীকে তুমি দেখেছ। তাঁর জয় হোক। ইতি ২০।৬।৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

প্রবাসীতে তোমার কবিতা বেরোয় যেন।

১৩১

২৩ জুন ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয় শেষ চিঠিদুটো তোমাকে যা লিখেছিলুম, অনিল কপি করে প্রবাসীতে পাঠিয়েছে। সে দুটো ছাপবার যোগ্য কিনা আমার সন্দেহ আছে। তোমারও যদি সন্দেহ থাকে তাহলে ছাপতে নিষেধ করে দিয়ো।

ইতিমধ্যে যে কবিতা জমেছে তার অনেকগুলো সানাই বইটাতে দেবার মতো বলে মনে হয়। ওগুলো দেখে তুমি বাছাই করে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই। বইটা শ্রাবণের [মধ্যে] ছাপানো হবেনা অতএব সময় আছে।

আমরা ২৮শে তারিখে রওনা হয়ে ২৯শে পৌঁছব কলকাতায়। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি? সেই ডিগ্রি অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হতে হবে।

এখানে দিন চলচে ভালো যেতে ইচ্ছে করে না। এবার তোমাকে নিয়ে পাহাড়ে আমাদের বেশ জমেছিল যে পর্যন্ত না কলকাতায় তোমাকে কাজে লাগতে হয় শ্যামলীতে এসে আড্ডা কর না।

"ছেলেবেলা" বলে ছেলেদের ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ণনা লিখেছি। তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে আছে।

ইতি ৯ আষাঢ় ১৩৪৭

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৩২

২৯ জুলাই ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয় তোমার চিঠি পেয়ে কী রকম বেদনা বোধ করলুম তা বলতে পারি নে। তোমাকে কাছে রাখতে পারব একান্ত আশা করেছিলুম। তবু এ কথা বলতেই হবে বাংলাদেশের কুটিল চিত্তের জাল ছিন্ন করে তুমি যে চলে যাচ্চ এ হয় তো মোটের উপর ভালোই হোলো। নইলে একদিন অনুশোচনা করতে হোত। কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা তুমি ৭ই অগস্টের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকো। আর কোনো কারণ নয়— তোমাকে আমি যে অন্যদের চেয়ে শ্রদ্ধা করি সেটা দেখাবার সুযোগ পেতুম। তোমার সম্মান তুমি এখানে পেতে। তুমি হার মেনে যেয়ো না চলে। আমাদের সভায় তুমি মাথা-তুলে দাঁড়াতে পারবে। এখানে তোমার এই শেষ কাজ করে যেয়ো। অন্যেরা যেন কোনোমতে মনে না করে যে বাংলাদেশ থেকে তুমি অসম্মানিত হয়ে গেলে। শান্তিনিকেতনের সম্মানের তো মূল্য আছে। ইতি ২৯।৭।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৩৩

২২ অগস্ট ১৯৪০

ওঁ

অমিয়

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বিশ্বভারতী মারফৎ আমার ঘাড়ে একটা গল্প লেখার ফরমাস চাপিয়েছে। সেই ঘাড়ের উপর যে মাথাটা টলটল করচে সেটা প্রায় গজভুক্ত কপিত্থবৎ— লিখতে হয় কষ্টে মন্থর গতিতে। অন্যান্য সকল কাজকে সে মুড়িয়ে খেতে খেতে চলেছে।

আধুনিক কাব্যপরিচয় পেয়েছি পড়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছি। দেখলুম তার অনেক কবিতাই আমাদের কালের হাট থেকে এসেছে। তার আকৃতি চেনা তার প্রকৃতিও। তাহলে বলতে হবে আধুনিক কবিতা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসচে। কবির প্রেয়সী বুড়ি হয়ে মরে যায় না। আজও এসে বাতায়নে আঘাত করে চম্পক অঙ্গুলির। এই যে চির আধুনিক এর স্বরূপ কী, চির সনাতনীর সঙ্গে মূলগত প্রভেদ কী সে কথাটা বুঝিয়ে বলবার ভার তোমারই পরে। তুমি হচ্চ আমার লিপিকার সেই প্রভাত ও সন্ধ্যার মতো— তোমার একদিকে সূর্য উঠচে যূথী বনে আর একদিকে সন্ধ্যা আসন বিছাচ্চে নক্ষত্র সভায়। তোমার নিজের মধ্যে তুমি একত্রে অধিকার করেছ প্রাচ্য প্রতীচ্যের উদয়াস্ত লোককে। আমি আজ মুখ ফিরিয়ে চলেছি একদিকে, তাকে কী নাম দেবে জানি নে।

এই সংকলন গ্রন্থে এখনো অনেক কবিতা দেখলুম যাতে কালশিল্পী বিকৃতিকে নূতনত্ব ব'লে স্পর্দ্ধা করেছে। বিকৃতি তার অস্বাভাবিকতা দ্বারা চমক লাগায়— যে জন্যে আপন পোষা জীব জন্তুর মধ্যে ইচ্ছা ক'রে মানুষ বিরূপের সন্ধান করে। অস্বাভাবিক আকস্মিক, স্বাভাবিক চিরকালের। অদ্ভুত এবং অপূর্বের মধ্যে যে প্রভেদ সে তো কবিরাই জানে। বিজ্ঞানীর কাছে দুইয়ের মূল্যই সমান।

আমার সময় অত্যন্ত কম এবং শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

ইতি ২২।৮।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঝে মাঝে তুমিও যে আমাকে হতবুদ্ধি করো নি তা বলতে পারি নে। যখন ধাঁধা লেগেছে তখন মনে হয়েছে আজকাল সাহিত্যে যেন গালিভার্স ট্র্যাভল্‌সের লীলা, আমরা কোন্ পক্ষ কে এবং কী তার সংজ্ঞা নির্ণয় করে দেবে কে। এই ডিগবাজি খেলার মধ্যে যারা রস পায় তারা তো যা হোক একটা কিছু পায়, পায় না যারা তাদের চুপ করে থাকাই ভালো। সেই চুপ করে থাকাতেই কি হার, না সেইটেতেই সুবুদ্ধি? আধুনিককে যখন আমি অবিশ্বাস করি সেটা তার বাস্তবকে নয় তার অস্বাস্থ্য, এবং নিশ্চিত জানি অস্বাস্থ্যের পরিণাম হয় মৃত্যু নয় আরোগ্য।

১৩৪

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কিছুদিন থেকে আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়চে, দিনগুলো বহন করা যেন অসাধ্য বোধ হয়। তবু কাজ করতে হয়েছে তবু এত অরুচি বোধ সে বলতে পারি নে। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে পালিয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে— বিধান রায় আশঙ্কা করেন হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে। সেই জন্যে কালিম্পঙে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মন বিশ্রামের জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছে যে তাঁর নিষেধ মানা সম্ভব হোলো না। চল্লুম আজ কালিম্পঙ। তুমি তো পুরীতে আছো, বহুকাল তোমার খবর পাই নি। এখানকার কর্তা-ব্যক্তিরা তাঁদের প্রয়োজন হলেই আমাকে টানাটানি করতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁদের জালে ধরা দেবার মতো নির্বুদ্ধিতা আমার কেটে গিয়েছে— বারবার পরীক্ষা হয়ে গেছে কখনো আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার করেন নি— এঁদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। এঁরা যাঁদের বিপক্ষ বলে গণ্য করেন অন্তত তাঁদের চেনা যায়। তাঁদের সুস্পষ্ট ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এঁদের কুটিলনীতি পেরে উঠবে না। ছুটি নিলুম।

ছেলেবেলা বইটা পেয়েছ কি। দায়ে পড়ে একটা গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম বহুকষ্টে লিখে নিষ্কৃতি নিয়েছি।

আনন্দবাজার পূজার সংখ্যায় যাবে— কি রকম হয়েছে কী জানি। লিখতে আর প্রবৃত্তি নেই। ইতি ১৯।৯।৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৫

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্চে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জরণ। তারি একটুখানি নমুনা পাঠাই :—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দের মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ
জানে তা কি এ কালিম্পঙ?

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটিদিন বরমাল্য পরাইল তারে
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ ?

২৫।৯।৪০

লিখতে রীতিমত কষ্ট বোধ হয়। চিঠির প্রথমাংশসমেত কবিতাটি যদি কপি করে পরিচয়-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঠিকানায় পাঠাতে পার খুশি হব। ইতি

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

এখানে শরৎকালটা রমণীয়, যদি কিছু দিন কাটিয়ে যেতে পারো ভালো লাগবে, আমারো লাগবে ভালো। এখানে লেখাপড়ার কাজ অবাধে করতে পারবে।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

১৩৬

৪ জানুয়ারি ১৯৪১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, খবরের কাগজে তোমার মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে আঘাত পেলুম। তিনি দীর্ঘকাল দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় পুরীতে একরকম বন্দী হয়ে ছিলেন, এতকাল পরে নিষ্কৃতি পেলেন। তবু মৃত্যুর অভিঘাত সর্বদাই অপ্রত্যাশিত। গতবার পুরীতে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন কথাবার্তায় তাঁর স্বচ্ছবুদ্ধির পরিচয়ে বিস্মিত হয়েছি— রোগবেদনার মধ্যে শেষ পর্যন্ত তাঁর মন ছিল জাগ্রত।

বিশেষ করে তোমার পিতার জন্যে মনে উদ্বেগ অনুভব করি। বড় শোকে আপন সান্ত্বনাকে গভীর বৈরাগ্যের মধ্যে আপনিই উদ্ভাবন করে— সে কথা জানি— তিনিও পুরুষোচিত ধৈর্যের সঙ্গে বিয়োগদুঃখ বহন করতে পারবেন সন্দেহ নেই। তাঁকে আমার সমব্যথার অভিবাদন জানিয়ো। ৪।১।৪১

শান্তিনিকেতন

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৭

৮ জুন ১৯৪১

শান্তিনিকেতন

৮।৬।৪১

কল্যাণীয়

অনেকদিন তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় ছিলুম। ঠিক করেছিলুম অসুখবিসুখে জড়িয়ে আছ। আমারো সেই দশা। অনেকদিন চিঠি লিখতে পারিনি, চিঠি প্রত্যাশা করাও অন্যায়। অদৃষ্টের এই অকরুণতার দিনে মাঝেমাঝে দুটো একটা টুকরো খবর পেলেও মন খুশি থাকে।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

পরিশিষ্ট ১

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী

পরিণয়মঙ্গল

হৈমন্তী দেবী ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পরিণয়-উপলক্ষে

উত্তরে তুয়াররুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গতলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃঙ্খলে।
যে নীহারবিন্দু ফুল ছিঁড়ি তার স্বপ্নমন্ত্রপাশ
কঠিনের মরুবক্ষে মাধুরীর আনিল আশ্বাস,
হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গেঁথেছে তাহারি শুভ্রমালা
নিভৃত গোপন চিত্তে ; সেই অর্ঘ্যে পূর্ণ করি ডালা
লাবণ্যনৈবেদ্যখানি দক্ষিণসমুদ্র-উপকূলে
এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে
রবির সোহাগগর্ব বর্ণগন্ধমধুরসধারে
বৎসরের ঋতুপাত্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে।
বিস্ময়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
কোথা করে অন্তর্ধান মুহূর্তে দুস্তর অন্তরাল—
দক্ষিণপবনসখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে।

শান্তিনিকেতন
১ পৌষ ১৩৩৫

২

পথসঙ্গী

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সে-আলোকে যায় মিলে।

তেহেরান
৬ মে ১৯৩২

পারস্যভ্রমণকালে লিখিত

৩

বিকেল বেলার দিনান্তে মোর
পড়ন্ত এই রোদ
পূব গগনের দিগন্তে কি
জাগায় কোনো বোধ ?
লক্ষ কোটি আলো বছর পারে
সৃষ্টি করার যে বেদনা
মাতায় বিধাতারে
হয়তো তারি কেন্দ্র মাঝে
যাত্রা আমার হবে,
অস্ত বেলার আলোতে কি
আভাস কিছু রবে ?

১২।৯।৩৮

'সেঁজুতি' গ্রন্থ উপহারদানকালে লিখিত

৪

কয়েক মাসের খেয়ালের ক্ষেতে
ফসল যা ফলেছিল
তখনো সেদিন গাঁয়ের বাহিরে
ধরণীর কোলে ছিল।
তুমি সঞ্চয় করি
আঁঠি বেঁধে দিয়ে ভরি নিলে খেয়া তরী।
ঘাটে এনে দিলে তারে
ব্যাপারী দলের দ্বারে।
কী পারানি দিয়ে পূরাব তোমার সাধ,
আমার দিনের শেষের কড়িতে
লহ এ আশীর্বাদ।

২৫ বৈশাখ
১৩৪৭

'নবজাতক' গ্রন্থ উপহারদানকালে লিখিত

কল্যাণীয়
শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

হে বন্ধু নূতন করে
আরোগ্যের স্বাদ দিলে মোরে
পুরাতন কাল হতে নূতন কী রস
আনি দিল সঙ্গের পরশ।

অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা,
তোমার বুদ্ধির বিচিত্রতা,
ভূয়োদর্শনের তব দান
বন্ধুত্বেরে করে মূল্যবান।

নবোদিত প্রভাতে যেমন
শিখরে শিখরে হয় আলোর এমন পরশন
তেমনি আঁধার গুহা হতে
ফিরে যবে আসি মুক্ত সংসারের স্রোতে
জীবনের সার্থকতা একে একে নূতন আলোকে
ফিরে আসে চোখে॥

৭ই পৌষ
১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ

হে বন্ধু নূতন ক'রে
আরোগ্যের স্বাদ দিলে মোরে
পুরাতন কাল হতে নূতন কী রস
আনি দিল সঙ্গের পরশ।
অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা,
তোমার বুদ্ধির বিচিত্রতা,
ভূয়ো দর্শনের তব দান
বন্ধুত্বেরে করে মূল্যবান।
নবোদিত প্রভাতে যেমন
শিখরে শিখরে হয় আলোর ক্রমশ পরশন
তেমনি আঁধার গুহা হতে
ফিরে যবে আসি মুক্ত সংসারের স্রোতে
জীবনের সার্থকতা একে একে নূতন আলোকে
ফিরে আসে চোখে॥

৭ পৌষ
১৩৪৭

'রোগশয্যায়' গ্রন্থ উপহারদানকালে লিখিত

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্রনাথ-কৃত
শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনা

নবযুগের কাব্য

উনিশ খ্রীস্টশতকে আধুনিক কালের পাঠশালায় আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের যখন চেহারা দেখলুম তখন দেখা গেল তার রাস্তা পাকা করে বাঁধানো। সকল দেশের দিকে সে খোলা। সে পথে আমাদের মনের চলাফেরা বাধা পেল না। যে-সকল আনন্দতীর্থের দিকে তার নির্দেশ ছিল আমরা সহজেই তাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলুম। বড়ো বড়ো তীর্থ-যাত্রী যাঁরা এই পথকে প্রশস্ত করতে করতে চলে গিয়ে-ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়েছিল। অবশেষে এমন বিপর্যয় যে হঠাৎ আসতে পারে যাতে করে সেই বিশ্বপথ ও যানবাহনের পরিবর্তনে আমরা একটা অপরিচয়ের দুর্গমে এসে পড়ব তা মনে করতে পারি নি।

কিন্তু সেই সনাতনী সীমানার মধ্যে মাঝে মাঝে আবহাওয়ার বদল যে লক্ষ্য করি নি তা নয়। ইংরেজি সাহিত্যে আলেকজাণ্ডার পোপ যে-ঋতুর বাহন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সে-ঋতুর নন। এই বদল মনেরই বদলের অনুবর্তী। প্রাকৃত জগৎ এবং মানস জগতকে দুই যুগের কবিরা ভিন্ন চেহারায় দেখেছেন তাই ছন্দ ও ভাষা আপনিই বদলিয়েছে তার প্রকাশভঙ্গী। আমরা সেই অধুনাউপহসিত ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যের দান গ্রহণ করেছি, দীক্ষা পেয়েছি তারই কাছ থেকে। সেই অনুসারে যা সুন্দর যা মহৎ তাকে সন্ধান করেছি বিশেষ-

ভাবে বিশেষ স্থানে, বিশেষ অনুষ্ঠানে তার জন্যে আসন পেতেছি।

এমন সময় য়ুরোপে প্রকাণ্ড এক যুদ্ধে মস্ত একটা সামাজিক ভূমিকম্প ঘটল। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের ভূমিকা যেন বদলে গেল। রূঢ় হ'ল ভাষা, যে-সকল আবরণের দ্বারা আচরণের প্রসাধন করা হ'ত তার সম্বন্ধে একটা অসহিষ্ণুতা দেখা দিল।

আজ পর্যন্ত প্রসাধনের দ্বারা মানুষ আপনার একটা পরিচয় নিজের চেষ্টায় রচনা করে এসেছে। নিজের নগ্নতার উপরে পরিয়েছে শিল্পের উত্তরীয়। অর্থাৎ মানুষের যে স্বরূপ প্রকৃতিদত্ত, তার উপরে সে স্থাপন করেছে নিজের রচনা। সে যা ইচ্ছা করে, সেটাকেও করেছে আপন প্রকাশের অঙ্গ। মানুষ স্বয়ং কী এবং মানুষ কী চায় এই দুইয়ে মিল করিয়ে তবেই মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণ ব'লে জেনেছে ও জানিয়েছে। এইজন্যেই ইতিহাসে যাঁরা মহাপুরুষ ব'লে গণ্য তাঁরা কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক, আর অনেক পরিমাণে আমাদের ভাবের সৃষ্টি। পূজা করবার একান্ত প্রয়োজন আছে মানুষের, সেই প্রয়োজন ব্যস্ত হয়ে রয়েছে আপন শিল্প-উপকরণ নিয়ে। ভক্তিক্ষুধাতুর মানুষ ইতিহাসের বাস্তব মূর্তির উপরে রঙ চড়িয়ে আপনাকে ভুলিয়ে কত অনৈসর্গিক প্রতিমা বানাচ্ছে তার সংখ্যা নেই। শুধু পূজা করা নয়, রস-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রবল। তাই তার উপভোগের বিষয়কে সে দোষমুক্ত সুসংগতি দিয়ে রুচির অনুকূল করতে চায়। যে অন্ন তার

প্রাণরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক, তাকে কেবলমাত্র আপন ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে পশুর মতো যেমন তেমন করে মানুষ খেতে পারে না। যে-ক্ষুধা প্রকৃতিদত্ত তার আশুনিবৃত্তি সংবরণ ক'রে মানুষ তার উপরে স্বরচিত শিল্পের শোভনতা বিস্তার করে। অন্নের সামনে নিজেকে একান্ত ক্ষুধিত ব'লে চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে তার সম্পূর্ণ উপভোগের ব্যাঘাত ঘটে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উপকরণকে অপরূপতা দেবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে উপভোগের যে আবরণ সৃষ্ট হয়েছে তারই শ্রেষ্ঠতা বিচার ক'রে তার স্বাজাতিক সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিচার হয়ে থাকে। যৌনবৃত্তি মানুষের একটি আদিম প্রবল প্রবৃত্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু যে মানুষ সেই বৃত্তিকে দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার ঐকান্তিক অসংযত পথে চালনা করে সে নিন্দনীয় হয় কেবল নীতির আদর্শ থেকে নয় উপভোগের উৎকর্ষ বিচারে। এই-সব আদিম প্রবৃত্তির মুখ্য ভাষাকে গৌণ ছন্দে ঢালাই ক'রে মানুষ তাকে অলংকৃত করে। বুভুক্ষাকে শরীরের শাসন থেকে নিয়ে আসে মনের রাজ্যে, কাম রাজবেশ ধরে প্রেমের, তবেই সে দিতে পারে পুরো আনন্দ, যা ক্ষুধাতৃপ্তির চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষ আপনাকে এবং আপনার চার দিককে আদিকাল থেকেই বানিয়ে তুলছে আপন আনন্দলোক সৃষ্টির জন্যেই। এই বানিয়ে তোলা তার স্বধর্ম— সে সৃষ্টিকর্তা। যেটাকে বলা যেতে পারে কৃত্রিম সেটা থেকে তার স্বভাবেরই প্রমাণ হয়।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পাষাণ-প্রকৃতির উপরে মাটির স্তরের

আবরণ প্রকাশ করেছে নানা বর্ণের নানা রসের ফুল ফল ফসল। এই স্তরে সে যে বিচিত্র রূপ নিয়েছে তা সর্বজনের। বসন্তে গিয়েছি চীনদেশে, বহু সমুদ্র পার হয়ে গেছি দক্ষিণ-আমেরিকায়। প্রত্যেক জায়গায় ফুলফলপল্লবের আছে কিছু প্রভেদ, কিন্তু তার উপরে আছে সৌন্দর্যের সর্বজনীনতা। যেখানেই গেলুম বিশ্বপ্রকৃতিতে নানা আকারে একটা চির-পরিচয় দেখা দিল। সেটাই তার আবরণে। মানুষের মধ্যেও তাই, আতিথ্যের রূপভেদ, কিন্তু সমস্তটার মধ্যে যেখানে আছে সৌজন্যের সর্বজনীনতা সেখানে বিদেশের মধ্যেও স্বদেশকে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য সৌজন্যের এই আবরণ মানুষের আপন সৃষ্টি, এইখানেই আমরা সকলে মিলি, এই আবরণের মধ্য দিয়েই দূরকে কাছে পাওয়া যায়।

বালক-বয়সেই ইংরেজি সাহিত্যের আঙিনায় যাওয়া-আসা শুরু করেছি। ভাষার আভিধানিক বেড়াটা যেমনি পার হয়েছি অমনি ওখানকার ফলের বাগান থেকে ফল পাড়বার আনন্দে বেলা কেটেছে। যেটুকু বাধা পেয়েছি তাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি বরঞ্চ ঔৎসুক্য বাড়িয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের পথে এই যে সর্বজনীনতার আহ্বান পেয়েছিলুম একে সমতলতা বললে অসংগত হবে। এর মধ্যে বাঁকচোর উঁচুনিচু যথেষ্ট ছিল। লেখকদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যের অভাব ছিল না। কিন্তু রূঢ়ভাবে কোনো দেউড়ি থেকে কোনো দ্বারী ঠেকিয়ে রাখে নি।

সেদিন গেল, এখন নতুন যুগ এসেছে। যে সাহিত্যে

চলাফেরা অভ্যস্ত ছিল সেখানে হঠাৎ দেখি রাস্তা খুঁজে পাই নে। আমি বিদেশী ব'লেই যে আমাকে এই রকম ধাঁধা লাগিয়েছে তা নয়, আমার কোনো কোনো ইংরেজ বন্ধুকেও জিজ্ঞাসা ক'রে খবর পেয়েছি তাঁদের পক্ষেও এই আধুনিক কাব্য সহজবোধ্য নয়।

একটা কথা কানে এল, এখনকার কবিতা অবচেতনতত্ত্বে-পাওয়া কবিতা। অবচেতন মনের লীলা খাপছাড়া অসংলগ্ন। অর্থের সংগতি ঘটায় যে মন সে সেখানে অনেকখানি ছুটি নিয়েছে। এই অর্থের সংগতিতেই আনে সর্বজনীনতা, যেখানে এই সংগতিসূত্র ছিঁড়ে গেছে সেখানে প্রত্যেক মানুষের মন আপন প্রাইভেট পথের পাগ্‌লা পথিক। এখানকার রাস্তাঘাট নিয়ে গোলমাল ঠেকবার কথা।

অথচ আর্ট যেহেতু সায়ান্স নয় সেইজন্যে তার মর্মকথাটার স্বাতন্ত্র্য ঐকান্তিক। তার থেকে আনন্দ পেতে হলে অত্যন্ত বিশেষ করে তার আপন দেউড়িতেই যেতে হবে। সায়ান্সের মতো কোনো সাধারণতত্ত্ব তার তত্ত্ব নয়।

✓ কবি কিংবা আর্টিস্টের এই স্বাতন্ত্র্য, যাকে ইংরেজিতে বলে uniqueness, এর গভীর ভিত্তি অবচেতন মনে তাতে সন্দেহ নেই। ভিত্তি হতে পারে কিন্তু সমস্তটাই যদি নিছক অবচেতনার কীর্তি হয় তা হলে স্বপ্ন ছাড়া আর-কিছুই বাকি থাকে না।

অবশ্য স্বপ্ন জিনিসটা যে একেবারে ধোঁওয়া, তা নয়, প্লাবনের মাঝে মাঝে এক-এক টুকরো খাপছাড়া ডাঙা উঠে

পড়ে। সেই-সব অপ্রত্যাশিত দৃশ্য মনকে বিশেষভাবে টানে তার একটা প্রমাণ ছেলে ভোলাবার ছড়া। অনেক চেষ্টাকৃত সাহিত্যের আয়ু পেরিয়ে সেগুলো আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। তারা সব অদ্ভুত স্বপ্নের বানানো কিন্তু রস আছে তাদের মধ্যে, নইলে মানবশিশু ভোলে কী নিয়ে।

খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে,
খোকা বলে পাখিটি কোন্ বিলে চরে,
খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

এ স্বপ্নরূপ বানানো সহজ নয়। সব অসম্ভব ছবি, কিন্তু ছবি। বোধ করি অসম্ভব ব'লেই উজ্জ্বল হয়ে চোখে ঝলক মারে— অর্থসংগতির দরকার নেই। পাখি হয়ে খোকা বিলে চরে বেড়াচ্ছে, তার মাছ ধরবার অন্যায় বাধা ঘটাচ্ছে দুটো প্রাণী— চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এইটেতেই ওর রস।

এই অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্নতার আঙ্গিক কাব্যে ব্যবহার করা চলতে পারে যদি ঠিকমত তার ব্যবহার হয়। যদি এই প্রণালীতে বিশেষ একটা ছবি ফুটে ওঠে, বিশেষ একটা রস জাগে মনে। কাব্যের সেই বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা চলবে না।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব প্রচার হওয়ার পর পাশ্চাত্য জগতে অবচেতনের যেন একটা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাহিত্যে এর বেগ আর রোধ করা যায় না। এই অপ্রকাশ ভূগর্ভের জিনিসকে নানারকম প্রকাশের ব্যবহারে লাগানো চলছে।

ইতিপূর্বে কাব্যে অবচেতনী কল্পনার প্রভাব ছিল না যে তা নয় কিন্তু সে ছিল যেন নেপথ্য থেকে। এখন সে এসেছে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে। আধুনিক সাহিত্যে ও আর্টে তার এই প্রকাশ্যতার বিশেষ একটা কাজ বিশেষ একটা দান আছে ব'লে ধরে নিতে হবে নইলে বলতে হবে তার আবির্ভাব একটা উপদ্রব; বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে এত বড়ো একটা অভিযোগ আনতে সাহস হয় না।

বর্তমান সাহিত্যে আমার অনভিজ্ঞতা আমি কবুল করি। তাই আমি খুঁজি এমন কোনো পথচারীকে যিনি এ পথের পথিকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, আধুনিক সাহিত্যে যাঁর পরিচয় বই-পড়া পরিচয় নয়, যিনি কাছের থেকে নবীন কবিদের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছেন। সদ্যসৃষ্টির শিল্পবিকাশের আবহাওয়ায় যাঁর চিত্তে আপন মজ্জার ভিতর থেকে প্রকাশের চেষ্টা সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাছ থেকে এই নতুন ঋতুর ফুল-ফসলের সত্য খবর পাবার আশা করা যায়। অর্থাৎ এটা জানা চাই তাঁর মধ্যে যে প্রভাব এসেছে সেটা অব্যবহিত, সেটা দূরের থেকে নকলের উদ্যম নয়।

অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' এবং 'এক মুঠো' বই দুটি পড়তে বসেছি এই বিশ্বাস মনে নিয়ে। ইংলণ্ডে যাঁরা এই নূতন সাহিত্যের কর্ণধার অমিয় আজ অনেক দিন ধ'রে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পেয়ে এসেছেন। নূতন কালের কোন্ প্রেরণা কোন্ বেদনা এই-সব কবিদের সৃষ্টিকে প্রাণবান করেছে কাছে

থেকে তিনি তা জেনেছেন, এবং তার প্রবর্তনা তাঁর নিজের মনের মধ্যে এসে কাজ করেছে। এই প্রবর্তনায় যদি তাঁকে রচনার ক্ষেত্রে নিয়ে আসে তবে সে তাঁকে কেবল বাইরের আঙ্গিক গড়িয়ে ছাড়বে না, তাঁর ভিতরের কথা এই রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবে। এইজন্যে আর্টের যে বিকাশ আমার অপরিচিত তাঁর কবিতার মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুসরণ করেছি।

কিছুকাল আগে আমি যখন মংপু পাহাড়ে ছিলুম, অমিয়র "চেতন স্যাকরা" কবিতাটি হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। আমার দৃষ্টিশক্তি এখন ক্ষীণ এবং শরীর ক্লান্ত এইজন্যে ধারাবাহিক বই পড়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে। তাই পথচল্‌তি পথিকের খাপছাড়া দৃষ্টিতে আমার কাছে নূতন অভিজ্ঞতার বিষয় বিচিত্র স্বাদ এনে দেয় অকস্মাৎ। এ অবস্থায় টুকরো থেকে সমগ্রের পরিচয় আমাকে নিতে হয়— খুব যে ভুল করি তা বোধ হয় না।

এই কবিতাটি পড়ে অমিয়কে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা এখানে উদ্‌ধৃত করলে আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে।

"তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে। কবিতা রচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের ভঙ্গিতে যাকে সহজ দেখতে হয় সে আবর্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য। তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ আপন অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে।

"পাহাড়ে আছি তাই একটা পার্বত্য তুলনা মাথায়

আসছে। দূরে গিরিশিখরের নীলিমার আভাস থেকে দেখা যাচ্ছে শুভ্র রেখায় নির্ঝরের বিশ্বযাত্রা, সে স্বচ্ছ; সে নির্মল, সূক্ষ্ম আলোয় ছায়ায় রচিত তার উত্তরীয়, তার কলধ্বনি দূর থেকে কানে পৌঁছয় না, মনে পৌঁছয় তার অশ্রুত কল্লোল। এইখানে প্রতীকরূপে দেখতে পাই দূর পুরাতন-কালীন আমাদের রচনার ধারা। এর যা রস তা ভোগ করেছি অনেক দিন, পরিবেশনও করেছি, একে অবজ্ঞা কোরো না। কেননা যদি রসাত্মকতাকে কাব্যের ধর্ম বলা হয় তবে এ রসেরও বিশেষত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে। তবে কিনা এইখানেই শেষ নয়। সেই ঝরনা নেমে এল নিম্নভূমিতে, অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে হ'ল নানারঙা। কত ভাঙাচোরা কত খসে-পড়া জিনিস সে টেনে নিয়ে চলেছে ; কত আওয়াজ মিলছে তার কলস্বরে, যার সঙ্গে তার সুরের মিল নেই, হয়তো ধোবার গাধা চেঁচিয়ে উঠছে তার তীরের ডাঙায়। কোথাও বুদ্‌বুদপুঞ্জ উঠছে ফেনিয়ে, কোথাও বালি, কোথাও কাদা, কোথাও শহরের আবর্জনা, সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে তার ধারা, তার চলমান রূপ। কিছুই তাকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না, তুচ্ছতা তাকে পরিহাস করে কিন্তু প্রতিরোধ করে না। মনে ভেবে দেখলুম সৃষ্টির এই সর্বগ্রাহী লীলারূপকে কিছু কিছু যাচাই না করে নেওয়া আমার অভ্যস্ত নয়। এইটেতেই বোধ করি আমাদের সেকালের সাবধানী শুচিতা, যেটাকে তোমরা আভিজাত্যবুদ্ধির শৌখিনতা ব'লে হেসে থাকো, বলো বুর্জোয়া। তা হোক কিন্তু তুমি যে ভূতলচারিণী

স্রোতস্বিনীর পরিচয় দিয়েছ তার সঙ্গে আমার দূরবিহারী নির্ঝরের কোথাও একটা মিল আছে তো। মিল নেই পাঁকে-বোজা এঁদো ডোবার সঙ্গে। কেননা সে একেবারে বোবা, একেবারে অন্ধ, প্রাণধারার নাড়ীর গতির সঙ্গে তার নিশ্চল রুগ্‌ণ পঙ্গুতার কোনোখানে যোগ নেই। একেই যদি আধুনিক কাব্যের চলৎস্রোতে ভাসিয়ে আনতে হয় তা হলে অপেক্ষা করতে হবে "ভরা বাদর মাহ ভাদরের"। বর্ষার প্লাবন বয়ে যাক পঙ্কপিণ্ডের উপর দিয়ে, চিংড়ি মাছের বাসাগুলোয় বিপ্লব ঘটিয়ে, পিছল ঘাটে এঁটো বাসন মাজার ঝংকারে ঝংকারে কল্লোল মিলিয়ে, উছলে-ওঠা ঢেউগুলোতে গোয়ালঘরের গোবরগাদা লেহন করে, পিঠে পিঠে মাথা রাখা মোষগুলোকে পঙ্কক্লিন্ন জলে অবগাহনের তৃপ্তি দিয়ে। এই সমস্ত কিছুর সঙ্গেই মিল করে থাকবে বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশ, মেঘের গর্জন, আর ঝিমঝিম বৃষ্টি। এই পেঁকো বন্যায় আকাশে ঘোলা জল ছিটিয়ে কবির ছন্দ যেন অনায়াসে নৃত্য করে উলঙ্গ শিশুর মতো। বুড়োবয়সের স্পর্ধিত নগ্নতা চিৎকার স্বরে নিজের আধুনিকতা ঘোষণা ক'রে অবিমিশ্র পঙ্কসভায় নাচতে যদি আসে তা হলে পুলিসে খবর দেওয়া দরকার হবে।"

অমিয়কে যা লিখেছি তার মোদ্দা কথাটা এই যে আমাদের সকল অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন অনেক কিছু মিশতে থাকে যাকে আমরা ইচ্ছে করে সরিয়ে রেখে দিই; কিন্তু আমাদের অবচেতন মন তাকে গ্রহণ করে, সব জড়িয়ে নিয়েই আমাদের উপলব্ধির বাস্তবতা। আমাদের অনুভূতিতে সেই অগোচরের

দান যদি ঠিকমত ভাবে গ্রহণ করতে পারি, তার সহযোগে যদি একটা অনুভূতিকে বিশেষ রসে উদ্‌বোধিত করা সম্ভব হয় তা হলে কাব্যের যুগযুগান্তর নিয়ে তর্ক করার দরকার হয় না। বেশের বদল করেও যদি কাব্যই আবির্ভূত হয় তবে তাকে অভ্যর্থনা করতে কুণ্ঠিত হব না। 'খসড়া' বইটিতে "হাঁসপাতাল" ব'লে যে কবিতা বেরিয়েছে তার লেখার ছাঁদ একেবারেই আমাদের ধরনের নয় কিন্তু তার মধ্যে যে একটি অনুভূতির রহস্যময় ছবি দেখা দিয়েছে তাকে আদর ক'রে মেনে নিতে হবে। কেননা ঠিক এই ছবির বিশেষ রসটা অন্য কোনো ভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারত না।

"ঘুম" ব'লে একটা কবিতা দেখলুম। যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে তার অনুভূতি সে আমার কাছে অত্যন্ত নতুন ব'লে ঠেকল। বিশ্বকে কবি বিরাট ঘুমের ভূমিকায় দেখছেন। কালের প্রাঙ্গণে নিখিলের চলাফেরা হচ্ছে কিন্তু তার চৈতন্য নেই। সে যেন একটা চলনশীল ঘুমের মতো। মনে প্রশ্ন ওঠে ঘুম ভাঙবে যখন তখন থাকবে কী। প্রলয় কি রূপহীন গতিহীন শুভ্র শূন্যতা? ভালো-মন্দর ভেদহারা একটা নিঃশব্দ না, যার কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই? মহানিদ্রা-সাগরের মধ্যে অসংখ্য রূপের যে-সব আবর্তন দেখা যায় তারা যাচ্ছে তলিয়ে এই ঘুমের অচেতন তলায়। এদিকে অমরতার নানা উপাধি, যা ঘুমের চেয়ে সত্য নয়— উঠছে মেলাচ্ছে লোকালয়ে লোকালয়ে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যে পাতা কীটে কাটছে নিমেষে নিমেষে। উপাধি মাথায় নিয়ে

চলেছেন কেউ বা মানুষ-খুন-করা অমর নামধারী, কেউ বা ছড়া-বানানো অমর, কোনো রূপসী মুগ্ধ মনের বিহ্বলতার অমরী। অকূল ঘুমের তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতে হাসছেন মহাকাল, এই-সব ভাসমান ফেনাগুলোর উদ্‌গত অহমিকার দিকে তাকিয়ে। "ঘুম" কবিতা থেকে আমি যা বুঝলুম সেটাই একমাত্র অর্থ কি না জানি নে— কেননা অর্থস্পষ্টতার প্রতি কবির মমতা নেই। এই কবিতাগুলি পড়লে ছায়াপথের সঙ্গে তুলনা মনে আসে, এখানে স্পষ্ট এবং অস্পষ্টের মেলা বসে গেছে। যেখানে অস্পষ্টতার আবরণ সুন্দরীর ঘোমটার মতো বিশেষ রস প্রকাশের সহায়তা করে সেখানে তাকে কবিত্বের খাতিরে মেনে নিতে পারি কিন্তু যেখানে বাণী তার চেয়ে দুর্গমতায় পৌঁচেছে সেখানে মার্জনা করতে পারব না। কেননা যে বচন একেবারেই বোধগম্যতার বাইরে সেখানে যিনি বলছেন তিনিই একমাত্র বক্তা এবং তিনিই একমাত্র শ্রোতা, সাহিত্যের সর্বজনীন সভায় তাঁর স্থান নেই। এর মধ্যে সংকটের কথা এই যে বোধগম্যতার রাস্তা আমার কাছে বন্ধ ব'লেই যে অন্যের কাছেও বন্ধ তার নিশ্চয়তা নেই। সাহিত্যের এই রহস্য চিরদিনই রহস্য থেকে যাবে— এই তর্কের মধ্যে আমরা সকলেই চলে এসেছি, আঘাত পেয়েছি আঘাত করেছি।

বসন্ত আসবে আসবে করছে, বাতাসে শীতের আমেজ আছে। সামনে সকাল বেলার কাঁচা-সোনা-রঙের রৌদ্রে পাণ্ডুবর্ণ আকাশের গায়ে য়ুকলিপ্টসের ঝালর-দোলানো

পাতাগুলো ঝিলমিল ক'রে উঠছে। এরি মধ্যে মধ্যে পাখির কিচিমিচি। টবে অনেক দিনের প্রত্যাশিত বেগনি রঙের ক্যামেলিয়া এইবার ফুটে উঠল ব'লে। বাঁধানো চৌবাচ্চায় জলের ধারে সোনালি মাছের খবর নিতে এসেছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে বক। এই-সমস্ত নিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন প্যাটর্‌নে সাজিয়ে তোলা আমার সকাল বেলা। এই ফর্দ থেকে ঐক্য-বিলাসী মন স্বতই কী কী অবান্তরকে বাদ দিয়েছে একটু ভেবে দেখলে তার দিশে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ ধ'রে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছিল গোরুর গাড়ির, অবশেষে কাছাকাছি এসে হুড়মুড় করে ঢেলে দিলে এক বোঝা ইঁট। বাগানের ওপারে আধখানা তৈরি পাঁচিল। যতক্ষণ মন ছিল বাগান উপভোগে, ততক্ষণ এটা একেবারে খেয়ালের মধ্যেই আসে নি। তার পরে বেস্পতিবারে হাটে যাবার পথে মাছওয়ালা একটা বড়ো টুকরো রুইমাছ এনেছে ঝুড়িতে, হাত নেড়ে বললুম দরকার নেই। আমার বাগানঘেরা সকালবেলাতে এ কোনো চিহ্নই দিল না। ঝাঁট দিতে এসেছিল মেথর কাঁকরের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, কখন এল কখন গেল সেটা ঠাহরের মধ্যে নেই। হঠাৎ এক সময়ে মনে হ'ল মধুপুর যেতে হ'লে মোটরে আসানসোল পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ধরাই সুবিধে। এরি মধ্যে নেপথ্যবাসী মন বলে উঠছে, হালসিঙ্কি, ফরওয়র্ড ব্লক, চেম্বর-লেনের ছাতা। এক মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ল একটা কাক রান্নাঘরের আঁস্তাকুড় থেকে একটা কী আমিষের আবর্জনা নিয়ে জামগাছের ডালে বসে চঞ্চু দিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করছে।

তার পরেই চোখ ফিরল টবের দিকে, দেখলুম আরো দুটো কুঁড়ি ধরেছে ক্যামেলিয়ার ডালে। এই সকাল বেলার ছবিতে আপন স্বভাব অনুসারে আমার সচেতন মন অনেক কিছু বাদ দিয়ে আল্‌পনা কেটেছে। অবচেতন মন যা-তা আঁকজোক পাড়ে কিন্তু রেখা-রঙের সমন্বয় ক'রে ছবি আঁকে না। হাল আমলের কবি হয়তো পণ করেন আঁকজোক কিছুই বাদ দেব না, তাতে যেখানে-সেখানে নানা আঁচড়ে ছবির ঐক্যকে যদি অস্পষ্ট করে দেয় সেও স্বীকার। এটা খানিকটা বিজ্ঞানী বুদ্ধি। বিজ্ঞান আর্টের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়— যা কিছু আছে তাদের সমান দাম দিয়ে মেনে নেবার দিকে তার ঝোঁক। আর্টের মধ্যে আছে সম্ভোগের দাবি, আর সায়ান্স সব-কিছুকে নির্বিচারে টেনে আনে। আধুনিক যুগের প্রকাশ-তত্ত্বে আছে এই দুয়ের মিল। তার নমুনা এই দুটি বইয়ের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়। একটি যেমন "সংসার" কবিতায়; বহু টুকরো নিয়ে এর মধ্যে যে একটা গুচ্ছ বেঁধেছে, তার মধ্যে ভাবনা বেদনা স্মৃতি জড়িয়ে গেছে যেমন-তেমন ভঙ্গিতে। সাবধানতা নেই কিন্তু একটা মর্মকথা আছে। এর এই অসাবধান নৈপুণ্যে আঁজলা ভরে ওঠে অনেক কিছুতে। ওর পরের কবিতার নাম "আরোগ্য", কত সহজ, ছোটো কয়েকটা টুকরোয় কী রকম অনলংকৃত সম্পূর্ণতা। "দরজা" কবিতা পড়ে দেখবার মতো। একটুখানি মনে পড়ে আমার নিজের কবিতা "স্বপ্ন", সেইজন্যেই এর স্বাতন্ত্র্য এমন প্রবল ক'রে মনে লাগে, এ আর-এক যুগের ভাষা, আর-এক যুগের দৃষ্টি। এ সদর

রাস্তার ধূলিধূসর কবিতা, এ পরিচ্ছন্ন সভাগৃহের নয়। পড়ে দেখো খসড়ায় "চায়ের বেলা"। ছেঁড়া সুতোর শিল্প। দেখো "পুষ্পদৃষ্টি", বিজ্ঞানের রোমান্স, ধরা পড়েছে কয়েকটি সহজ লাইনে, বকুনির অংশ অত্যন্ত অল্প। "যৌগিক" কবিতায় বিপুল বিচিত্র মাটির উপর চার দিকে জড় ও জীবনের মেলা-মেশার যে আওড় লেগেছে দু-চারটে হালকা কথায় তার ছবি ফুটেছে, এই স্বল্পবাক্ বিশেষত্বেই এর রস। কালো জলে পরিচিত বন্দরের দিকে জাহাজ ভেসে চলেছে কেমন তার একটা ইঙ্গিত। সমুদ্রের নীল কারখানা, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চাকা উঠছে পড়ছে, পৃথিবীকে বানিয়ে তোলবার মজুরি চলছে দিনরাত্রি, এ বিরাট কলের ধোঁওয়া নেই, আগুন আছে চাপা, ডাইনামো চোখে পড়ে না— জাহাজের মালেক প্রকৃতির কারখানা-ঘর থেকে নিরুদ্ধ বেগ চুরি করে এনে তার বাঁধন খুলছে নিজের প্রয়োজনে। স্বার্থে স্বার্থে লেগে যাচ্ছে মাতা-মাতি। কবি দেশবিদেশের দিগন্তের হাতছানি দেখে এসেছেন, কেবলমাত্র কলকাতা শহরের গলি-ঘুঁজির নয়। দরকার নেই তার গেঁয়ো রসের গাঁজিয়ে ওঠা তাড়ি জোগাবার।

আরো অনেক কিছু নির্দেশ করবার আছে। সময় নেই, জায়গা নেই। আমার সম্পর্কীয় একটা অপবাদ শুনেছি যে আমার নিজের ছাঁদের কবিতা ব্যূহ বেঁধে আছে বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে। তারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। সেই বিদ্রোহ জয়ী হোক এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তাই আমি আনন্দ পেয়েছি

অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে। এই স্বাতন্ত্র্য সংকীর্ণ পরিধি নিয়ে নয়। এ নয় কেবল যৌন রসভোগের উদ্‌বেলতা, এ নয় আঙ্গিকের বিস্ফোরণে ভাষাকে উলটপালট ক'রে দেওয়া। অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য আছে এর মধ্যে— বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে আছে এর সঞ্চরণ।

১৩৪৬

—

অনিন্দিতা দেবী অমিয় চক্রবর্তীর মাতৃদেবী; 'বঙ্গনারী' ছদ্মনামে, ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার নারীসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি একদা নিরন্তর লেখনী চালনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন; ১৯২১-২৩ সাল মধ্যে লিখিত এই প্রবন্ধগুলি তাঁহার 'আগমনী' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল।

অমিয় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নিকটবর্তী হইয়াছিলেন ও তাঁহার প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনান্তকাল পর্যন্ত সে প্রীতি উভয়ের জীবনেই নানাভাবে ফলবতী হইয়াছিল। অল্প বয়সে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে একান্ত শোকার্ত হইয়া অমিয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনালাভ করিয়াছিলেন, প্রথম চিঠি কয়খানিতে তাহার নিদর্শন আছে। সাক্ষাৎ ও চিঠিপত্রের সূত্রে এই যোগ বিস্তারিত হয়। ছাত্রদশা অতিক্রম করিবার পর ১৯২৬ সালে অমিয়চন্দ্র বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসহকারীরূপে। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণেও অমিয়চন্দ্র একাধিকবার ভ্রমণসঙ্গী হইয়াছিলেন।

১৯৩৩ সালে অধ্যয়নসূত্রে অমিয়চন্দ্র বিদেশযাত্রা করেন। শান্তি-নিকেতনে বাসকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের কিরূপ একান্ত হইয়াছিলেন ৬৩ ও ৬৪ -সংখ্যক পত্র এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য; অংশত এখানে তাহা উদ্‌ধৃত করা গেল:

"এতদিন পরে আজ তোমরা চলে গেলে কী রকম খারাপ লাগচে বলতে পারি নে। এ যেন মৃত্যুর বিচ্ছেদের মতোই কেবলি মনকে বৃথা আঘাত করচে।... তোমার সঙ্গে এমন একটা নিবিড় যোগ হয়ে গিয়েছিল যে এ বয়সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়।... তুমি আমার অনেক করেচ, অনেক ক্লান্তি থেকে বাঁচিয়েছ— তোমার

সহযোগিতা আমার পক্ষে বহুমূল্য হয়েছিল সে কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না— কোনোদিন তোমার অভাব পূর্ণ হবে না।…"

ইহার পরের চিঠি—

"অমিয়, তোমার কথা বারবার মনে পড়ে। তুমি আমাকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলে পেয়েছিলে, এমন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়, এইজন্যে আমি তোমার পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেরেছি। এরকম সঙ্গ আমি আর কারো কাছ থেকে আশা করিনে।"

বিদেশে বাসকালে ও অধ্যয়ন সমাপ্তির পর দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অমিয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত এই সহকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিই তাহার নিদর্শন। নবজাতক কাব্যগ্রন্থের কবিতা নির্বাচন ও গ্রন্থন অমিয়চন্দ্র করেন, নবজাতক গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে লিখিয়াছেন। আফ্রিকা কবিতা বিশেষভাবে অমিয়চন্দ্রের অনুরোধেই লিখিত। লক্ষণীয় যে, জীবনের শেষ ভাগে দেশের রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বহু ক্ষেত্রেই শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে পত্রযোগে লিখিত।

১৯৩২ সালে পারস্যভ্রমণকালে সঙ্গী অমিয়চন্দ্রের উদ্দেশে একটি রচনায় তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে—

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সে আলোকে যায় মিলে।

—